এইডস

পরিচিতি ও প্রতিরোধ

হাফিজউদ্দীন আহমদ

এইডস : পরিচিতি ও প্রতিরোধ

ডা. হাফিজউদ্দিন আহমদ
অধ্যাপক
জয়নুল হক সিকদার মহিলা মেডিকেল কলেজ
ঢাকা

BANSDOC Library
Dhaka

বাংলা একাডেমী ঢাকা

কপি-৩

NANSDOC Library
Accession No. 18029
10.6.04

এইডস : পরিচিতি ও প্রতিরোধ
[এইডসবিষয়ক]

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪১০ / জুন ২০০৩

বা.এ. ৪৩৬৮
(২০০২–২০০৩ পাঠ্যপুস্তক : জীকৃচি ৯)

মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান উপবিভাগ

জীকৃচি ৩০৭

প্রকাশক
মুহম্মদ নূরুল হুদা
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী ঢাকা ১০০০

মুদ্রণ
মোঃ হামিদুর রহমান
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
কল্লোল বড়ুয়া

মূল্য
একশত দশ টাকা মাত্র

AIDS : PARICHITI O PROTIRODH (AIDS: Introduction and Prevention) by Dr. Hafizuddin Ahmed. Published by Mohammad Nurul Huda, Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2003. Price : Taka 110.00 only.

ISBN 984-07-4377-5

উৎসর্গ

মরহুমা স্ত্রী রওশন আরা কাকুর
স্মৃতির প্রতি

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	:	এইডস	১
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	রেট্রোভাইরাস	৯
তৃতীয় অধ্যায়	:	এইডস রোগের বিস্তার	১৭
চতুর্থ অধ্যায়	:	এইডস বিস্তারের প্রতিবন্ধকতা	৩২
পঞ্চম অধ্যায়	:	এইচআইভি ও স্তন্যদান	৪১
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	রোগ বিবরণ	৪৫
সপ্তম অধ্যায়	:	প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও সুযোগ-সন্ধানী সংক্রমণ	৪৯
অষ্টম অধ্যায়	:	এইডস এবং যক্ষ্মা	৫৭
নবম অধ্যায়	:	এইডস ও ফুসফুস প্রদাহ	৬৭
দশম অধ্যায়	:	এইচআইভি সংক্রমণ ও মুখের রোগ	৭১
একাদশ অধ্যায়	:	এইডস এবং উদরাময়	৭৫
দ্বাদশ অধ্যায়	:	এইডস সনাক্তকরণ	৮১
ত্রয়োদশ অধ্যায়	:	গবেষণাগার ও এইচআইভি সংক্রমণ	৯২
চতুর্দশ অধ্যায়	:	এইডস নিয়ন্ত্রণ	৯৭
পঞ্চদশ অধ্যায়	:	রেট্রোভাইরাসবিরোধী চিকিৎসা	১০৪
ষোড়শ অধ্যায়	:	এইডস সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সন্ধানী রোগের চিকিৎসা	১০৭
সপ্তদশ অধ্যায়	:	এইচআইভি সংক্রমণ, শল্য চিকিৎসা ও শল্যবিদ	১১১
অষ্টাদশ অধ্যায়	:	দন্ত চিকিৎসকের চেম্বারে পালনীয় সতর্কতা	১১৬
ঊনবিংশ অধ্যায়	:	এইচআইভি রোগী ও যৌনতা	১১৯
বিংশ অধ্যায়	:	বাংলাদেশ এবং এইডস	১২৫
একবিংশ অধ্যায়	:	বাংলাদেশে এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রম	১২৯
দ্বাবিংশ অধ্যায়	:	এইচআইভি সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে কিছু তথ্য	১৩৫
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়	:	এইচআইভি সংক্রমণ ও মানসিক সমস্যা	১৪০

চতুর্বিংশ অধ্যায় :	এইচআইভি ও সামাজিক সমস্যা	১৪৬
পঞ্চবিংশ অধ্যায় :	এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে সতর্কতা ও পরামর্শ	১৪৮
ষট্‌বিংশ অধ্যায় :	এইডস নিয়ে বেঁচে থাকা	১৫১
সপ্তবিংশ অধ্যায় :	প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং জ্ঞান	১৫৫
	পরিশিষ্ট ১	১৫৯
	পরিশিষ্ট ২	১৬০
	তথ্যপঞ্জি	১৮৪

প্রথম অধ্যায়

এইডস

বর্তমান বিশ্বে একটি সুপরিচিত শব্দ। ইংরাজিতে এটি লেখা হয় A.I.D.S. দিয়ে। AIDS একটি প্রাণঘাতী রোগ। এর আদ্যক্ষরগুলো যা প্রকাশ করে তা হলো—

A দিয়ে অ্যাকোয়ার্ড (*Acquired*)। অ্যাকোয়ার্ড অর্থ অর্জিত। আগে ছিলো না এমন কিছু পাওয়া বা দেহে আসা।

I দিয়ে ইমিউন (*Imnune*)। ইমিউন অর্থ প্রতিরোধ বা অনাক্রম্যতা। দেহের কিছু কোষ বহিঃশত্রুর (যথা ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস) আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করে।

D দিয়ে ডেফিসিয়েন্সি (*Deficiency*)। ডেফিসিয়েন্সি শব্দের অর্থ হলো অভাব, ঘাটতি বা হ্রাস।

S দিয়ে সিনড্রোম (*Syndrome*)। সিনড্রোম দিয়ে অনেকগুলো রোগের উপসর্গ একত্রে থাকা বুঝায়। একে বাংলায় এককথায় উপসর্গমালা বলা যেতে পারে।

সুতরাং সার্বিকভাবে AIDS রোগটির নাম দাঁড়ালো অ্যাকোয়ার্ড ইমিউন ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম (Acquired Immune Deficiency Syndrome) বা অর্জিত প্রতিরক্ষা ক্ষমতা বা অনাক্রম্যতা হ্রাস উপসর্গমালা। এ রোগকে কেউ কেউ স্লিম ডিজিজ (Slim Disease) বা পাতলা হওয়া রোগ নামেও অভিহিত করেন।

এইডস একটি মারাত্মক ভাইরাস দিয়ে সংক্রমিত হয়। এই ভাইরাসের নাম এইচআইভি (HIV) বা হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস। এটি এক ধরনের রেট্রোভাইরাস (Retrovirus)। এটি এমন একটি ভাইরাস যা রোগীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (immune system) সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলে। ফলে দেহের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং আক্রান্ত ব্যক্তি খুব সহজেই সুযোগ-সন্ধানী সংক্রামক রোগ (opportunistic infestation), স্নায়ুতন্ত্রের বিকলতা (neurological disorders) বা অস্বাভাবিক টিউমার বা ক্যান্সার রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এমন কি সাধারণত সর্দি, কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি রোগেও সে একেবারে কাবু হয়ে যায়।

ভাইরাস এক ধরনের সূক্ষ্ম বস্তু বা জীব, যা জীবদেহে রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম। এগুলো এতো ছোট যে খালি চোখে দেখা যায় না। এমনকি সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও এদের সহজে দেখা যায় না। ভাইরাস দেখার জন্য ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপ প্রয়োজন হয়। এরা আকারে ব্যাক্টেরিয়ার চেয়েও ছোট। সার্বিকভাবে ভাইরাস বলতে একপ্রকার অতি আণুবীক্ষণিক অকোষীয় রোগ সৃষ্টিকারী বস্তুকে বুঝায়।

ভাইরাসের স্বভাব অনেকটা পরজীবীর মতো। জীবিত প্রাণিকোষে প্রবেশ করতে সক্ষম হলে সেখান থেকে পুষ্টি আহরণ করে ভাইরাস বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। তাই ভাইরাসকে

কোষ অভ্যন্তরস্থ পরজীবী (*in situ* Parasite) বলা হয়। কোষের ভিতর একবার প্রবেশ করতে পারলে সে কোষটিকে মেরে ফেলে বা কোষের শারীরবৃত্তীয় কার্যপ্রণালী পরিবর্তন করে দেয়। তবে প্রায়শই এরা কোষের ভিতর নিষ্ক্রিয়ভাবে বেশ কিছুদিন লুকিয়ে থাকে। আজ পর্যন্ত তিনশ-র বেশি ভাইরাস আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের কোনো কোনোটিতে কৌলিক পদার্থ হিসেবে শুধু ডি.এন.এ. এবং কোনো কোনোটিতে কৌলিক পদার্থ হিসেবে শুধু আর.এন.এ. থাকে। ডি.এন.এ. মানে ডিঅক্সিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিড (deoxyribonucleic acid) এবং আর.এন.এ. মানে রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড (ribonucleic acid)। কোনো ভাইরাসেই ডি.এন.এ. এবং আর.এন.এ. এ দুধরনের কৌলিক পদার্থ একত্রে উপস্থিত থাকে না।

এইডস রোগী

সাধারণ জীবকোষ এবং ভাইরাসে বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে। জীবকোষে কোষপ্রাচীর থাকে। কিন্তু ভাইরাসে কোনো কোষপ্রাচীর থাকে না। কোষপ্রাচীরের পরিবর্তে এদের চারদিকে আমিষের একটি আবরণ থাকে। একে বলা হয় ক্যাপসিড (capsid)। এইডস ছাড়া ইনফ্লুয়েঞ্জা, পোলিও, সাধারণ সর্দি, জলবসন্ত ইত্যাদি রোগও ভাইরাস দিয়ে ঘটে। হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (Human Immurodeficiency virus) বা এইচআইভি (HIV) ব্যতীত মানুষের দেহে রোগ সৃষ্টিকারী আরো অনেক ভাইরাস রয়েছে। এ ধরনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভাইরাস হলো হার্পিস ভাইরাস (Herpes virus), হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (Human Papilloma virus), হেপাটাইটিস বি ভাইরাস (Hepatitis B Virus), ইত্যাদি।

ব্যাক্টেরিয়া ও ভাইরাসের মধ্যকার পার্থক্য

ব্যাক্টেরিয়া	ভাইরাস
১। আক্রান্ত ব্যক্তির কোষের ভিতরে বা বাইরে বেড়ে উঠতে পারে।	১। কেবল জীবিত দেহকোষের ভিতরে বে উঠতে পারে।
২। আকারে বড়।	২। আকারে ছোট।
৩। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্যমান।	৩। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্যমান নয়।
৪। কৌলিক পদার্থ হিসেবে ডি.এন.এ. এবং আর.এন.এ. উভয়ই বিদ্যমান।	৪। কৌলিক পদার্থ হিসেবে শুধু ডি.এন.এ. বা শুধু আর.এন.এ. থাকে।
৫। কোষের বাইরে সক্রিয় থাকে।	৫। কোষের বাইরে নিষ্ক্রিয় থাকে।
৬। রাইবোসোম থাকে।	৬। রাইবোসোম থাকে না।
৭। শক্তি উৎপাদক উৎসেচক থাকে।	৭। শক্তি উৎপাদক উৎসেচক থাকে না।
৮। ইন্টারফেরনের প্রতি স্পর্শকাতর নয় (*Clamydia* sp. ব্যতীত)	৮। ইন্টারফেরনের প্রতি স্পর্শকাতর।

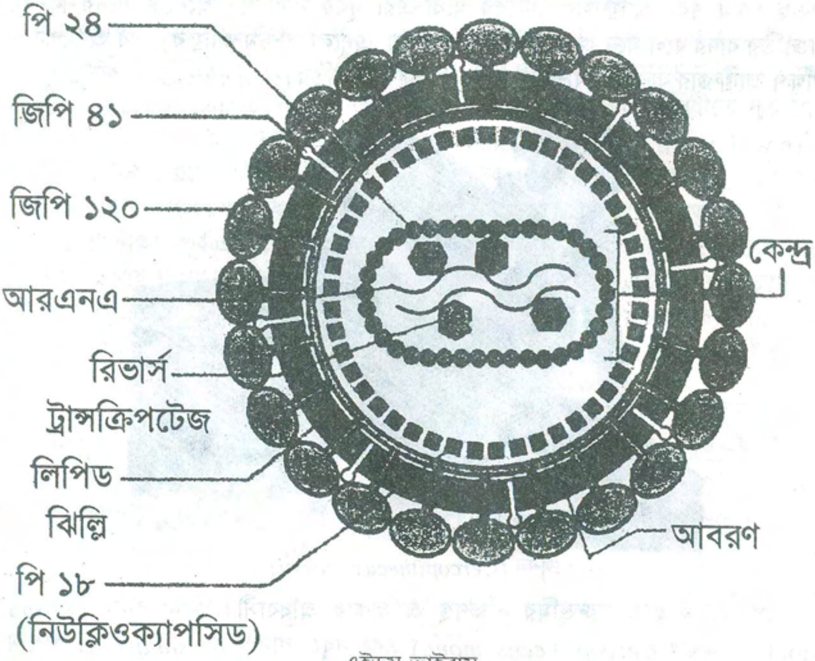

এইডস ভাইরাস

আফ্রিকান সবুজ বানর তথা গেনন

মানব সমাজে এইডস-এর সংক্রমণ বানর থেকে হয়েছে বলে সাধারণভাবে ধারণা করা হয়। তবে এইডস প্রকৃতই বানর থেকে এসেছে কি না তা নিশ্চিত করে বলা যায় নি। তবে পশ্চিম

আফ্রিকার রেসাস বানর এবং সুস্থ সবুজ বানরের দেহে এইচআইভি-২ ভাইরাসের সমধর্মী ভাইরাস (SIV Mac ও SIVAGM) পাওয়া গেছে। SIV মানে সিমিয়ান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (Simian Immunodeficiency Virus)। SIV এইডস ভাইরাসের নিকট আত্মীয়। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, ৩০ থেকে ৭০% সবুজ বানর SIV আক্রান্ত, কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এ জীবাণুর প্রভাবে তাদের কোনো রোগ হয় না। কিন্তু গবেষণাগারে পরীক্ষায় দেখা গেছে এশিয়ান বানর (Macaques)-এর এইডস হয়। এর কারণ অজানা।

সবুজ বানর *(Cercopithecus cercopithecus)* Cercopithecidae গোত্রের অন্তর্গত। এদের সাধারণ নাম গেনন (Guenon)। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, গেননকে ১০ - ২৩টি প্রজাতি এবং ৭১টি উপপ্রজাতিতে ভাগ করা যায়। এদের একদল হচ্ছে টেলাপইন *(C. talapoir)*। এরা পশ্চিম কেন্দ্রীয় আফ্রিকার আটলান্টিক তীরস্থ জলাভূমির আশে-পাশের জঙ্গলে বাস করে। সবচেয়ে ছোট গেননের নাম *Miopithecus*। কেন্দ্রীয় আফ্রিকার কঙ্গো অঞ্চলের জলাভুমিস্থ জঙ্গলে বসবাসকারী এলেন বানর (Allen's monkey বা *C. nigroviridis*) কে মাঝে মধ্যে *Alleupithecus* নামক ভিন্ন প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সবুজ বানর গ্রিভেট (Grivet) এবং ভারভেট (Vervet)-এর স্বভাব ও চেহারা প্রায় একই রকম এবং আফ্রিকার বানরের মধ্যে এরা খুবই সাধারণ। অনেকে এদের বিশেষ প্রজাতির বানর বলে মনে করেন। অনেকের ধারণা, এগুলো পশ্চিম আফ্রিকা, পূর্ব আফ্রিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার বানরের বৈশিষ্ট্যযুক্ত, তবে একই প্রজাতির *(C. aethiops)* অন্তর্ভুক্ত।

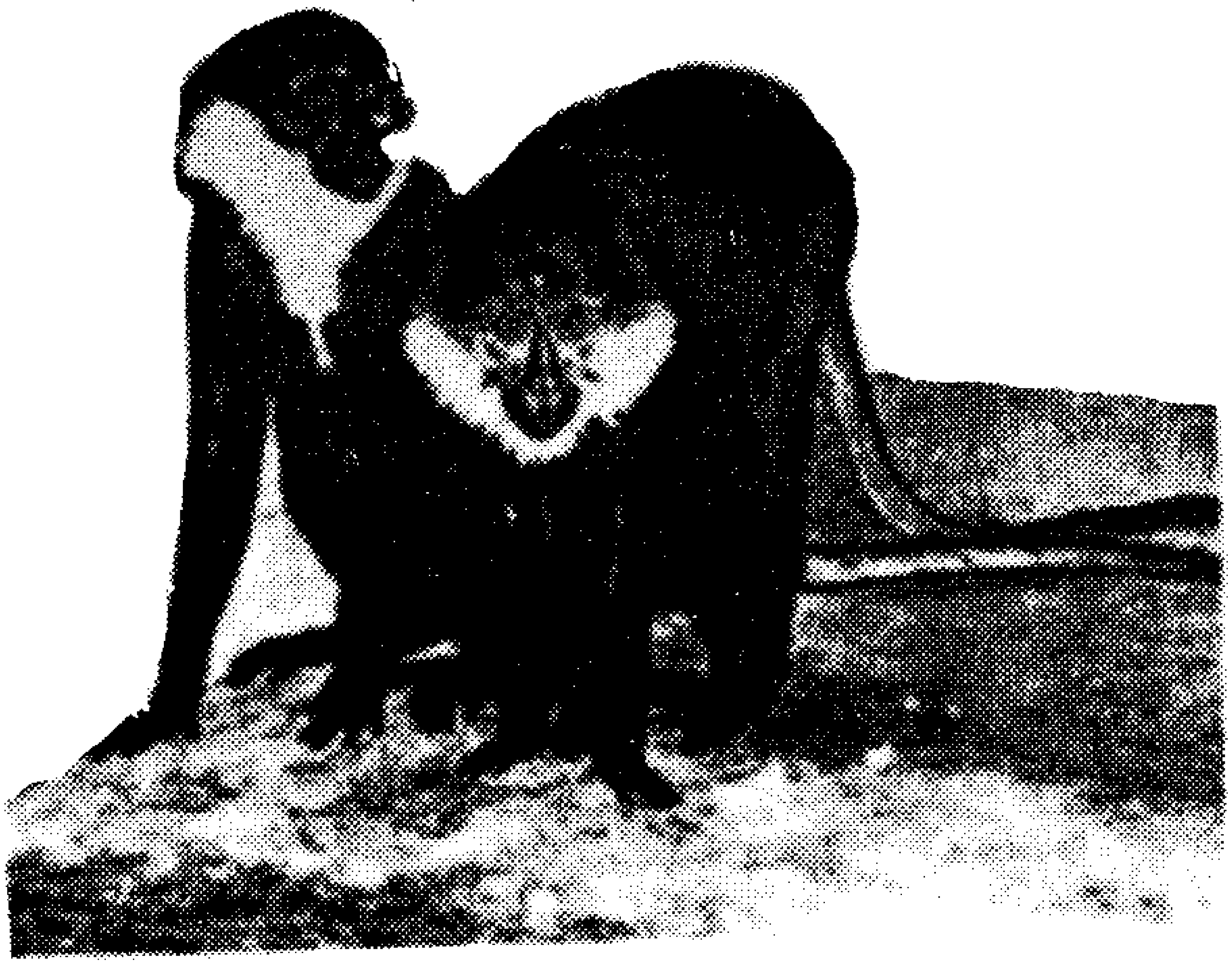

গেনন *(Cercopithecus thoesti)*

গেননরা সাহারা মরুভূমির দক্ষিণস্থ আফ্রিকার অধিবাসী। মোনা বানর (Mona monkey অর্থাৎ *Cercopithecus mona*) এবং সবুজ বানর *(C. sabaeces)* পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অনুপ্রবেশ করেছে। অধিকাংশ গেননা বৃক্ষবাসী এবং নদী-নালার পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে বাস করে।

ভারভেট *(C. pygerythrus)*, গ্রিভেট *(C. aethiops)* এবং সবুজ বানর মুখ্যত ভূমিতে বাস করে এবং উন্মুক্ত সাভানা তৃণভূমি বা জঙ্গলে বাস করে।

এইডস দেশ, জাতি, লিঙ্গ, বয়স সবকিছুর সীমারেখা ছাড়িয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। কি উন্নত, কি অনুন্নত সবদেশেই এইচআইভি তার কালো থাবা বিস্তার করে লক্ষ লক্ষ পুরুষ, মহিলা ও শিশু, বিশেষ করে ২০ থেকে ৪০ বছর বয়েসী লোকদের, আক্রান্ত করে। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয় মহিলা ও তরুণ, যারা ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ দিয়ে এ রোগকে ডেকে আনে।

এইডস প্রথম শনাক্ত করা হয় আমেরিকায়, ১৯৮১ সালে। অবশ্য এ রোগ প্রথম দেখা দেয় ১৯৭০ সালের শেষদিকে অফ্রিকার বিষুবীয় অঞ্চলে এবং ১৯৭৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে।

পরিসংখ্যান

এইডস রোগ ঘটে এইচআইভি সংক্রমণের শেষ পর্যায়ে এবং পৃথিবীতে এ রোগের ব্যাপক বিস্তার এটাই প্রমাণ করে যে বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য ব্যবস্থা খুবই নাজুক হয়ে পড়েছে। এইডস প্রথম দেখা দেওয়ার পর থেকে তা একশ গুণ–এর বেশি বেড়ে গেছে। ১৯৯৭ সালে পৃথিবীতে ২৯.৫ মিলিয়ন লোক এ রোগে আক্রান্ত ছিলো। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী ২০০০ সালে এ সংখ্যা হলো ৩০ – ৪০ মিলিয়ন। ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত এইআইভি আক্রান্ত মা প্রায় ২ মিলিয়ন আক্রান্ত শিশুর জন্ম দিয়েছেন। অপর এক হিসেবে প্রকাশ (Outlook, May, 2001, Path, USA) ২০০০ সালে ৩৬ মিলিয়ন লোক আক্রান্ত হয়েছে এবং এদের ৯৫% ভাগ উন্নয়নশীল দেশের নাগরিক। এছাড়া এই ২০০০ সালে শুধু এইডস রোগে মারা গেছে তিন লক্ষ লোক।

একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৬৫ থেকে ৭৫% ভাগ আক্রান্ত পূর্ণবয়স্ক যুবক প্রতিরক্ষা বর্জিত (unprotected) যৌন সঙ্গমের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়েছেন। পৃথিবীতে যত শিশু আক্রান্ত হয়েছে তার ৯০% ভাগ মা থেকে সরাসরি (mother to child transmission) এ রোগের শিকার হয়েছে। এইচআইভি দূষিত সিরিঞ্জ ব্যবহার করে আক্রান্ত হয়েছে শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ প্রাপ্তবয়স্ক এবং শতকরা ৩ থেকে ৫ ভাগ আক্রান্ত হয়েছে রক্ত বা রক্তজাত দ্রব্য দিয়ে। দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ায় এইচআইভি ও এইডস অনেক দেরিতে পৌঁচেছে, তাই এসব অঞ্চলে রোগীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। নিচে দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়াতে এইডস ও এইচআইভি সংক্রমণের একটি পরিসংখ্যান দেয়া হলো। পরিসংখ্যানটি জুন, ১৯৯৬ সালের বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক স্বাস্থ্য সমাচার (WHO Regional Health Report) থেকে সংগৃহীত :

দেশ	প্রথম সনাক্তকরণ	রোগীর সংখ্যা	এইচআইভি সংক্রমণ
বাংলাদেশ	১৯৮৯	৭	২০,০০০ এর কম
ভূটান	–	০	৭৫
কোরিয়া (DPK)	–	০	১০০ এর কম
ভারত	১৯৮৬	২০৯৫	১৭৫০,০০০
ইন্দোনেশিয়া	১৯৮৭	৯৫	৯৫,০০০
মালদ্বীপ	১৯৯১	৫	৬০
মায়নামার	১৯৮৮	১০৯৩	৩৫০,০০০
নেপাল	১৯৮৮	৪৪৮	৫,০০০
শ্রীলংকা	১৯৮৬	৬৩	৬,০০০
থাইল্যান্ড	১৯৮৫	২২,১৩৫	৭০০,০০০
মোট		২৫৫৪১	২৯০০,০০০ এর বেশি

এইচআইভি সংক্রমণের এ পরিসংখ্যানটি পুরানো হলেও এটি দিয়ে বিভিন্ন দেশে এইচআইভি সংক্রমণের অনুপাতিক হার সম্বন্ধে একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

বিগত ১১ই ডিসেম্বর ২০০২ সালে মেক্সিকো থেকে প্রকাশিত বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ২০০২ নামক প্রতিবেদনে ইউনিসেফ জানিয়েছে বাংলাদেশে শিশুসহ এইচআইভি আক্রান্তদের সংখ্যা তের হাজার (কিন্তু সরকারিভাবে ২৪৮ জন)। এর মধ্যে অনুর্ধ্ব ১৪ বছর বয়সী শিশু ৩১০ জন এবং অনাথ শিশু রয়েছে ২১০০ জন (প্রথম আলো, ১৮ই ডিসেম্বর, ২০০২)।

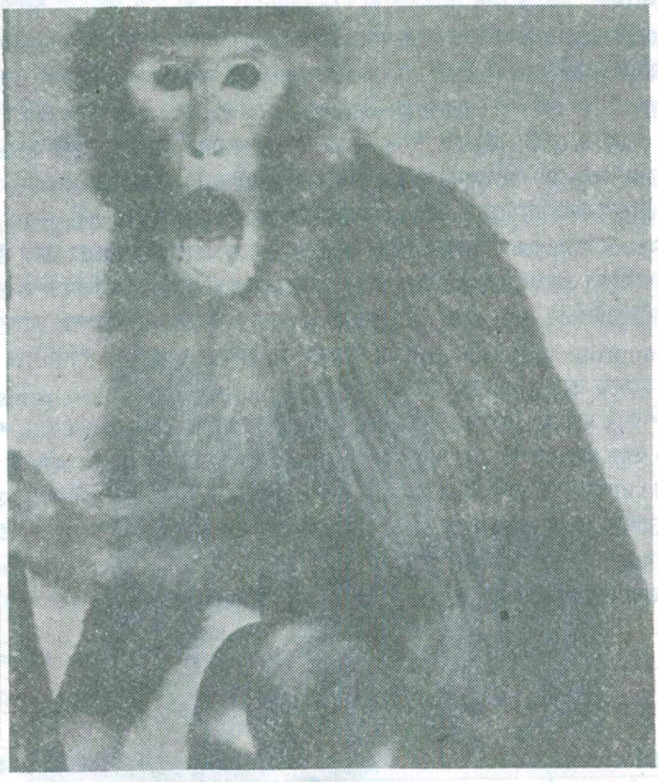

সিমিয়ান ভাইরাস বাহক পশ্চিম আফ্রিকার সবুজ বানর (*Macca mulatta*)

আকার ও রঙ

গেননরা হালকা দেহবিশিষ্ট ও লম্বা পদযুক্ত। এদের লম্বা লেজ ১২.৫ – ২৭.৫ ইঞ্চিবিশিষ্ট। মাথা ও দেহ যথাক্রমে ৩১.৫ – ৭০ সেমি. এবং ৩৫.৫ – ১০৯ সেমি.। এদের ওজন ২ –১৫.৫ পাউন্ড বা ৭৪৫ গ্রাম থেকে ৭ কেজি। মেয়ে বানরের ওজন একটু কম। সারা দেহে ঘন লোম এবং মুখে দাঁড়ি থাকতে পারে।

এদের দেহের রঙ সবুজ, হলুদ, লালচে এবং কালো হয় তবে মাঝে মধ্যে দেহে ডোরাকাটা দাগ থাকে।

প্রকৃতি

গেননরা ১০ বা ততোধিক সংখ্যায় দলবদ্ধ হয়ে যাতায়াত করে। ভোরে এবং বিকালে এরা খুব সক্রিয় থাকে এবং ফল, পাতা, শিকড়, শস্য কখনো বা পাখির ডিম, পাখির ছানা, ছোট সরীসৃপ, পোকা-মাকড় ইত্যাদি সংগ্রহ করে আহার করে। দলবদ্ধ দলটি রাতে ৩-৪ জনের ছোট উপদলে বিভক্ত হয়ে গাছে নিদ্রা যায়। এদের প্রধান শত্রু হলো আদিবাসী মানুষ, ঈগল এবং চিতাবাঘ।

সন্তান উৎপাদন

গেননরা সারা বছরই সন্তান উৎপাদন করে। সাধারণত ৬-৭ মাস গর্ভধারণ করে একটি বাচ্চা জন্ম দেয় এবং আরো ৬-৭ মাস তাকে লালন পালন করে। এসব ৩ থেকে ৫ বছর বয়সে সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হয়। আটক অবস্থায় গেননরা অনেকদিন বাঁচে এবং ২০ থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকার নজির রয়েছে।

জীবাশ্ম ইতিহাস

গেননরা দক্ষিণ এশিয়ায় প্রায় ৩০ লক্ষ বছর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলো এবং ২০ লক্ষ বৎসর পূর্বে তারা আফ্রিকাতে চলে যায়।

যাহোক, দেহ থেকে বের হয়ে আসা নানা ধরনের রসের মাধ্যমে এইডস একজনের দেহ থেকে আরেকজনের দেহে ছড়ায়। এ রস হতে পারে পায়খানা ও প্রস্রাব করার জায়গা থেকে নিঃসৃত রস, বীর্য ইত্যাদি। রক্তের মাধ্যমেও এইডস ছড়াতে পারে। গর্ভবতী ময়ের এইডস থাকলে তা তার সন্তানের দেহে রক্তের মাধ্যমে সঞ্চারিত হতে পারে। এইচ.আই.ভি.-এর মতো আরো একটি ভাইরাস রক্ত ও যৌন এলাকার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে ছড়ায় তা হলো হেপটাইটিস বি ভাইরাস। এটি যকৃত প্রদাহ ঘটায়।

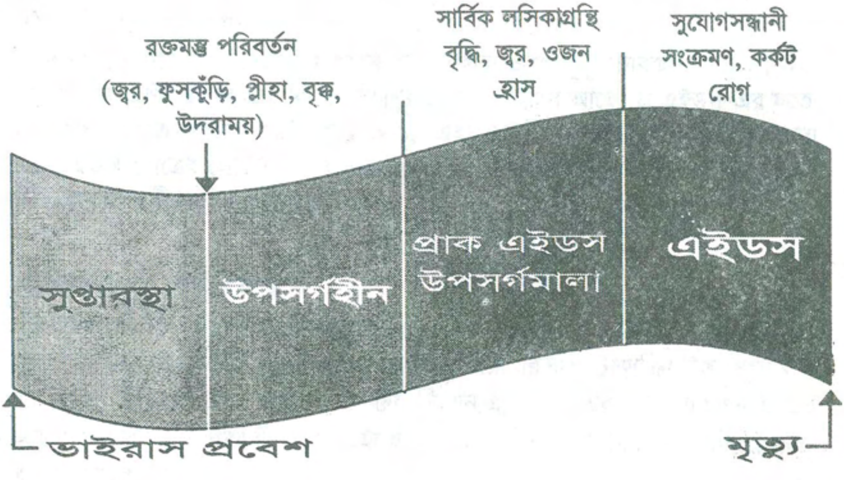

এইডস রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। এইডস প্রতিরোধ করার জন্য কোনো টিকাও এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। অর্থাৎ কারো এইডস হলে তিলে তিলে ধুঁকে ধুঁকে নিশ্চিতভাবেই সেই হতভাগ্য ব্যক্তিটি মারা যাবে। তাঁকে আর বাঁচানো যাবে না। তাই এইডসকে মৃত্যুদূত বললে অতুক্তি হয় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়
রেট্রোভাইরাস

এইচআইভি (HIV) বা হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (Human Immuno-deficiency virus) হলো একধরনের রেট্রোভাইরাস। রেট্রোভাইরাস এমন এক ধরনের প্রাণঘাতী ভাইরাস, যা মানুষ এবং উচ্চশ্রেণীর বানরজাতীয় প্রাণীর (Primates) দেহে অবস্থান করে। আসলে Retroviridae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ভাইরাসের সাধারণ নাম হলো রেট্রোভাইরাস। এগুলো প্রকৃতপক্ষে আরএনএযুক্ত ভাইরাস এবং এরা প্রাণীর দেহে এইচআইভি সংক্রমণ ঘটায়। এইচআইভি সংক্রমণের বিশেষত্ব হলো একবার সংক্রমণ হলে আক্রান্ত ব্যক্তি সারাজীবনই সংক্রমিত থাকে।

অ্যাকায়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম বা এইডস বলতে এইচআইভি সংক্রমণের শেষ পর্যায়কে বুঝায়। অর্থাৎ এইচআইভি সংক্রমণ ঘটলে সাথে সাথে কারো এইডস হবে না। আর এ কারণেই এইডস রোগী থেকে এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির সংখ্যা বেশি।

রেট্রোভাইরাসের একটি আবরণ থাকে। এই আবরণকে ক্যাপসিড নামে অভিহিত করা হয়। এই ভাইরাসের ব্যাস ৯০ থেকে ১২০ ন্যানোমিটার। Retroviridae গোত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এইচআইভি–১ (HIV-1), যেটি এইডস রোগের সংক্রমণ ঘটায়। অন্যান্য সদস্য হলো এইচআইভি–২ (HIV-2) ইমিউনো এবং সিমিয়ান ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (SIV), যা বানরে বিদ্যমান।

এগুলোও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ফেলে এবং শুধু বানরজাতীয় প্রাণী নয়, বিড়ালজাতীয় প্রাণী, ছাগল এমনকি গবাদিপশুরও রেট্রোভাইরাস আছে, যা এইডস–এর মতো রোগ সৃষ্ট করতে সক্ষম। এইচআইভি–১, এইচআইভি–২ এবং এসআইভি হলো রেট্রোভাইরাস গোত্রের লেন্টিভাইরাস (lerthdivirus) উপগোত্রের অন্তর্ভুক্ত লেন্টিভাইরাস হলো একধরনের ধীরগতি (slow) ভাইরাস।

রেট্রোভাইরাসের শ্রেণিবিভাগ

রেট্রোভাইরাসের রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ (Reverse transcriptagse) ও ইন্টিগ্রেজ (integrase) নামক দুধরনের উৎসেচক (enzyme)। অর্থাৎ এরা রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ সম্বলিত আর.এন.এ. ভাইরাস এবং আক্রান্ত ব্যক্তির ডি.এন.এ.–তে ভাইরাসের আর.এন.এ–এর প্রতিলিপি তৈরি করে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় এইচআইভি–এর প্রতিরূপ তৈরিকরণ (replication) এর চক্র দেয়া হলো :

৬। ঘনীভূত অণুচক্রিকা ৭। তাজা জমাট রক্তরস ৮। উৎপাদক ৮ ও ৯ ৯। ঘনীভূত শ্বেত রক্ত কণিকা ১০। স্বাভাবিক ইমিউনোগ্লোবিন

বয়স

সাধারণত ২০ থেকে ৪৯ বছরের যৌন সক্রিয় মহিলা বা পুরুষ এ রোগের প্রধান শিকার।

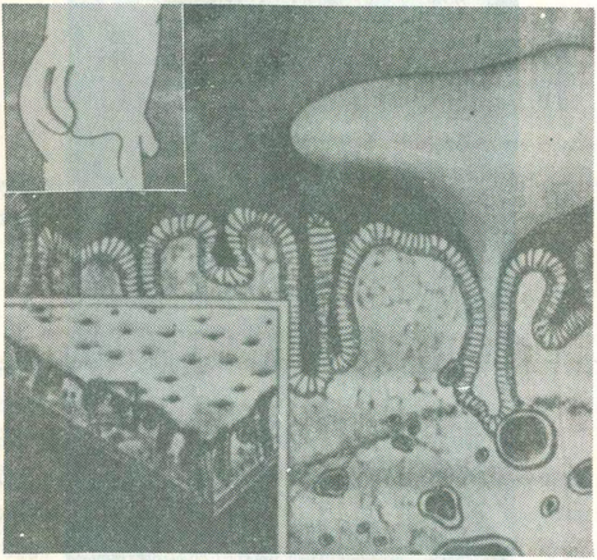

পায়ুকামের ফলে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ছিঁড়ে সহজেই এইডস ভাইরাস রক্তে প্রবেশ করে।

লিঙ্গ

মহিলাদের যৌনাঙ্গ পুরুষের চেয়ে বিস্তৃত হওয়ায় পুরুষের চেয়ে মহিলারা বেশি আক্রান্ত হয়। চর্ম বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ক্ষত থাকলে রোগাক্রান্ত হবার আশংকা বেশি। একই কারণে ঋতুবতী মহিলারা বেশি রোগগ্রস্ত হন। এছাড়া ৪৫–এর উর্ধ্ব বয়স্ক মহিলাদের যৌন এলাকার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী পাতলা হয়ে যায় বলে তারা সহজেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন। আফ্রিকার নিম্ন–সাহারা অঞ্চলে এইচআইভি আক্রান্তদের অর্ধেকই তরুণ, কেননা এসব কিশোর–কিশোরী প্রায়শই এসব রোগের সঠিক তথ্য থেকে বঞ্চিত এবং তাদের কেউ পরামর্শ সভায়ও ডাকে না। অবিবাহিত বলে পরিবার পরিকল্পনা অফিসেও তারা পা রাখতে পারে না, অথচ এদের অনেকেই সক্রিয়ভাবে যৌনকর্মে অংশগ্রহণ করে থাকে। এই তরুণ সমাজকে সচেতন করতে হবে এবং সঠিক তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তি সংক্রমণের প্রথমদিকেই বেশি বিপজ্জনক থাকে কেননা তখনো তার দেহে প্রতিরক্ষিকা বা অ্যান্টিবডি তৈরি হয় নি বলে পরীক্ষাগারে তার রোগ ধরা পড়ে না। তাই সে নিজেকে সুস্থ বলে মনে করে। ফলে নিজের অজান্তে যৌন সংসর্গের মাধ্যমে সে রোগ ছড়িয়ে চলে। এ সময়টাকে বিপজ্জনক সময় বা উইন্ডো পিরিয়ড (window period) বলে। তাছাড়া রোগের শুধু প্রথম দিকে নয় শেষ দিকেও অর্থাৎ রোগ যখন খুব বেড়ে যায় তখন আক্রান্ত ব্যক্তি খুবই সংক্রমণপ্রবণ থাকেন, কেননা তার রক্তে তখন ভাইরাসের মাত্রা থাকে অঢেল।

সমকামীদের এইডস রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সানজুয়ানের দুজন সমকামী।

রক্তের ছোঁয়া

দূষিত রক্ত, রক্ত কণিকা, অণুচক্রিকা, রক্তরস থেকে আহরিত উৎপাদক ৮ এবং ৯ দেহে সঞ্চারিত করলেও পরিণামে এইডস হতে পারে। তবে অ্যালবুমিন, ইমিউনো-গ্লোবিউলিন রক্তজাত হলেও তা থেকে এইডস হবার সম্ভাবনা নেই।

এক একক দূষিত রক্ত বনাম এইডস

রক্ত সঞ্চালন করার আগে শুধু গ্রুপ এবং আরএইচ ফ্যাক্টর জানলেই চলে না। সে রক্ত উপদংশ মুক্ত কি না (ভিডিআরএল পরীক্ষা) তথা যকৃত প্রদাহের ভাইরাস (এইচবিএসএজি, HbsAg) এবং এইচআইভি সংক্রমিত কি না তাও নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। এক একক এইচআইভি দূষিত রক্ত সঞ্চালন করলে এইডস হবার আশংকা থাকে শতকরা ৯৫ শতকরা ভাগ। কেউ সংক্রমিত হবে কি না তা নির্ভর করে কি পরিমাণ (dose) ভাইরাস তার দেহে প্রবেশ করেছে তার উপর।

আকুপাংচার, নাক-কান ফুটো করা ইত্যাদি

দূষিত সিরিঞ্জ বা নাক-কান ফুটো করা, উল্কি দেয়া, আকুপাংচার ইত্যাদিতে ব্যবহৃত চর্মবিদ্ধকারী যন্ত্র দিয়েও আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকে, তবে রক্তের তুলনায় তা অনেক

কম। অবশ্য মাদকাসক্ত, যারা একই সিরিঞ্জের সূঁচ দিয়ে ভাগাভাগি করে কয়েকজন মিলে হিরোইন, কোকেন ইত্যাদি নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করে, তাদের ঝুঁকি অনেক বেশি। একই দিনে একাধিকবার সূঁচ বিদ্ধ করে তারা এসব ওষুধ গ্রহণ করে বলে তাদের সংক্রমণ মাত্রা অনেক বেশি থাকে।

মা-শিশু সংক্রমণ

প্রতিদিন ১৪,৫০০ নতুন লোক এইচআইভি দিয়ে সংক্রমিত হয় এবং তাদের ১১% হলো শিশু। এদের অধিকাংশই মা থেকে এ ভাইরাস উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে। সাম্প্রতিক এক হিসাব অনুযায়ী এ পর্যন্ত তিন লক্ষের বেশি শিশু এভাবে আক্রান্ত হয়েছে। গর্ভাবস্থায় গর্ভফুল বা প্লাসেন্টা দিয়ে, জন্মকালে বা জন্মের পর স্তন্যদানের সময় মা থেকে শিশুতে সংক্রমণ এইডস ব্যাপকভাবে সংক্রমিত হয়।

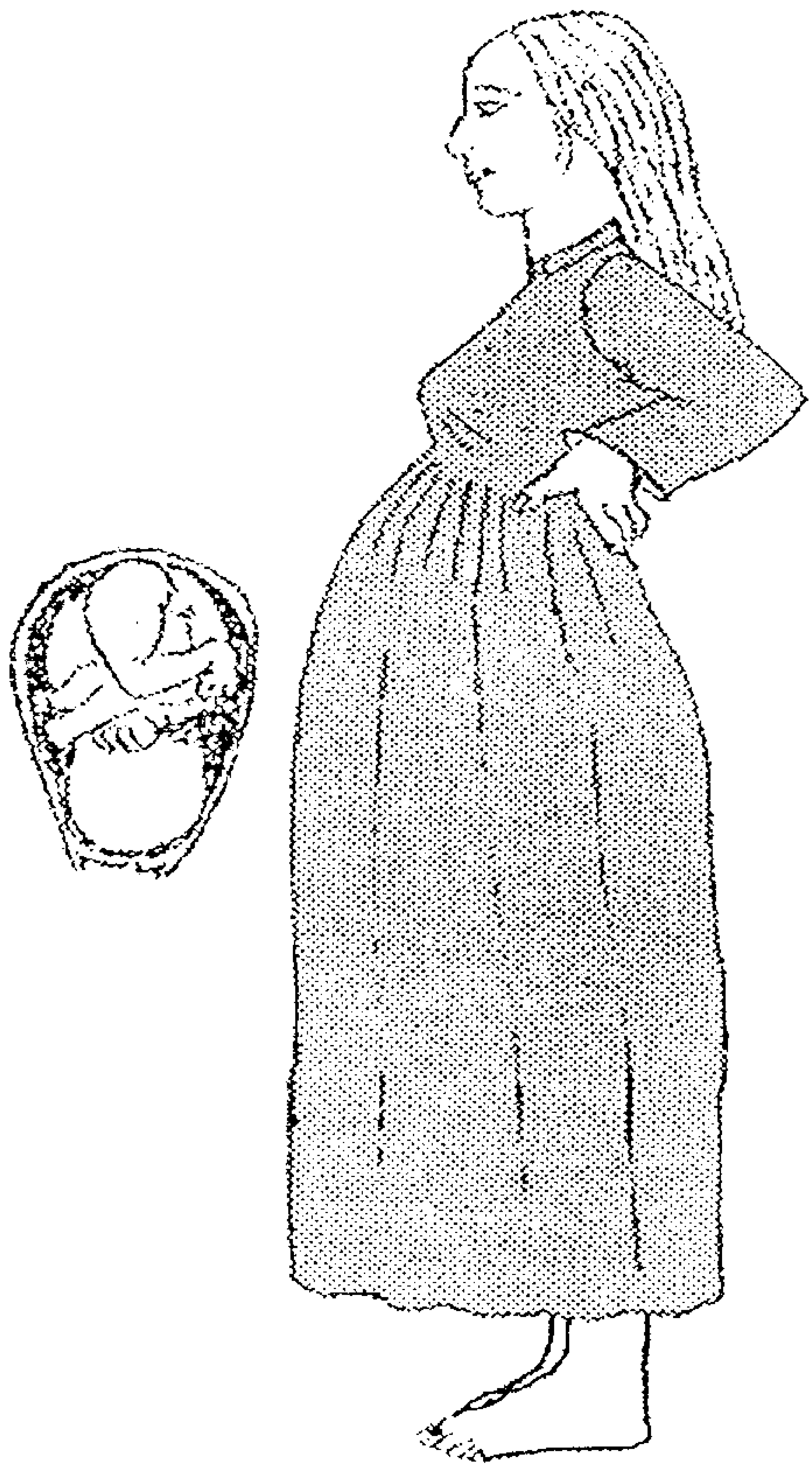

আক্রান্ত মা থেকে গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে বা বুকের দুধের মাধ্যমে শিশুর দেহে এইডস ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে।

উল্লম্ব সংক্রমণ (vertical transmission)

[illegible] সন্তান সংক্রমিত হওয়াকে [illegible] উল্লম্ব সংক্রমণ (perinatal / vertical transmission) বলে। [illegible] অবস্থায় [illegible] বেশি [illegible] পদ্ধতিতে প্রমাণ করা হয়েছে। তারা [illegible] নতুনভাবে আক্রান্ত হলে বা তার দেহে এইডস [illegible] সংক্রমণের আশঙ্কা বেশি থাকে।

পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, এইচআইভি [illegible] সন্তানের [illegible] একটি সন্তান এইচআইভি সংক্রমিত থাকবে [illegible] (দেখুন: Textbook of Community Medicine and Public Health, 1992)।

এইচআইভি সংক্রমণ ছড়ানোর প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি

যৌনসঙ্গম

* পায়ুপথে
* যোনি পথে

দূষিত রক্ত ও রক্তজাত দ্রব্য

* রক্তভরণ
* রক্তজাত দ্রব্য গ্রহণ (যথা: উৎপাদক ৮ বা Factor VIII)

দূষিত সূঁচ এবং সিরিঞ্জ

* সিরিঞ্জ দিয়ে ওষুধ গ্রহণ
* সূঁচ বিদ্ধ হওয়া
* অপর্যাপ্ত নির্বীজন করা ডাক্তারি যন্ত্রপাতি

অঙ্গ এবং কলাতন্ত্র দান

* বীর্য
* বৃক্ক, চর্ম, অচ্ছোদ পটল (কর্নিয়া)

মা হতে শিশুতে

* জরায়ু অভ্যন্তরে
* জন্মকালে
* স্তন্যদান

BANSDOC Library Dhaka

চতুর্থ অধ্যায়

এইডস বিস্তারের প্রতিবন্ধকতা

যেভাবে এইচআইভি ছড়ায় না

এইডস রোগ নিঃসন্দেহে একটি ভয়াবহ রোগ, একটি মরণব্যাধি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এইডস রোগ ব্যবস্থাপনায় শঙ্কা বা ভয়ের তেমন কোনো কারণ নেই। এইডস সম্পর্কে শঙ্কা বা ভয়ের অন্যতম কারণ এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের ব্যাপক অজ্ঞতা। এইচআইভি-কে যারা বেশি ভয় পায় তাদের জেনে রাখা উচিত এইডস রোগীর সাথে হাত মেলালে, সাঁতার কাটলে, তার জামা-কাপড়, টেলিফোন বা পায়খানার আসন (toilet seat) ব্যবহার করলে, একত্রে খাদ্য খেলে কেউ সংক্রমিত হবেন না। খাদ্য, পানীয়, মশা, মাছি উকুন, আরশোলা, তেলাপোকা বা অন্য কীটপতঙ্গ দিয়ে কখনোই এইচআইভি ছড়ায় না। হালকা চুমু খেলে এইডস হয় না তবে সাবধানতা হিসেবে মুখ খুলে দৃঢ় চুম্বন (যাতে লালা বিনিময় হয়) না করাই ভালো, কেননা লালাতে এইডসের ভাইরাস থাকে।

এইডস ভয়ংকর সংক্রামক ব্যাধি কিন্তু নিম্নবর্ণিত উপায়ে এইডস ভাইরাস ছড়ায় না :

* হাতে হাত মিলালে বা কোলাকুলি করলে ;
* একসাথে বসবাস, খাওয়া দাওয়া বা খেলাধূলা করলে ;
* একই পাত্রে আহার করলে ;
* একত্রে সাঁতার কাটলে বা গোসল করলে ;
* পোকা বা মশা কামড়ালে ;
* হাঁচি বা কাশি দিলে ;
* বিড়াল, কুকুর বা গৃহপালিত পশু-পাখির সংস্পর্শে আসলে বা হাত দিয়ে ধরলে ;
* এইডস রোগীর সাথে একই বিছানায় ঘুমালে বা রোগীর জামা-কাপড়, তোয়ালে-গামছা ব্যবহার করলে ;
* জনাকীর্ণ বাসে যাতায়ত করলে ;
* এইডস রোগী ব্যবহার করে এমন পায়খানা বা প্রস্রাবখানা ব্যবহার করলে ;
* এইডস রোগীদের স্পর্শ করলে ;
* চুমু খেলে (তবে থুথু বা লালা বিনিময় হলে হতে পারে) ;
* রক্তদান করলে (সূঁচ নির্বীজন করা হতে হবে) ;

এভাবে এইডস হয় না

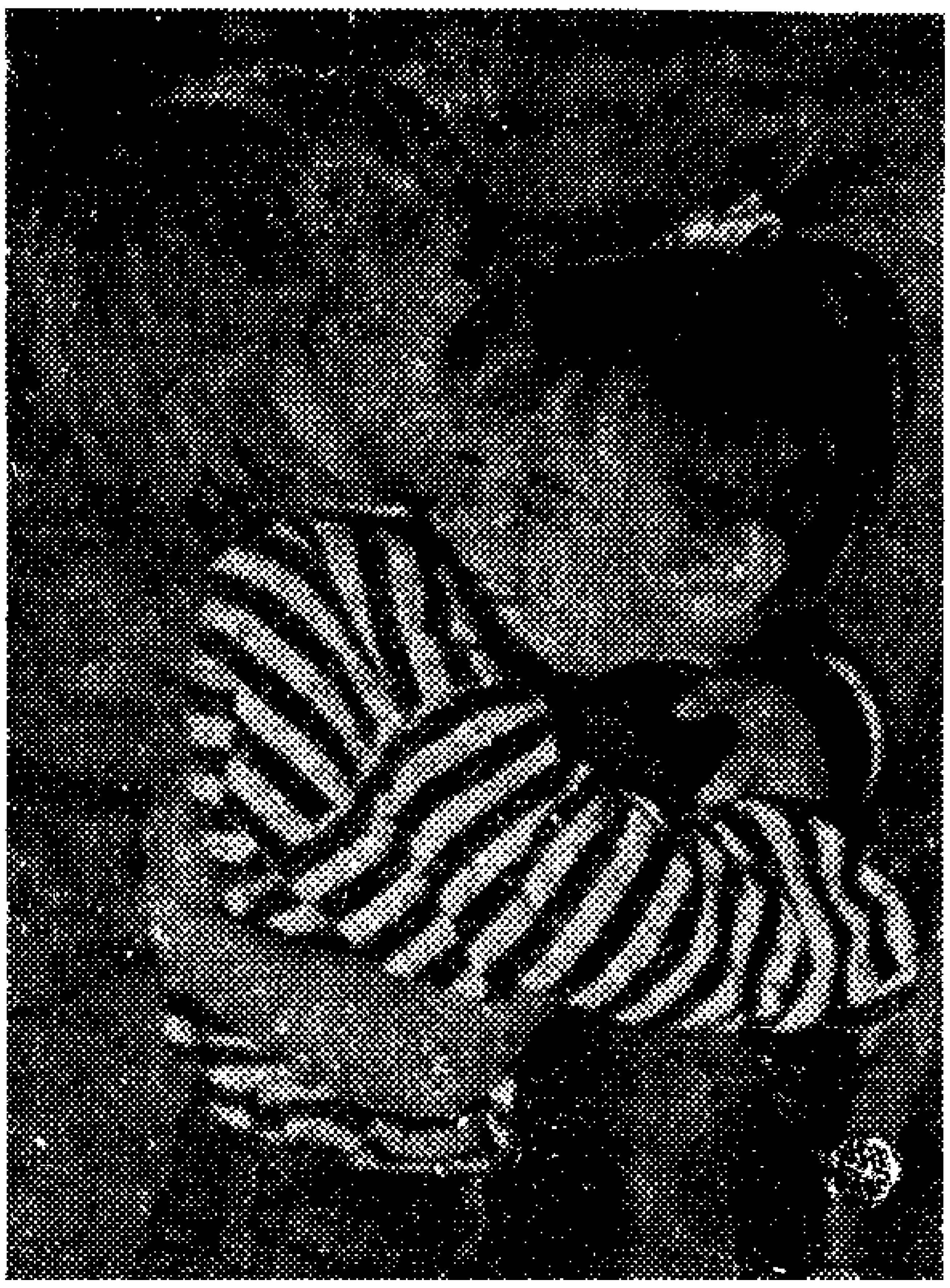

কোলাকুলি করলে

হাত মিলালে

কর্মক্ষেত্রে একইসাথে কাজ করলে

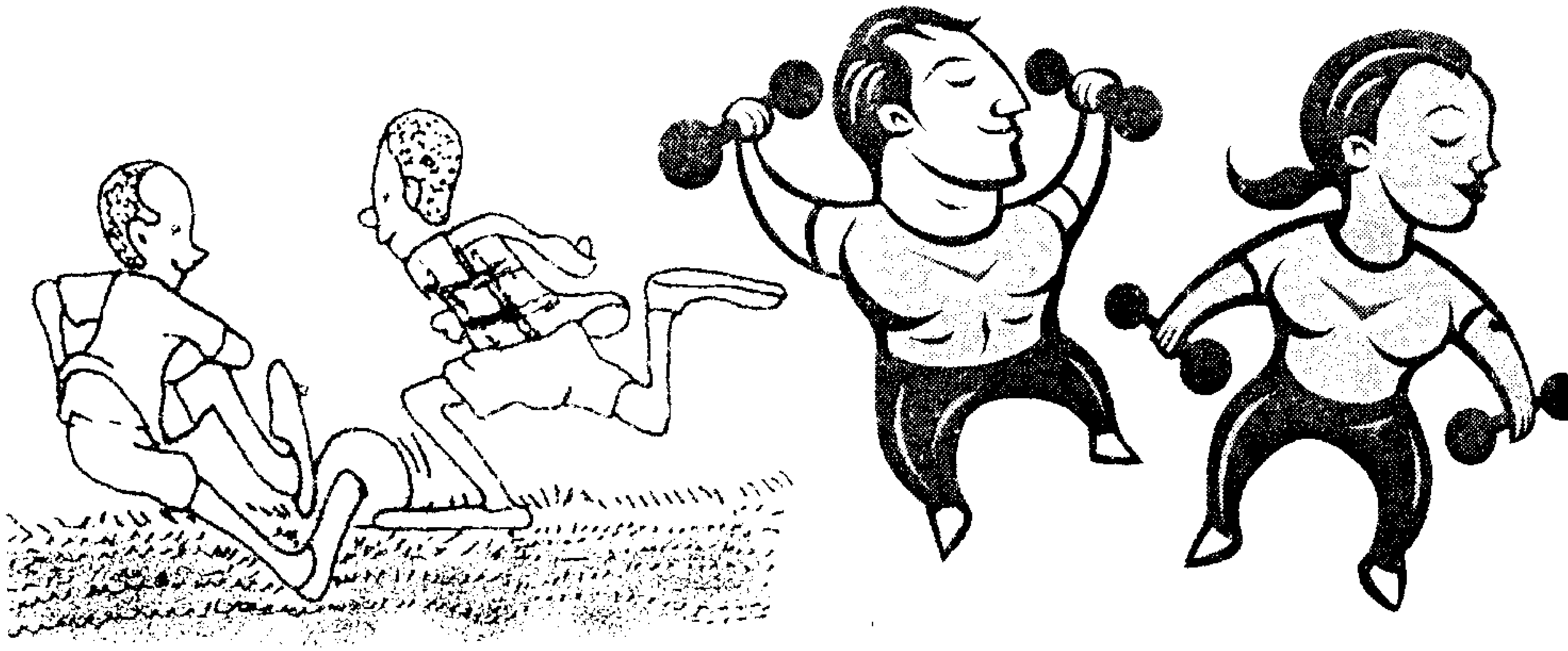

একসাথে খেলাধুলা করলে

একসাথে খাওয়া-দাওয়া করলে

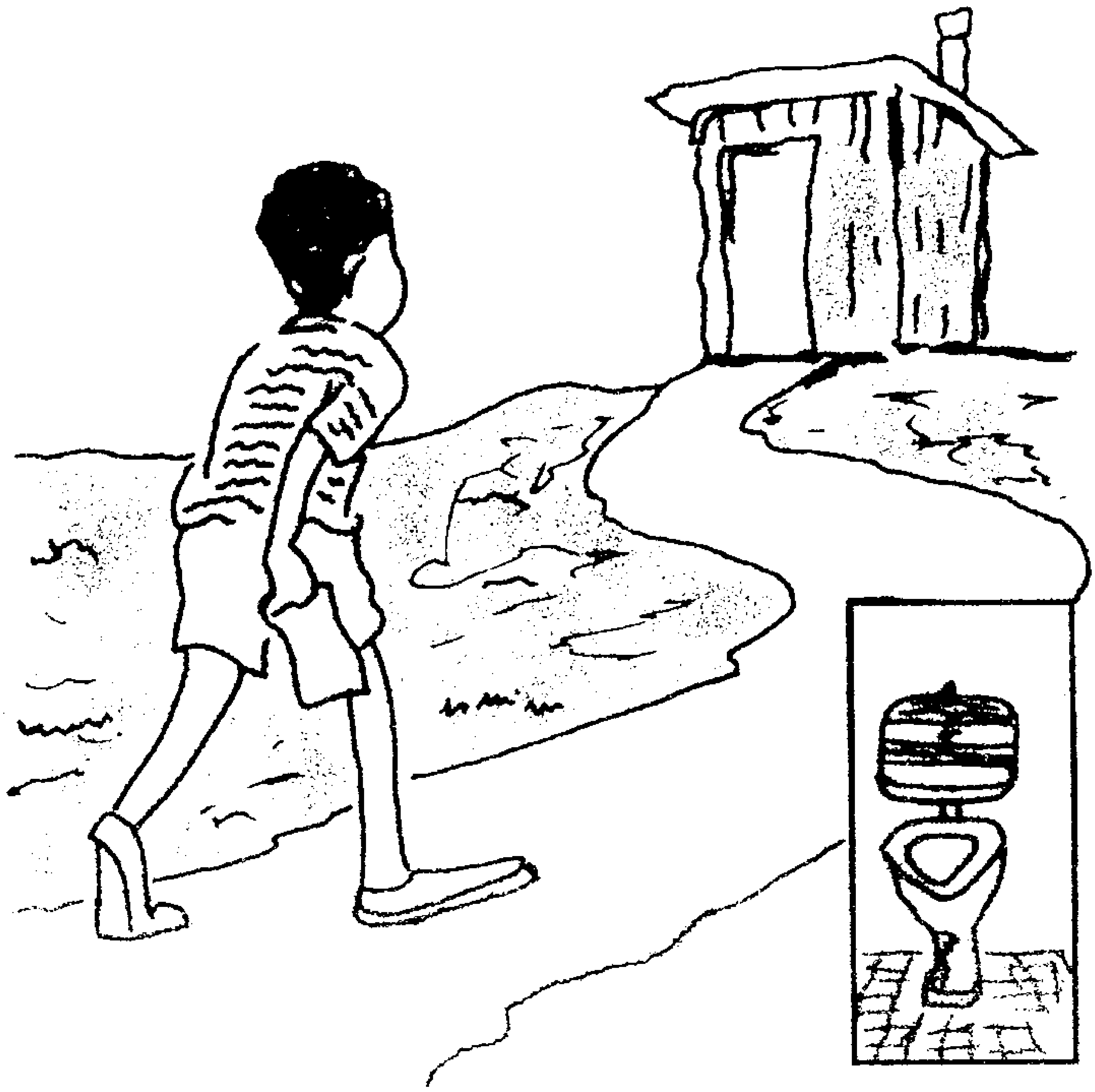

একই পায়খানা ব্যবহার করলে

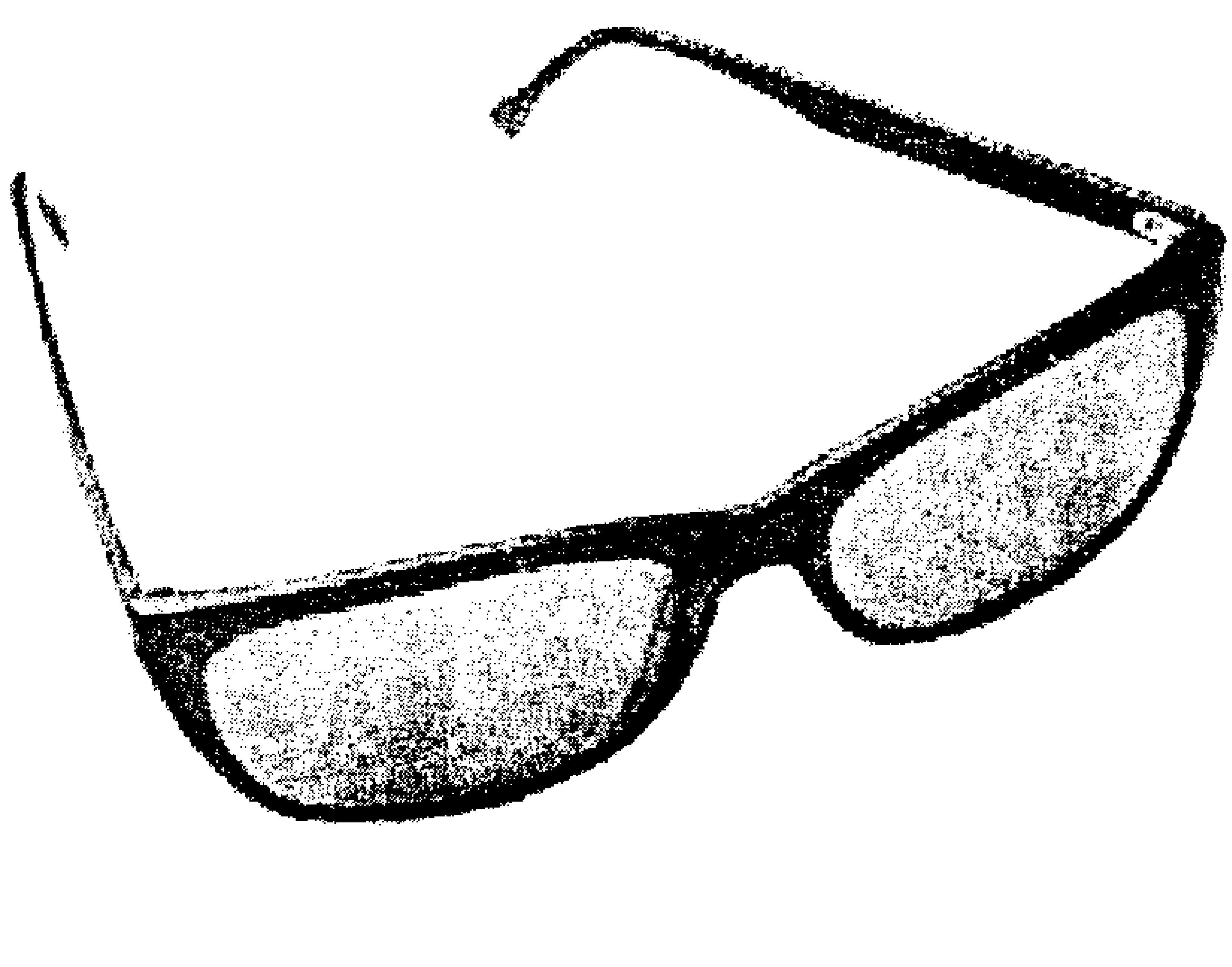

চশমা ব্যবহার করলে

একই চিরুনী দিয়ে মাথা আঁচড়ালে

কুকুর বিড়ালের সংস্পর্শে আসলে

চিকিৎসক রোগীকে পরীক্ষা করলে

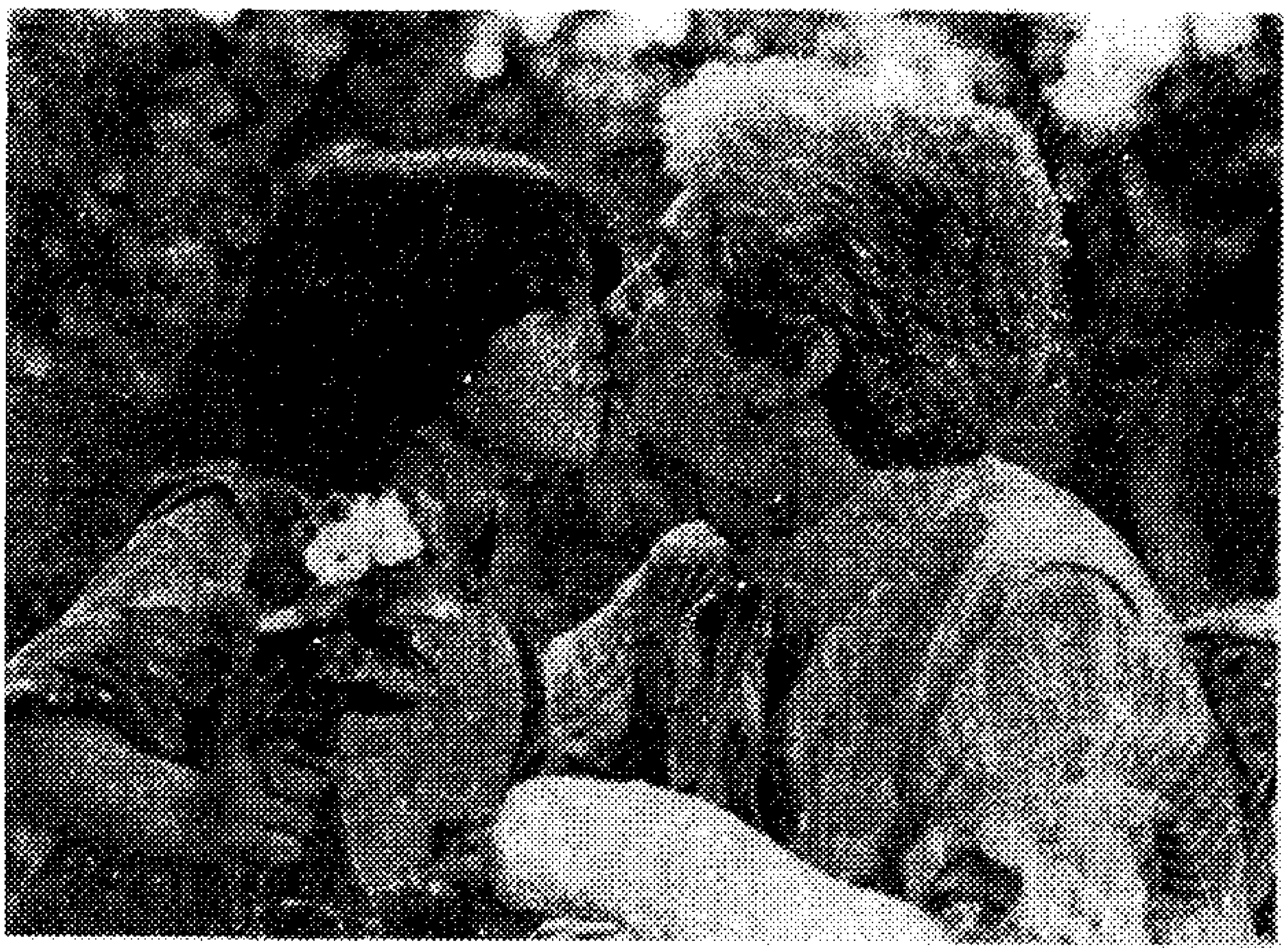

হালকা চুম্বন করলে (লালা বিনিময় না হলে)

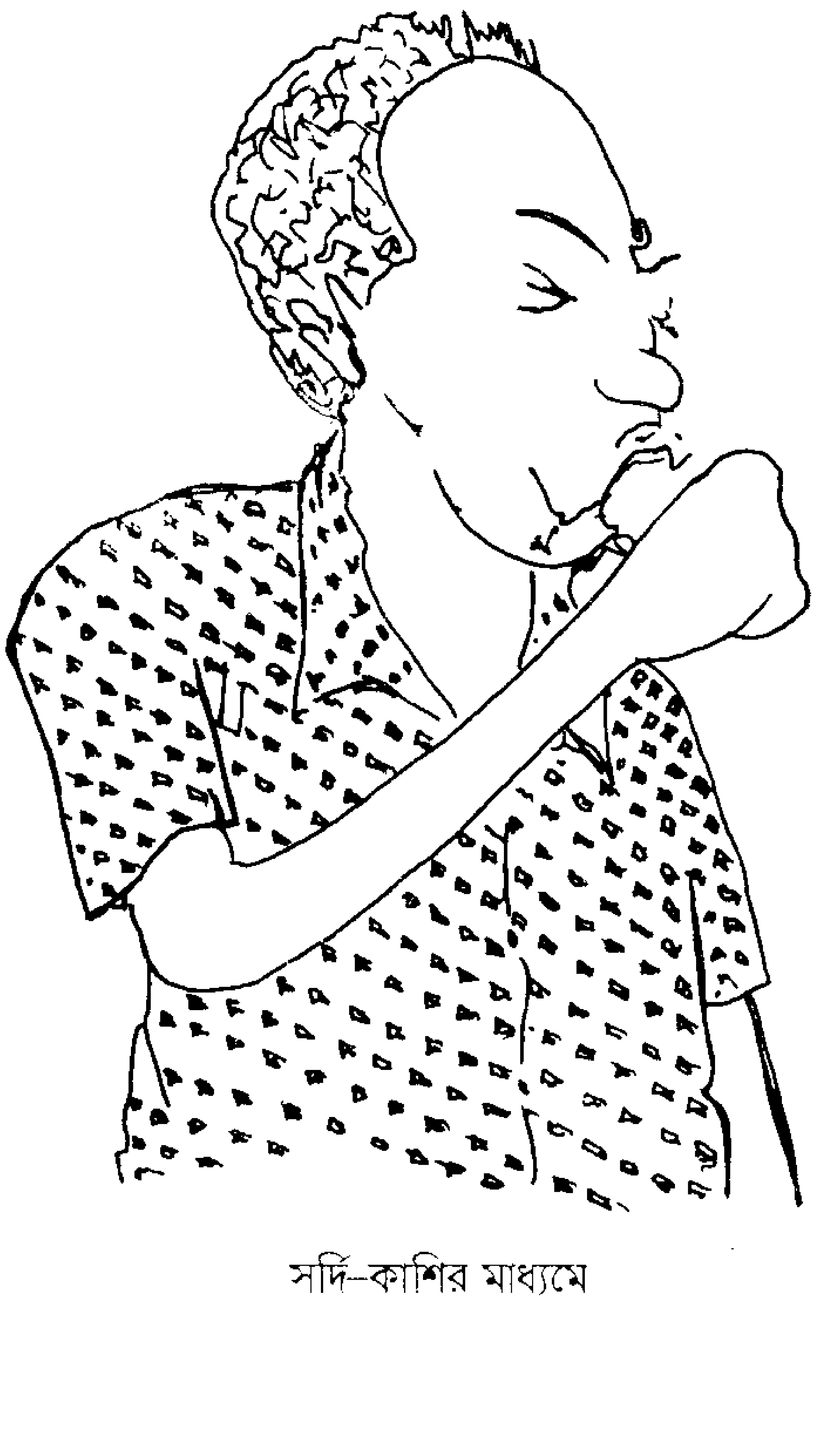

সর্দি–কাশির মাধ্যমে

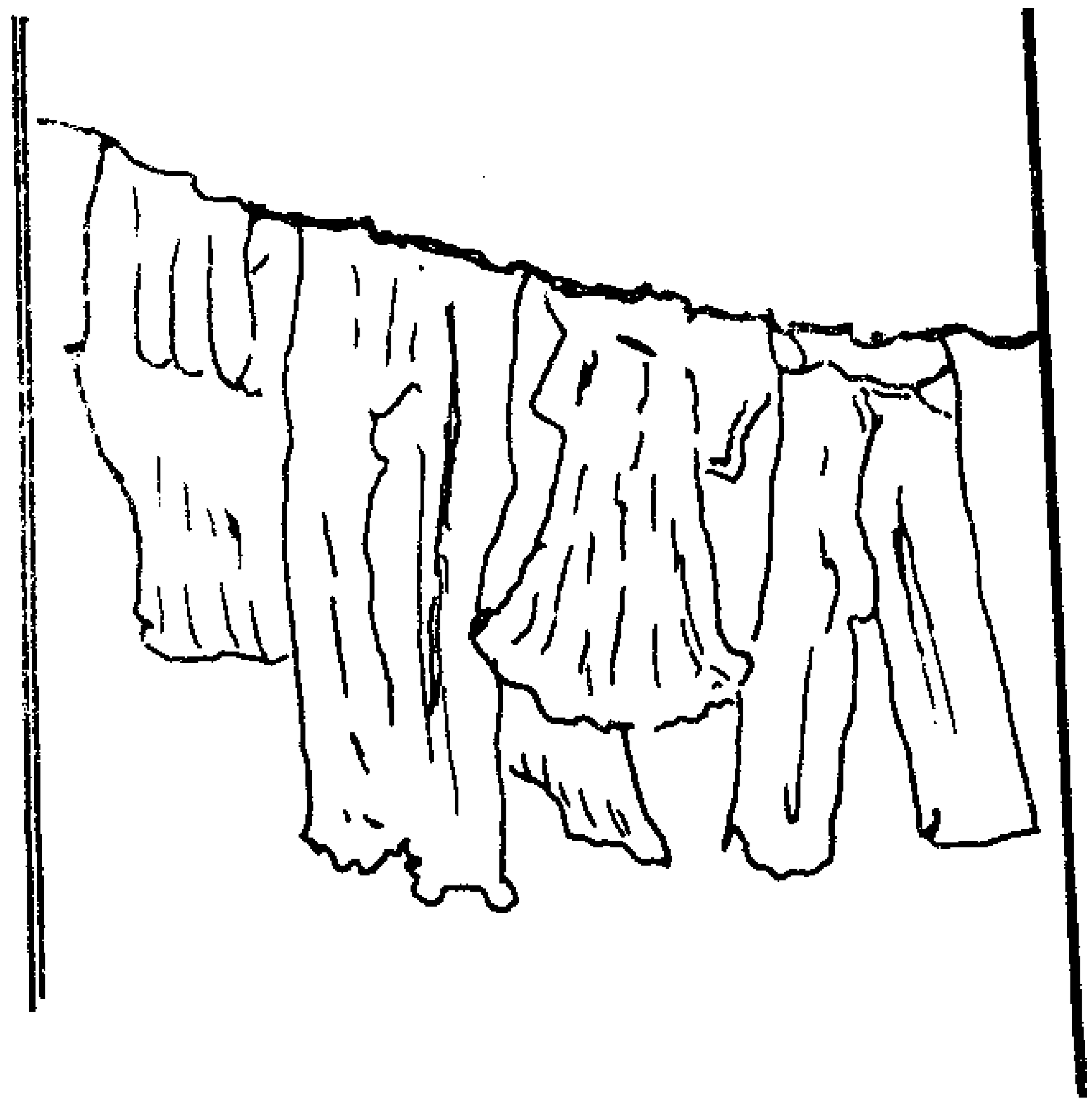

আক্রান্ত ব্যক্তি কাপড়-চোপড় ব্যবহার করলে

একই পাত্রে খাদ্য গ্রহণ করলে

ভীড়ের মধ্যে বাসে উঠলে

আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে গোসল করলে

হাঁচি দিলে

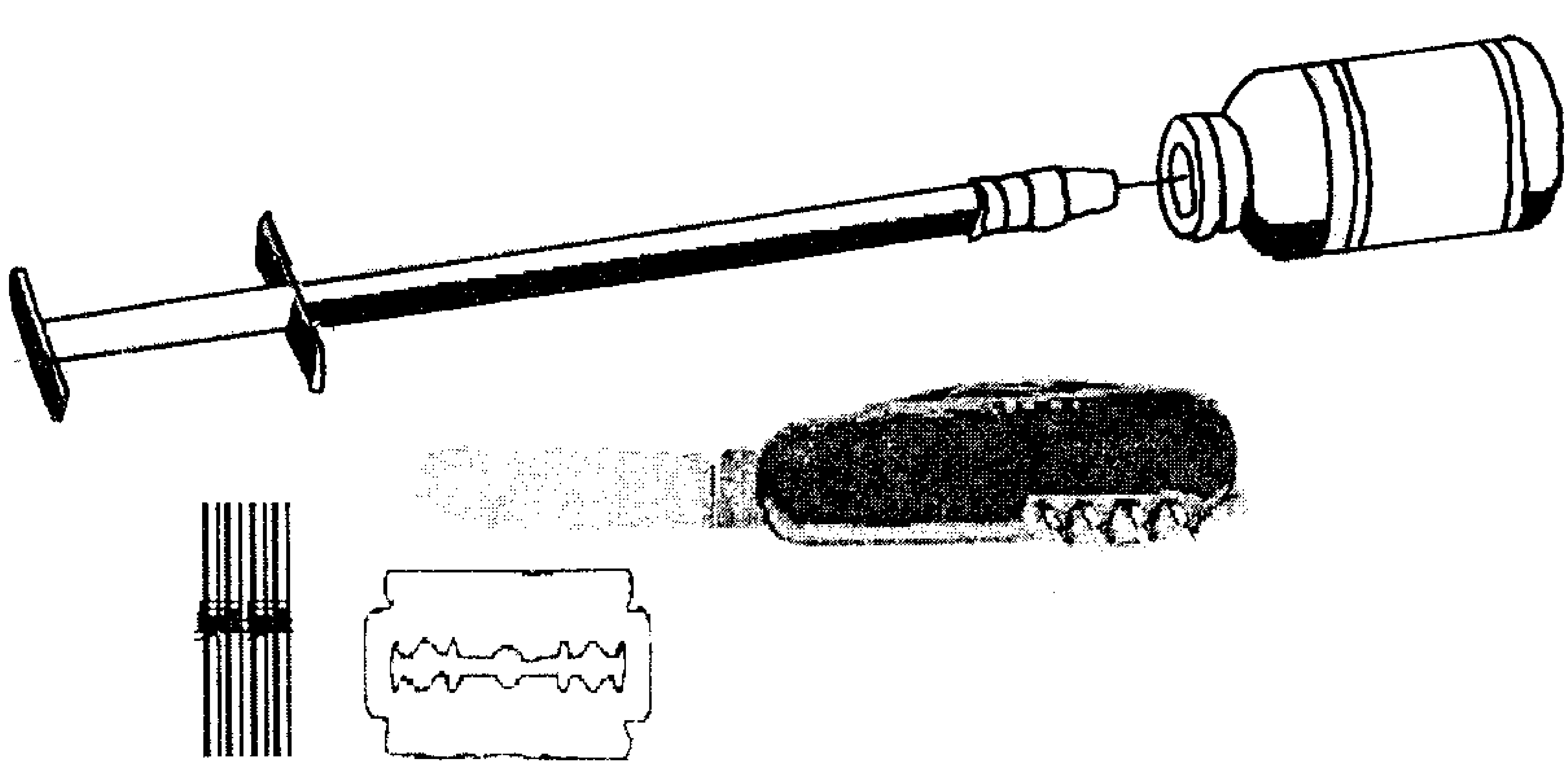

নির্বীজনকৃত সিরিঞ্জ, ছুরি ইত্যাদি ব্যবহার করলে

পঞ্চম অধ্যায়

এইচআইভি ও স্তন্যদান

মাতৃস্তন্যে শিশুর ন্যায্য অধিকার। মাতৃদুগ্ধের কোনো বিকল্প নেই। মাতৃদুগ্ধের স্বপক্ষে প্রচারের জন্য তাই দেশ-বিদেশে ব্রেস্ট ফিডিং ফাউন্ডেশনসহ নানারকম সংগঠন গড়ে উঠেছে। Breast Feeding-এর নানারকম উপকারিতা মূল শব্দটির মাঝেই নিহিত যথা -

B est for baby
শিশুর জন্য সেরা

R educes incidence of allergies
বিরূপ প্রতিক্রিয়া কমায়

E conomical---no waste
অর্থ সাশ্রয় করে

A ntibodies--greater immunity to infections
প্রতিরক্ষা, নানারকম সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা বাড়ায়।

S tool inoffensive never constipated
দুর্গন্ধমুক্ত মল। কখনো কোষ্ঠ-কাঠিন্য হয় না।

T empeature always correct and constant
দেহের তাপমাত্রা সর্বদা সঠিক ও স্থির থাকে।

F resh milk-- never goes sour in the breast
তাজা দুধ। স্তনে কখনো টক হয়ে যায় না।

E motionally bonding
আবেগে বন্ধনে মা ও শিশুকে আবদ্ধ করে।

E asy once established
স্তনে একবার দুধ আসলে তা সহজলভ্য থাকে।

D igested easily within two to three hours
২ বা ৩ ঘন্টার মাধ্যে সহজেই হজম হয়ে যায়।

I mmediately available
তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়।

N utritionally balanced
সুসম পুষ্টিকর খাদ্য

G astroenteritis greatly reduced
অধিক হারে উদরাময় হ্রাস করে।

সূত্র: TIBS সাপোর্ট গ্রুপ, ত্রিনিদাদ

কিন্তু স্তনের দুধের এতো উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও এইচআইভি সংক্রমিত মায়ের দুধ তার সন্তানকে দেওয়া যাবে না।

এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমিত মা থেকে তার শিশুর দেহে প্রবেশ করতে পারে। একে বলা হয় মা-শিশু সংক্রমণ (Mother to Child transmission) বা MTCT এ ধরনের সংক্রমণ গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে বা স্তন্যদানের সময় ঘটতে পারে। নেভিরাপিন (Nevirapine) ওষুধ এ সংক্রমণ হ্রাস করতে সক্ষম।

যতো বেশিদিন স্তনের দুধ পান করানো হবে ততো বেশি শিশুর আক্রান্ত হবার আশঙ্কা বাড়বে। এ হিসেবে প্রথম ছয় মাসে ৫%, প্রথম বারো মাসে ১০% এবং ২৪ মাস পর্যন্ত দুধ পান করালে ১৫ থেকে ২০% আক্রান্ত হবার ঝুঁকি থাকে।

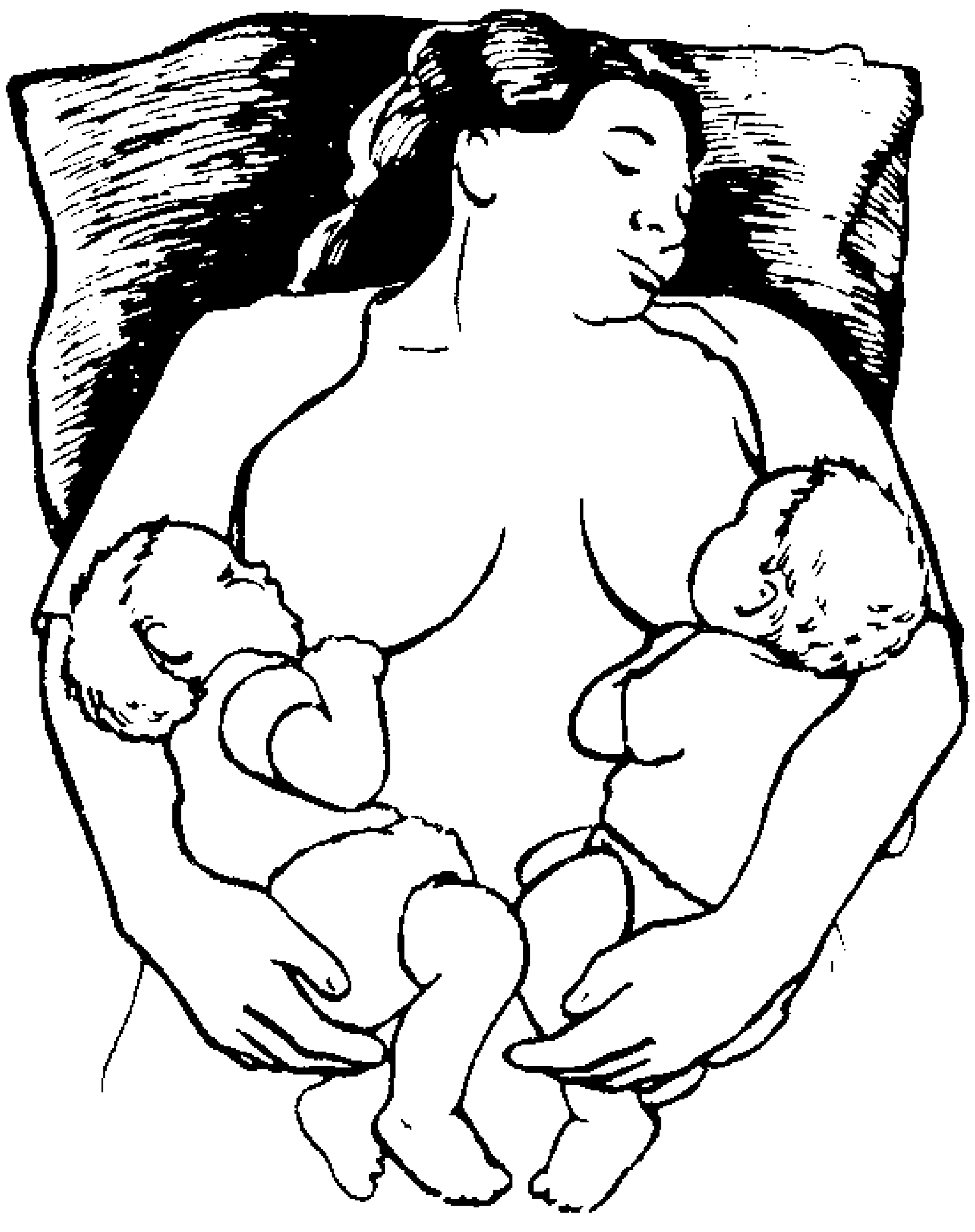

মা যমজ শিশুকে স্তন পান করাচ্ছেন

শিশুকে কেবল স্তন পান করালে ঝুঁকি কিছুটা কমে। কিন্তু স্তনের বোঁটা ফাটা থাকলে বা তা দিয়ে রক্ত বের হলে ঝুঁকি বেড়ে যায়।

গর্ভকালীন বা স্তন্যদানকালীন মা সংক্রমিত হলে ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

মা-এর প্রতিরক্ষা দুর্বল থাকলে, পুষ্টিহীনতা থাকলে বা এইচআইভি রোগের চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকলে ঝুঁকি বাড়ে।

এইচআইভি সংক্রমিত মা যদি দরিদ্র হন তবে স্তন দুধের পরিবর্তে শিশুকে কি দিবেন তা এক বিরাট সমস্যা। স্তন পান না করালে শিশুকে এইচআইভি সংক্রমণ থেকে হয়তো বাঁচানো যাবে, কিন্তু সে হবে দুর্বল এবং অন্য যে-কোনো রোগে সে সহজেই আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারে। ইউনিসেফ হিসাব করেছেন, যে স্তন পান করে এইচআইভি আক্রান্ত হয়ে যতো না শিশু মৃত্যুবরণ করে তার চেয়ে বেশি মারা যায় স্তন পান না করে।

এইচআইভি আক্রান্ত মার সাথে স্তন্য পানের বদলে তার কাছে কি কি বিকল্প আছে তা নিয়ে আলোচনা করা অতি গুরুত্বপূর্ণ। অনেক দরিদ্র মায়ের ক্ষেত্রে দেখা যাবে স্তনদান ছাড়া তার কোনো উপায় নেই। সেক্ষেত্রে মা তার স্তন চেপে দুধ বের করে একটি পাত্রে ফুটানোর পর শিশুকে পান করাতে পারেন। এটি যথেষ্ট নিরাপদ পন্থা। ব্রাজিলে দরিদ্র মায়েরা এ নীতি অনুসরণ করে যথেষ্ট উপকার পেয়েছে। সঙ্গতিসম্পন্ন মায়েরা তাদের সন্তানকে স্তনের দুধের পরিবর্তে গুঁড়ো দুধ দিতে পারেন।

স্তনের দুধে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (immune factors) তথা উচ্চমাত্রায় পুষ্টি থাকে।

স্তন্যপায়ী শিশু খুব কমই উদরাময় বা ফুসফুসের প্রদাহে (নিউমোনিয়া) ভোগে তবে এইচআইভি সংক্রমিত হবার আশঙ্কা থেকে যায়। তবে নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে সংক্রমণ আশংকা কমে যায় —

* স্তনের দুধ বের করে ফুটিয়ে পান করালে

ফিলিপাইনে একজন স্বাস্থ্যকর্মী কিভাবে শিশুকে স্তন চেপে দুধ বের করে ফুটিয়ে খাওয়াতে হয় তা দেখিয়ে দিচ্ছে।

* স্তনের দুধ ব্যতীত অন্য কিছু যথা পানি বা অন্য পানীয় পান না করালে
* স্তনের স্বাস্থ্যসম্মত পরিচর্যা করে এবং প্রয়োজনে যথাযথভাবে স্তনে শিশুর মুখ স্থাপন করে পান করালে ;
* স্তনে ফাটল (cracks) বা শিশুর মুখে ছত্রাক অধ্যুষণ (thrush)-এর অনতিবিলম্বে চিকিৎসা করালে।
* স্তনদানের সময় মা নতুনভাবে এইচআইভি সংক্রমিত হওয়া এড়িয়ে চললে ;

* যথাসম্ভব শীঘ্র স্তন্যদান বন্ধ করে শিশুকে বাইরের খাবার দিতে শুরু করলে। তবে একই সাথে স্তন্যদান ও বাইরের খাবার দেওয়া চলতে না।

মনে রাখতে হবে

* স্তনের দুধে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা (immune factors) তথা উচ্চ মাত্রায় পুষ্টি থাকে।
* এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের ক্ষেত্রে স্তন চেপে দুধ বের করে ফুটিয়ে শিশুকে পান করানো নিরাপদ।
* সঙ্গতি সম্পন্ন আক্রান্ত মায়েরা তাদের সন্তানকে স্তনের দুধের বদলে গুঁড়ো দুধ দিতে পারেন।
* অন্য উপায় না থাকায় স্তন্যদানে বাধ্য হলে তার স্থায়িত্ব যথাসম্ভব কম করতে হবে এবং সেসময়ে স্তনের দুধ ব্যতীত অন্য কিছু যথা পানি, পানীয় বা বাইরের খাবার দেওয়া চলবে না।

স্তনের দুধ সঞ্চিত রাখার নিয়ম

* চাপ প্রয়োগ করে বা পাম্প দিয়ে স্তনের দুধ বের করে শীতক বা রেফ্রিজারেটরে ৪৮ ঘন্টা মজুদ রাখা যায়।
* ডিপ ফ্রিজে O° ডিগ্রি তাপমাত্রায় স্তনের দুধ ৬ মাস পর্যন্ত সঞ্চিত রাখা যায় ।
* সঞ্চিত রাখার জন্য দুধের বোতল $\frac{৩}{৪}$ ভাগের বেশি পূর্ণ করা উচিত নয়।
* ঠাণ্ডায় জন্মে যাওয়া দুধ ডিপ ফ্রিজ থেকে বের করে রেফ্রিজারেটরের সাধারণ অংশে গলিয়ে (thawed) নিলে ৩ ঘন্টা পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।
* জমে যাওয়া দুধ গরম পানিতে রেখে গলিয়ে নিলে ৩০ মিনিটের মধ্যেই ব্যবহার করতে হবে।
* স্তনের দুধ কবে বের করা হয়েছে তা বোতলের গায়ে লিখে রাখতে হবে।
* সঞ্চিত দুধের মাঝে যেটি সবচেয়ে পুরানো সেটি সবার আগে ব্যবহার করতে হবে।
* ব্যবহারের পর দুধ থেকে গেলে তা ফেলে দিতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রোগ বিবরণ

প্রকাশকাল (Incubation Period)

এইচআইভি দিয়ে আক্রান্ত হবার পর কবে তা পূর্ণ মাত্রায় এইডসরূপে প্রকাশ পাবে তা বলা কঠিন। এ রোগের সুপ্তাবস্থা বা প্রকাশকালের মধ্যে প্রচুর তারতম্য ঘটে এবং তা কয়েক মাস থেকে ছয় বছর বা তারও বেশি হতে পারে।

এইচআইভি দেহে প্রবেশ করার পর বহু বছর নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থেকে যেতে পারে। ফলে এই নিষ্ক্রিয় ভাইরাস দিয়ে শেষ পর্যন্ত কতজন লোকের এইডস হবে বলা মুশকিল। তবে ধারণা করা হয়, এ থেকে ১০ - ৩০% লোকের এইডস হতে পারে এবং ২৫–৩০% লোকের এইডসসংশ্লিষ্ট জটিলতা বা এইডস রিলেটেড কমপ্লেক্স (AIDS Related Complex-ARC) হতে পারে। তবে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে দশ বছর পর ৭৫% লোকের দেহেই এইডস বিকাশ লাভ করে।

রোগ লক্ষণ

এইচআইভি সংক্রমণের লক্ষণকে চারটি স্তরে ভাগ করা যায় :

প্রথম স্তর : ভাইরাস দিয়ে প্রাথমিক সংক্রমণ এবং প্রতিরক্ষিকা বা অ্যান্টিবডি তৈরি।

দ্বিতীয় স্তর : রোগ লক্ষণবিহীন বাহক অবস্থা (Asymptomatic Carrier State)

তৃতীয় স্তর : এইডসসংশ্লিষ্ট জটিলতা (AIDS Related Complex)

চতুর্থ স্তর : এইডস (AIDS)

নিচে এসব স্তরের বিভিন্ন লক্ষণ উপস্থাপন করা হলো---

প্রাথমিক সংক্রমণ

এইডস–এর প্রাথমিক সংক্রমণের মধ্যে রয়েছে -

* গা ম্যাজ ম্যাজ করা,
* জ্বর,
* গলা ব্যথা,
* শরীরে ফুসকুঁড়ি বের হওয়া ইত্যাদি

এ ছাড়া ৭০% ভাগ লোকেরই প্রথম পাঁচ/ছয় বছরে আর তেমন কোনো রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় না। ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেকে সুস্থ মনে করে। সাধারণত ২ থেকে ১২ সপ্তাহ পর রক্তে প্রতিরক্ষিকা বা অ্যান্টিবডি দেখা যায়। আবার কখনও কখনও রক্তে অ্যান্টিবডির সন্ধান পেতে আরো বেশিদিন সময় লাগে। এ সময় রক্ত পরীক্ষা করলে এইচআইভি আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও রোগ ধরা পড়বে না।

Dhaka

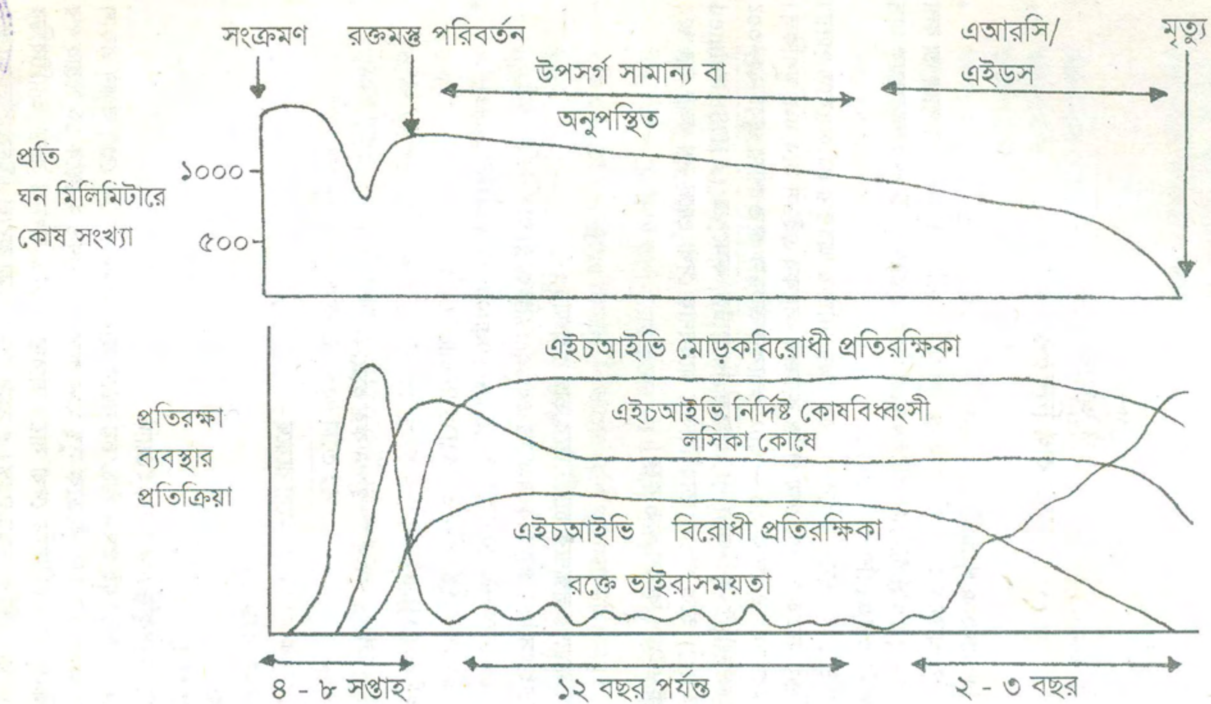

এইচআইভি সংক্রমণ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থায় প্রতিক্রিয়া

Dpsr ★ Bhaitkai ★ Chorlahar

এইডস–এর সাময়িক অসুস্থতাকে অনেকক্ষেত্রেই ইনফ্লুয়েঞ্জা বা গ্রন্থিজ্বর (Infections mononucleosis) বলে ভুল হতে পারে।

তীব্র এইচআইভি উপসর্গমালা

প্রাথমিক সংক্রমণের ৩ থেকে ৬ সপ্তাহ পরই ৫০ থেকে ৭০% লোকের তীব্র রোগ লক্ষণ দেখা দেয়। একে তীব্র এইচআইভি উপসর্গমালা বা Acute HIV Syndrome বলা যেতে পারে। তীব্র এইচআইভি উপসর্গমালায় যা ঘটে তা নিচে ছক আকারে দেয়া হলো :

সাধারণ	স্নায়বিক	ত্বকীয় রোগ
* জ্বর, * গলবিল প্রদাহ, * লসিকা গ্রন্থি স্ফীতি, * মাথা ব্যথা/চোখের পেছনে ব্যথা, সন্ধি ব্যথা/মাংসপেশীতে ব্যথা, * গা ম্যাজ ম্যাজ করা, * ক্ষুধামান্দ্য, * ওজন হ্রাস * বমিভাব/বমি * উদরাময়	* মস্তিষ্ক–আবরণী প্রদাহ (Meningitis), * মস্তিষ্ক প্রদাহ, * দেহের উপরিভাগের স্নায়ুপ্রদাহ (Peripheral neuropathy), * স্নায়ু প্রদাহ	* লাল ফুসকুড়ি (Erythenatous maculopapular rash), * চর্ম–শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিক্ষত (Mucocutaneous ulcer)

এক সপ্তাহ থেকে শুরু করে বেশ কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত এগুলো স্থায়ী থাকে। তারপর এইচআইভি–এর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সাড়া দেয়। এর ফলে ভাইরাসের সংখ্যা কিছু হ্রাস পায় এবং ধীরে ধীরে এ উপসর্গমালা হ্রাস পায়।

বাহক অবস্থা

এ অবস্থায় আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে অ্যান্টিবডি বা প্রতিরক্ষিকা থাকে কিন্তু রোগলক্ষণ প্রকাশ পায় না। তবে সার্বিক লসিকা গ্রন্থি স্ফীতি (Generalized lymphadenopathy) ঘটে। বাহক অবস্থা কতদিন থাকবে তা বলা মুশকিল। এই সুপ্তাবস্থায় ভাইরাস সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (Immune system) ক্রমেই ভেঙে পড়তে থাকে। বছরে গড়ে প্রতি মাইক্রোলিটারে ৫০টা CD4+টি কোষ কমে। CD4+ কোষ এর গণনা প্রতি মাইক্রোলিটারে ২০০–এর কম হলে রোগীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সাংঘাতিকভাবে হ্রাস পায় এবং সুযোগ–সন্ধানী সংক্রমণগুলো তাকে জেঁকে ধরে (Hanison's Principle of Internal Medicin, খণ্ড–২, সংস্করণ ১৪, ১৯৯৮)।

এইডস সংশ্লিষ্ট জটিলতা

একে সংক্ষেপে এ.আর.সি. বা এইডস সংশ্লিষ্ট জটিলতা (Aids Related Complex) বলে। রোগীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (Immune system) ধ্বংস হয়ে এইডস সংশ্লিষ্ট জটিলতা দেখা দেয়। অবশ্য সেই সাথে কর্কট রোগ বা ক্যান্সার রোগসহ সুযোগ–সন্ধানী সংক্রমণগুলো

BANBEIS Library * Dhaka *

অনুপস্থিত থাকে। তবে নিচের যে-কোনো এক বা একাধিক লক্ষণ ও উপসর্গ বা সবগুলোই দেখা দিতে পারে, যথা —

১। অকারণ উদরাময় (একমাসের বেশি স্থায়ী);
২। ক্লান্তি;
৩। লসিকা গ্রন্থির স্থায়ী বৃদ্ধি;
৪। গা ম্যাজ ম্যাজ করা;
৫। দেহের ওজন ১০%-এর বেশি ভাগ হারানো;
৬। জ্বর;
৭। নৈশ ঘর্ম;
৮। মুখে সাদা পর্দা পড়া (ছত্রাক অধ্যুষণ);
৯। চর্মরোগ;
১০। সার্বিক লসিকা গ্রন্থি স্ফীতি;
১১। নাক-কান-গলার সমস্যা;
১২। প্লীহা বৃদ্ধি;
১৩। শ্বেত রক্ত কণিকা ও সাহায্যকারী টি-কোষের পরিমাণ হ্রাস;

উপসর্গযুক্ত এইচআইভিজনিত রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ

সাধারণ উপসর্গ	সাধারণ লক্ষণ
* ক্লান্তি (Fatigue)	* গ্রন্থি স্ফীতি
* জ্বর	* দেহক্ষয় (wasting)
* আস্বাচ্ছন্দ্য বা গা ম্যাজ ম্যাজ করা (Malaise)	* মুখে ক্যান্ডিডাময়তা (oral candida)
* ওজন হ্রাস	* মুখগহ্বরে রোমশ শ্বেত এলাকা (Oral Hairy leucoplakia)
* উদারাময়	* পায়ূবৃত্তিক হার্পিস (Perianal herpes)
	* প্লীহাবৃদ্ধি (Splenomegaly)

অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ (High risk group) যেসব রোগীর এসব উপসর্গের দুই বা ততধিক লক্ষণ এবং সেই সাথে সার্বিক লসিকা গ্রন্থি বৃদ্ধি তথা সাহায্যকারী টি-কোষের সংখ্যাল্পতা থাকে তাদের এইডস সংশ্লিষ্ট জটিলতা রয়েছে। এদের অনেকের মধ্যেই পরে পরিপূর্ণভাবে এইডস বিকাশ লাভ করে।

সপ্তম অধ্যায়

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও সুযোগ-সন্ধানী সংক্রমণ

এইডস ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অস্বাভাবিকতা

এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে সুযোগ-সন্ধানী সংক্রমণ যারা ঘটায়, তাদের অন্যতম হলো কোষভ্যন্তরস্থ পরজীবী যথা *Mycobacterium tuberculosis* অর্থাৎ যক্ষ্মারোগের জীবাণু (Davidson's Principles and Practice of Medicine, 18th edition, 1999 দ্রষ্টব্য)। এইচআইভি অন্য যেসব কোষের ক্ষতি করে সেগুলো হলো মনোসাইটস (Monocytes), ম্যাক্রোফেজ (Macrophages), কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মাইক্রোগ্লিয়াল কোষ (Microglial cells of Central Nervous System) এবং ডেনড্রাইটিক কোষ (Dendritic cells) ইত্যাদি। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় যেসব অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করা যায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

টি-সহায়ক বা টি-সাহায্যকারী (সিডি-৪) লসিকা কোষ

* সংখ্যা হ্রাস

দেহের বহির্ভাগের রক্তে (Perepheral blood) CD4 কোষ এর সংখ্যা কমে যায়। CD4 কোষ এর সংখ্যা এই হ্রাস প্রাপ্তি দেহে নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে।

* অস্বাভাবিক কার্যকলাপ :
    ১. অ্যান্টিজেন/মাইটোজেন–এর প্রতি প্রতিক্রিয়া হ্রাস
    ২. ইন্টারলিউকেন ২–এর প্রতি প্রতিক্রিয়া হ্রাস
    ৩. ইন্টারলিউকেন ২ এবং ইন্টারফেরন
    ৪. গামা–এর উৎপাদন হ্রাস

বি-লসিকা কোষ

* অস্বাভাবিক কার্যক্রম : সুনির্দিষ্ট অ্যান্টিজেন বা মাইটোজেন এর প্রতি প্রতিক্রিয়া হ্রাস পেতে পারে।
* বিভিন্ন কোষ উদ্দীপ্তকরণ (Polyclonal activation) এবং ফলে ইমিউনোগ্লোবিউলিন বৃদ্ধি পায়।

মনোসাইটস/ম্যাক্রোফেজ ও ডেনড্রাইটিক কোষ

* ক্রটিযুক্ত অ্যান্টিজেন উপস্থাপনা
* ক্রটিযুক্ত সাইটোকাইন নিঃসরণ (cytokine secration)
* ক্রটিযুক্ত ফ্যাগোসাইটোসিস বা মৃত্যু প্রক্রিয়া

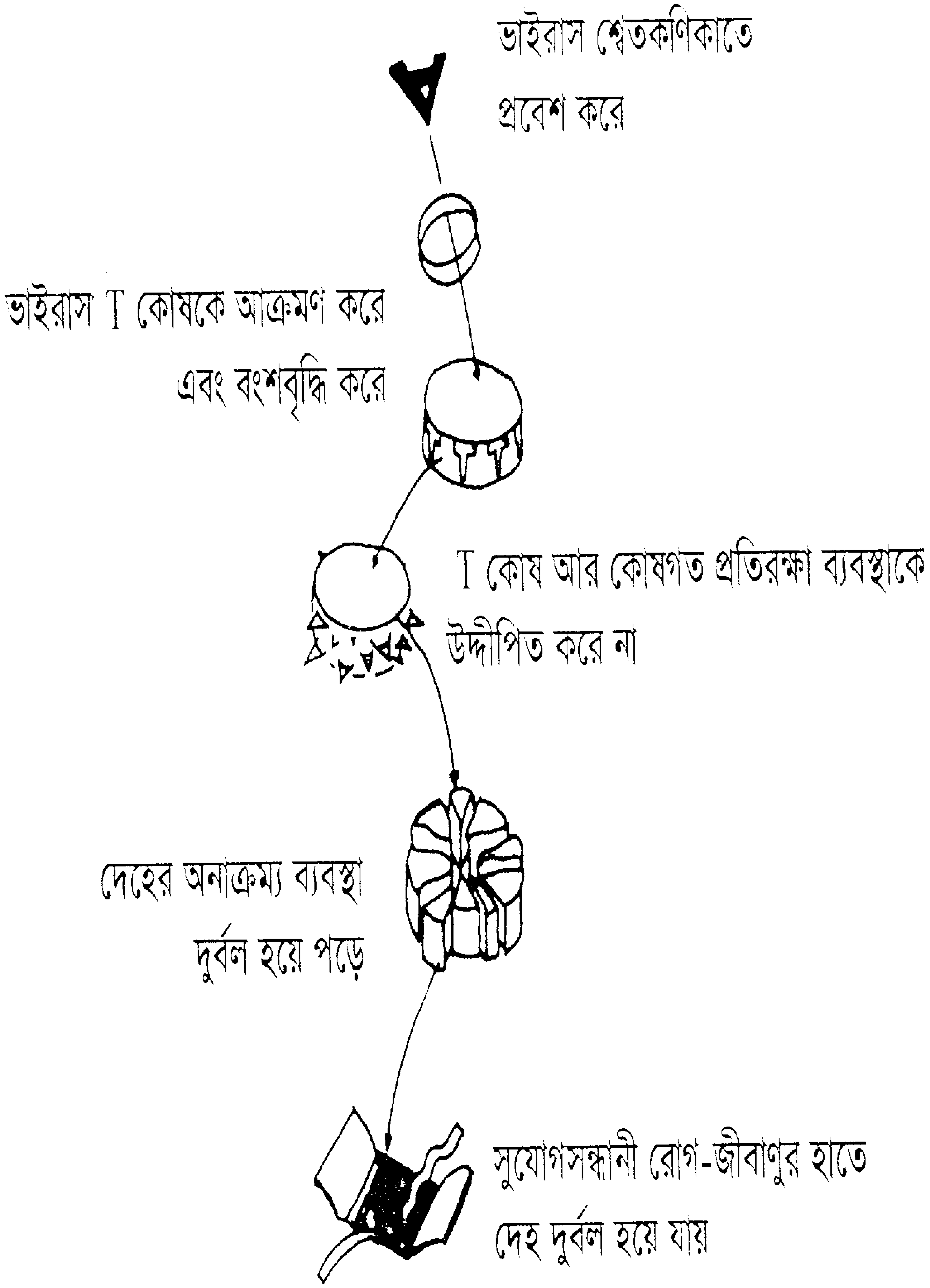
ভাইরাস শ্বেতকণিকাতে প্রবেশ করে
ভাইরাস T কোষকে আক্রমণ করে এবং বংশবৃদ্ধি করে
T কোষ আর কোষগত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে উদ্দীপিত করে না
দেহের অনাক্রম্য ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে
সুযোগসন্ধানী রোগ-জীবাণুর হাতে দেহ দুর্বল হয়ে যায়

এইডস এবং সুযোগ-সন্ধানী সংক্রমণ

এইডস হলো এইচআইভি সংক্রমণের সর্বশেষ স্তর। এ অবস্থায় বেশ কিছু সুযোগ-সন্ধানী সংক্রমণ (opportunistic infection) বা কর্কট রোগ আক্রমণের সুযোগ পায়। মৃত্যু সাধারণত অপ্রতিরোধ্য বা চিকিৎসা অযোগ্য সংক্রমণের জন্য ঘটে। যক্ষ্মা এবং কেপোসিস সার্কোমা তুলনামূলকভাবে বেশ আগেই বিস্তার লাভ করে। দেহে টি-সাহায্যকারী কোষের সংখ্যা তখনও ১০০-এর উপরে থাকে।

টি-সাহায্যকারী কোষের সংখ্যা ১০০-এর কাছাকাছি নেমে এলে নিম্নলিখিত ভয়ঙ্কর ঘটতে পারে। যথা—

(অ) ছত্রাক সংক্রমণ (Fungal infection)

ক্যান্ডিডাঘটিত খাদ্যনল প্রদাহ (Candida oesophagitis),

ক্রিপ্টোকক্কাসঘটিত মস্তিষ্কাবরণ প্রদাহ (*Cryptococcus* meningitis),

পেনিসিলোসিস (Penicillosis)

(আ) পরজীবীঘটিত রোগ যথা—

নিউমোসিস্টিসঘটিত *(Pneumocystis carinnii)* ফুসফুস প্রদাহ (Pneumonia);

টক্সোপ্লাজমাঘটিত *(Toxoplasma gondii)* মস্তিষ্ক প্রদাহ (encephalitis)

যেসব রোগীর ক্ষেত্রে গণনা ৫০-এর নিচে নেমে আসে তাদের ঘটে শেষ পর্যায়ের সংক্রমণ : সাইটোমেগালো ভাইরাসঘটিত রেটিনা প্রদাহ (cytomegloviral retinitis)।

আমাদের চারপাশে ঘিরে আছে অসংখ্য জীবাণু, ভাইরাস ও পরজীবী ইত্যাদি। দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়লে এসব সহজেই দেহের মধ্যে ঢুকে পড়ে তাকে কাবু করে ফেলে স্বাভাবিক দেহে তারা যা ক্ষতি করতে পারে।

এইচআইভি আক্রান্ত দেহে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি ধ্বংস করতে সক্ষম, কেননা তাদের বাধা দেবার মতো কোনো শক্তি দেহে থাকে না। সুযোগ-সন্ধানী সংক্রমণ মুখ্য যেসব অঙ্গে প্রভাব বিস্তার করে সেসব হলো ফুসফুস, পরিপাকতন্ত্র, মস্তিষ্ক এবং চর্ম। নিচে সুযোগ-সন্ধানী সংক্রমণ যারা ঘটায় এবং বিভিন্ন অঙ্গে যেসব লক্ষণ প্রকাশ পায়, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছক আকারে নিচে দেয়া হলো —

লক্ষণ/উপসর্গ	যারা ঘটায়
ফুসফুস কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা	*Pneunocystis carinii* (নিউমোসিস্টিমস ক্যারিনি) *Mycobacterium tuberculosis* (মাইকোব্যাক্টোরিয়াম টিউবারকুলোসিস)
পরিপাকতন্ত্র গিলতে কষ্ট, বমি ভাব, পেটে ব্যথা, অস্বাভাবিক ওজন হ্রাস (অন্ত্রের	ক্যান্ডিডা, সালমোনেলা গোষ্ঠী (টাইফি নয়) *Crypfosporidium,* *Isospora,* *Mycobacterium tubercculosis,* ব্যতিক্রমী (atypical) মাইক্রোব্যাক্টেরিয়া,

লক্ষণ/উপসর্গ	যারা ঘটায়
শোষণ ক্ষমতা হ্রাস বা Malabsorption), পুরাতন তীব্র উদরাময়	সাইটোমেগালো ভাইরাস, *Strogyloides*
মস্তিস্ক মাথা ব্যথা, ত্রুটিপূর্ণ মানসিক কর্ম, গভীর চেতনা হ্রাস, সংজ্ঞা হারানো, কেন্দ্রীয় ও কেন্দ্রাতিগ পক্ষাঘাত; অসঙ্গতি (incoordination); দৃষ্টিভ্রান্তি	*Toxoplasma gondii* ক্রিপ্টোকক্কাস এইচআইভি (মস্তিষ্ক বিকার ঘটে) সাইটোমেগালো ভাইরাস
চর্ম/চর্ম-শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীগত (Mucocutaneous) মুখ ও মুখগহ্বর পার্শ্ববর্তী ক্ষত, যৌনাঙ্গ ও পায়ুবৃত্তিক এলাকায় ক্ষত	হার্পিস সিমপ্লেক্স

এইডস হলে বেশ কিছু লোক ক্রমাগত উদারময়ে ভোগে, ওজন হারায় এবং শুকিয়ে যায়। এজন্য আফ্রিকাতে এটি Slim disease নামে পরিচিত। এই রোগে রোগী কৃশ হতে হবে এক পর্যায়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এই রোগ আফ্রিকাতে মারাত্মক রূপ ধারণ করে।

এইডস চিত্তভ্রংশ বা এইডস ডিমেনশিয়া

কিছু কিছু লোকের (৫০% ব্যক্তির) মস্তিষ্ক প্রদাহ হয় কেননা এইচআইভি রক্ত মস্তিষ্ক প্রতিবন্ধকতা (Blood Brain Barrier) অতিক্রম করে মস্তিষ্কে অনুপ্রবেশ করে। কিছু মস্তিষ্ক কোষের ক্ষতিসাধন করতে পারে ফলে নিম্নলিখিত সমস্যা দেখা দেয়—

* মানসিক বিভ্রান্তি (confusion),
* স্মৃতিভ্রংশ,
* আচার–ব্যবহার তথা ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন,
* অকাল বার্ধক্য,
* মল–মূত্র ধারণে অক্ষমতা (incotinence) ইত্যাদি

উপরোক্ত কারণে অনেকেই এইডস চিত্তভ্রংশ বা এইডস ডিমেনশিয়া বৃদ্ধদের চিত্তভ্রংশ বা আলঝেইমার রোগ বলে ভুল করেন। প্রকৃতপক্ষে এই দুই রোগের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কেবল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পক্ষেই এই দুই রোগের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা সম্ভব।

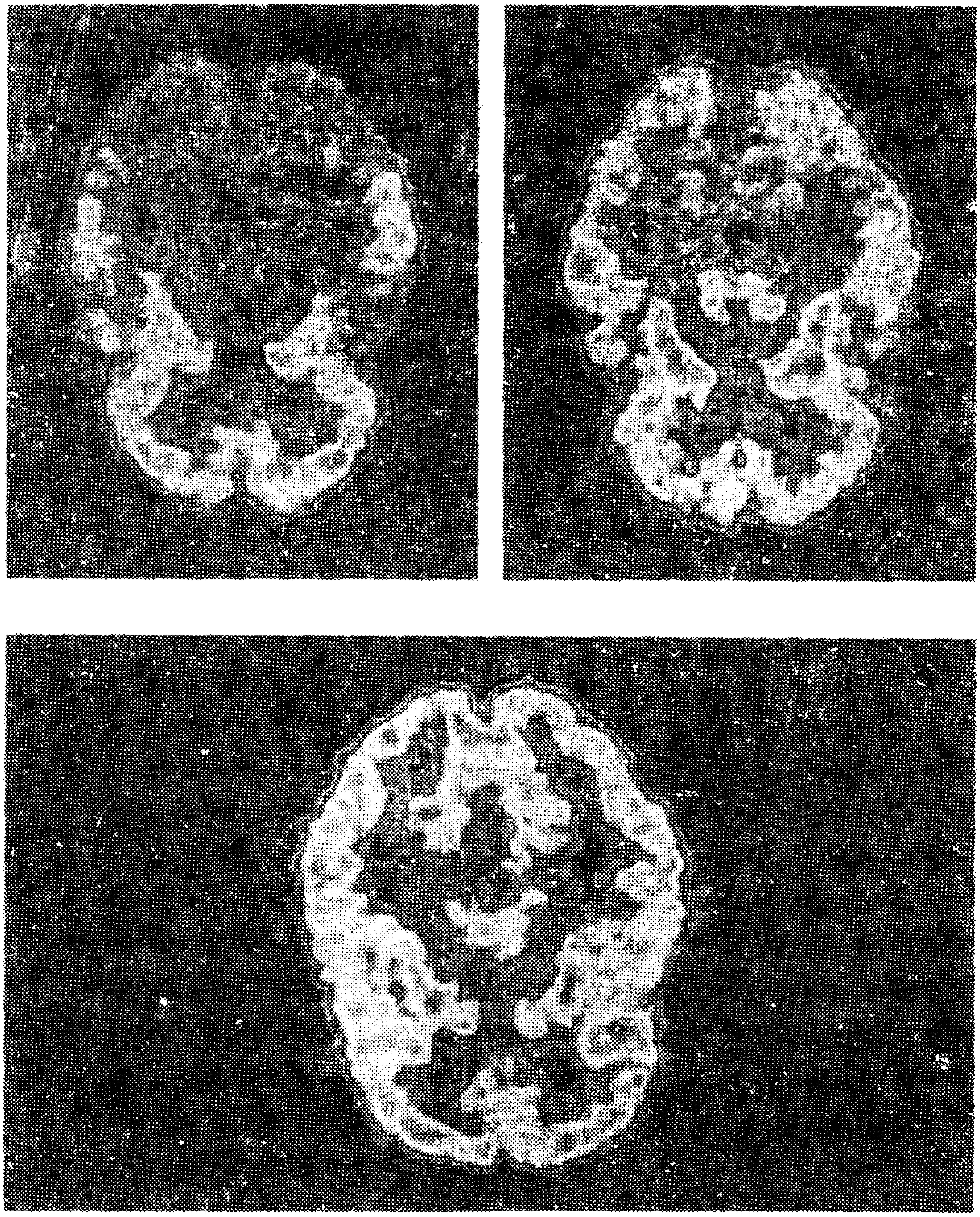

এইচআইভি সৃষ্ট চিত্তভ্রংশ (Dementia) তথা মস্তিষ্ক কোষের ক্ষয় (পজিট্রন ইমিশন টমোগ্রাফি দিয়ে প্রাপ্ত স্ক্যান)

এইডস ও সুযোগ-সন্ধানী সংক্রমণ যারা ঘটায়

প্রোটোজোয়া	ভাইরাস
Pneumocystis carini *Toxoplasma gondii* *Cryptosporidium*	সাইটোমেগালো ভাইরাস হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস ইস্পটেইনবার ভাইরাস

ছত্রাক	ব্যাক্টেরিয়া
Candida *Cryptococcus* (ক্রিপ্টোকক্কাস) *Coccidiodes* (কক্সিডিওডেস) *Histoplasma* (হিস্টোপ্লাজমা)	*Mycobacterium* *Tuberculosis* ব্যতিক্রমী (Atypical) *Mycobacteria* *Legionella*
অপ্রাথমিক কর্কট (Secondary neoplasma)	
* কেপোসিস সার্কোমা * নন-হজকিন লসিকা আব (Non hodgkin lymphoma)	

যক্ষ্মা

এইচআইভি সংক্রমণ ও যক্ষ্মা রোগের সম্পর্ক ভয়ঙ্কর। যেসব এলাকায় যক্ষ্মা সর্বদাই বিরাজ করে (endemic); সেখানে বহুলোক শিশু অবস্থাতেই যক্ষা জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত থাকে। পরবর্তীকালে কখনও যদি এইচআইভি সংক্রমণ দিয়ে তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে তখন তার যক্ষ্মা আত্মপ্রকাশ করে। রুয়ান্ডা, যুক্তরাষ্ট্র, জায়ারে ও জাম্বিয়াতে এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, যারা এইচআইভি আক্রান্ত নয় তাদের চেয়ে এইচআইভি আক্রান্ত লোকদের যক্ষ্মা হবার আশঙ্কা শতকরা ৩০ – ৫০ ভাগ বেশি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এইডস এবং যক্ষ্মা অধ্যায়ে করা হয়েছে।

স্থায়ী সার্বিক লসিকা গ্রন্থি স্ফীতি (Persistent Generalised lymphoadenopathy) :

স্থায়ী সার্বিক লসিকা গ্রন্থি স্ফীতিতে লসিকা গ্রন্থিগুলো ১ সেমি.-র চেয়ে বড় থাকে। কুঁচকি এলাকা (groin) ছাড়াও দেহে কমপক্ষে দুটো তার বেশি (গলা, বগল) এলাকায় এ অবস্থা দেখা যায় এবং কমপক্ষে তা তিন মাস স্থায়ী থাকে। এছাড়া জ্বর, নৈশ-ঘর্ম, ওজন হ্রাস, মুখে ছত্রাক অধ্যুষণ (Thrush) থাকে।

কেপোসিস সার্কোমা

কেপেসিস সার্কোমা হলো রক্তনলের অর্বুদ (Vascular tumour)। চর্ম বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে (mucous membrane) লালচে বাদামি বা বেগুনি রঙের জ্যাবড়া দাগ (Plaques) বা ক্ষুদ্র পিণ্ড (nodules) বা অর্বুদ থাকে এ রোগে।

অর্বুদ সাধারণত পায়ে হয় এবং খুব ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে। সমকামী এইডস রোগীদের মাঝে সাধারণত এ রোগ হয়। যারা সমকামী নয়, সেসব এইডস রোগীর ক্ষেত্রে এ রোগ বিরল। রোগটি সুযোগ-সন্ধানী ভাইরাসঘটিত। প্রাক-এইচআইভি যুগে আফ্রিকাতে প্রায়ই এটি দেখা যেত বয়স্ক লোকে ক্ষেত্রে এবং বর্তমান গ্রন্থকারের সে অভিজ্ঞতা হয়েছিলো এইডস-এর রাজ্য পূর্ব আফ্রিকার উগান্ডাতে (লেখক তখন মাসাকা প্রাদেশিক হাসপাতালে মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন, ১৯৭৬-৭৭। এইচআইভি সংক্রমণের সাথে সাথে

মুখে এবং এমনকি অন্ত্রেও ঘা হয় কেপোসিস সার্কোমাতে (Kaposis Sarcoma of the gut) এবং পরে তা উদরাময়রূপে প্রকাশ পেতে পারে।

চিকিৎসা

চিকিৎসার জন্য তেজস্ক্রিয় চিকিৎসা পদ্ধতি (রেডিওথেরাপি) এবং কোষবিধ্বংসী ওষুধ (cytotoxic drug) যথা ভিনক্রিস্টিন বা ইন্টারফেরন ইনজেকশন ব্যবহার করা হয়।

মুখ ও গলবিলে ক্যান্ডিডাময়তা (Oropharyngeal candidiasis)

সাধারণত ঈস্ট (Yeast) ছত্রাক দিয়ে এ রোগ ঘটে। মুখগহ্বরে, জিহ্বার উপরে, গলার বীচিতে (টনসিল) সাদা পর্দা পড়ে। খাদ্যনলে সংক্রমণ হলে উরঃফলকের পিছনে ব্যথা হয়।

সাইটোমেগালো ভাইরাসজনিত রেটিনা প্রদাহ

সাইটোমেগালো ভাইরাস দিয়ে অক্ষিপটে প্রদাহ ঘটলে রোগী দৃষ্টিশক্তি হারাতে পারে।

নিউমোসিস্টিস ক্যারিনিঘটিত ফুসফুস প্রদাহ (*Pneumocystis carini i* pneumonia)

এ ধরনের ফুসফুস প্রদাহে শুষ্ক কাশি, শ্বাস নিতে অসুবিধা ও ব্যথা হয়। সেই সাথে থাকে জ্বর। এছাড়া রোগীর দৈহিক ওজনও হ্রাস পায় (বিস্তারিত *Pneumocystis carinii* ফুসফুস প্রদাহ অধ্যায়ে)।

টক্সোপ্লাজমা মস্তিষ্ক প্রদাহ

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রোটোজোয়া অধ্যুষণ ঘটে। ফলে মস্তিষ্ক আংশিকভাবে বিনষ্ট হয় এবং স্নায়বিক বিকার ঘটে। রোগীর অর্ধাংশ অবশ (hemiplegia) বা স্ট্রোক হতে পারে।

রোমশ বা চুলময় শ্বেত এলাকা বা শ্বেতী (Hairy Leukoplakia)

এ রোগে জিহ্বার দুপাশে খাড়াভাবে সাদা জ্যাবড়া দাগ থাকে। দাগগুলোকে ঢেউ তোলা চুলের মতো মনে হয়। উন্নয়নশীল দেশের চেয়ে ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকাতে এ রোগ বেশি। অন্যান্য সাদা দাগযুক্ত রোগ থেকে পৃথক করার জন্য জীবিত কোষ পরীক্ষা (biopsy) করা উচিত। এ রোগের কোনো কার্যকর চিকিৎসা নেই।

ক্রিপ্টোকক্কাসঘটিত মস্তিষ্কাবরণী প্রদাহ (cryptococcal meningitis)

এ রোগে স্নায়ুতন্ত্রের ছত্রাক সংক্রমণ ঘটে। রোগীর সাধারণ জ্বর, মাথাব্যথা ও বমি হয়। ঘাড় শক্ত থাকে।

হার্পিস জোস্টার বা শিংগেলস (shingles)

এ রোগে ভেরিসেলা জোস্টার ভাইরাস দিয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র তথা পশ্চাত স্নায়ু মূল (Dorsal nerve roots) আক্রান্ত হয়, ফলে রোগীর স্থানবিশেষে তীব্র ব্যথা ও জ্বলুনি হয় এবং অতঃপর তাতে ফোস্কা পড়ে ও ক্ষত সৃষ্টি হয়। ৬ থেকে ২৩% এইডস রোগী এর শিকার হয়।

চিকিৎসা

চিকিৎসার জন্য অ্যাসপিরিন, প্যারাসিটামল, জেনশন ভায়োলেট পেইন্ট এবং চোখের ক্ষেত্রে ৮০০ মিলিগ্রাম অ্যাসাইক্লোভির দিনে পাঁচবার দেয়া হয়। এছাড়া অ্যাসাইক্লোভির চোখের ফোঁটা বা চোখের মলম দেয়া চলে।

তীব্র চুলকানি (Severe prurigo or pruritic Dermatitis) :

এতে দীর্ঘদিনের চর্মপ্রদাহ থাকে। দেহে চুলকানিযুক্ত ফুসকুঁড়ি দেখা দেয় এবং ধীরে ধীরে তা ফোস্কায় পরিণত হয়।

চিকিৎসা

চুলকানি থামার জন্য ক্যালামিন লোশন বা ই-৪৫ ক্রিম (E45 emollient cream) লাগানো যেতে পারে। এছাড়া হিস্টাসিনবিরোধী ওষুধ যথা ক্লোরোফেনিরেমাইন ১০ মিলিগ্রাম প্রতি আট ঘন্টা অন্তর দেয়া হয়।

তীব্র বা বারংবার চর্ম প্রদাহ (Severe or Recurrout skin infections)

এক্ষেত্রে ডার্মাটোফাইটস বা দাদ (Ringworm) নামক রোগের সৃষ্টি হয় এবং চুলের গোড়ায় প্রদাহ (foiliculitis) ঘটে।

লসিকা অর্বুদ বা লিম্ফোমা

এইডসজাত লসিকা অর্বুদ হজকিন রোগের মতো নয় (Non-hodgkin type lymphoma)। অজ্ঞাত জ্বর ক্রমাগত তিন মাসের বেশি জ্বর হতে পারে যার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না (Pyrexia of unknown origin)।

উপরে বর্ণিত যে-কোনোভাবে পূর্ণবিকাশপ্রাপ্ত এইডস প্রকাশ পেতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়

এইডস এবং যক্ষ্মা

যুগপৎ একই সাথে এইচআইভি ও যক্ষ্মা জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত লোকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। যক্ষ্মা নতুন কোনো রোগ নয়। প্রাচীন গ্রীকরা এর অস্তিত্ব জানতেন। এ রোগকে সাধারণভাবে টিবি (TB) নামে অভিহিত করা হয়, যার পুরো নাম টিউবারকুলোসিস (Tuberculosis)। উনিশ শতকে এ রোগ ছিলো সবচেয়ে আতঙ্কের। মৃত্যু পরোয়ানা নিয়ে আসতো সে। ১৮৮২ সালে রবার্ট কক (Robert Koch) এ রোগের জীবাণু *Mycobacterium tuberculosis* (মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবাসকুলোসিস) শনাক্ত করে কিভাবে তা ছড়ায় আবিষ্কার করার পর ধীরে ধীরে সমস্যার উন্নতি হয়েছে। মানুষের জীবনের মান তথা বাসস্থান, পুষ্টি, পয়ঃনিষ্কাশনের উন্নতিও এ ব্যাপারে ভূমিকা রাখছে।

পরিসংখ্যান

বর্তমান বিশ্বে ১.৭ বিলিয়ন লোক যক্ষ্মায় আক্রান্ত অর্থাৎ পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ লোক এ রোগে ভুগছে। প্রতি বছর প্রায় ৩০ লক্ষ লোক এ রোগে মারা যায়।

এইচআইভি দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অর্থাৎ অনাক্রম্যতা দুর্বল করে ফেলে। ফলে টিবির জীবাণু সহজেই দেহে প্রবেশ করে এবং যে ধরনের যক্ষ্মা স্বাভাবিক দেহে আদৌ তেমন ক্ষতি করতে পারতো না তা সুযোগ পেয়ে ভয়ানক প্রাণঘাতী রূপ নেয়। অন্যদিকে যারা আগে থেকেই যক্ষ্মা জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত তারা যদি এইচআইভি দিয়েও পরবর্তীতে আক্রান্ত হয় তাহলে অর্ধেকের বেশি লোকের কার্যকর যক্ষ্মা (Active TB) দেখা দিবে। সাধারণত যক্ষ্মা জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত মাত্র ১০% লোকের শেষ পর্যন্ত যক্ষ্মা হয়। ১৯৯৫ সালে এইডসঘটিত যে দশ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছে তার এক তৃতীয়াংশ ক্ষেত্রে যক্ষ্মা দায়ী। আবার একই সনে যে ত্রিশ লক্ষ লোকের যক্ষ্মা রোগের মৃত্যু ঘটেছে তার ৯% ক্ষেত্রে এইডস দায়ী। দিন দিন এই দ্বৈত সংক্রমণ আশঙ্কাজনক পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। আফ্রিকার সাহারা নিম্নবর্তী অঞ্চলে যক্ষ্মায় আক্রান্ত অর্ধেক জনসংখ্যাই যুগপৎ এইচআইভি দিয়ে সংক্রমিত।

এইচআইভি এবং যক্ষ্মার পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া

নিষ্ক্রিয় সংক্রমণ সক্রিয়করণ

শুধু যক্ষ্মা জীবাণু দিয়ে সংক্রমিত লোকের যক্ষ্মা হবার যতটা সম্ভাবনা তার চেয়ে যার যক্ষ্মার সাথে এইচআইভি সংক্রমণ রয়েছে তার যক্ষ্মা হবার সম্ভাবনা ২৫ থেকে ৩০ গুণ বেশি হয়।

প্রাথমিক সংক্রমণ

এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তি যদি যক্ষ্মা জীবাণু দিয়ে নতুনভাবে আক্রান্ত হয়, তবে জীবাণু দ্রুত সক্রিয় হয়ে উঠে। এইচআইভি নিষ্ক্রিয় যক্ষ্মা সংক্রমণকে সক্রিয় করে তোলে।

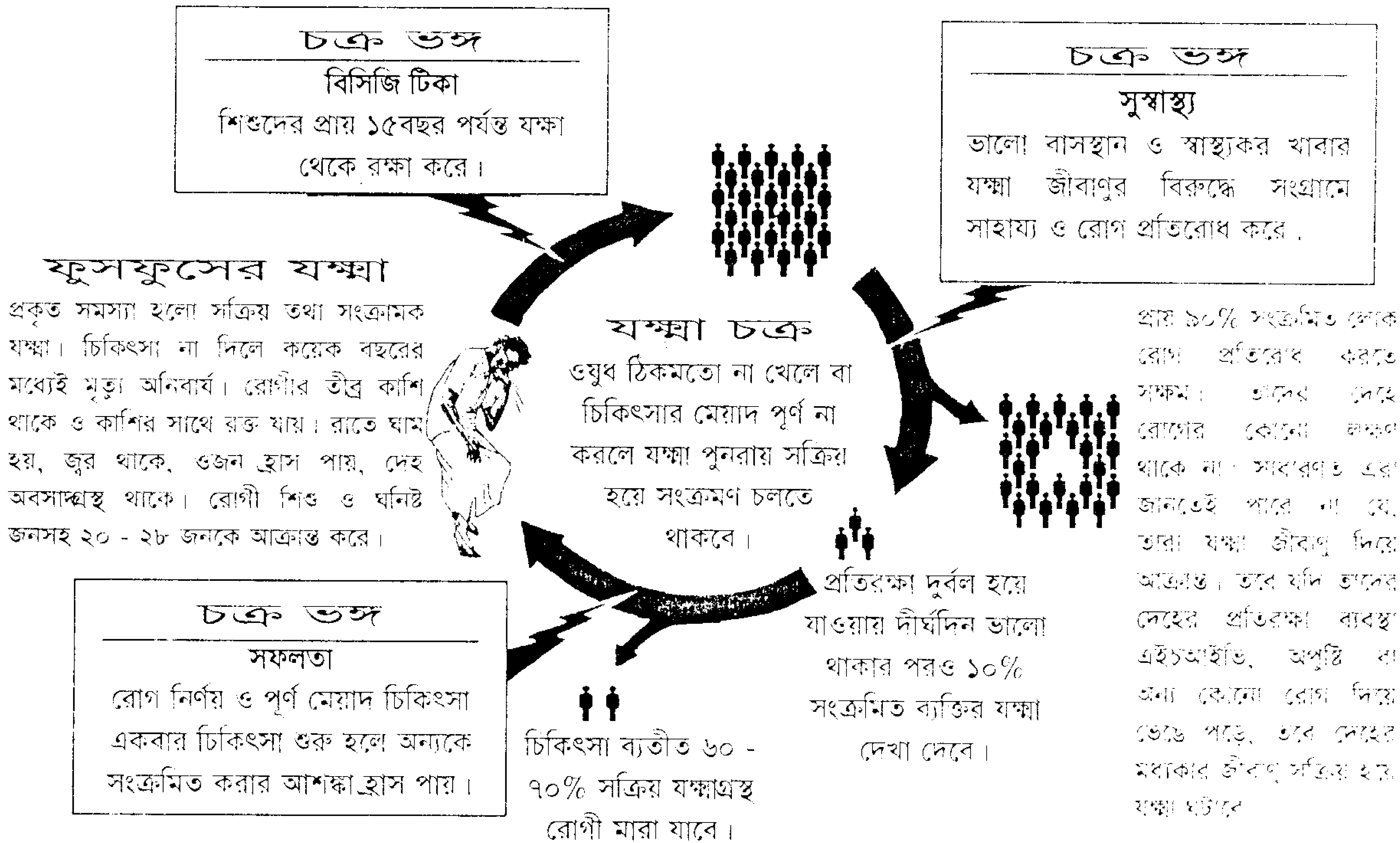
চক্র ভঙ্গ
বিসিজি টিকা
শিশুদের প্রায় ১৫বছর পর্যন্ত যক্ষা থেকে রক্ষা করে।
চক্র ভঙ্গ
সুস্বাস্থ্য
ভালো বাসস্থান ও স্বাস্থ্যকর খাবার যক্ষ্মা জীবাণুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাহায্য ও রোগ প্রতিরোধ করে.
ফুসফুসের যক্ষ্মা
প্রকৃত সমস্যা হলো সক্রিয় তথা সংক্রামক যক্ষ্মা। চিকিৎসা না দিলে কয়েক বছরের মধ্যেই মৃত্যু অনিবার্য। রোগীর তীব্র কাশি থাকে ও কাশির সাথে রক্ত যায়। রাতে ঘাম হয়, জ্বর থাকে, ওজন হ্রাস পায়, দেহ অবসাদগ্রস্থ থাকে। রোগী শিশু ও ঘনিষ্ট জনসহ ২০ - ২৮ জনকে আক্রান্ত করে।
যক্ষ্মা চক্র
ওষুধ ঠিকমতো না খেলে বা চিকিৎসার মেয়াদ পূর্ণ না করলে যক্ষ্মা পুনরায় সক্রিয় হয়ে সংক্রমণ চলতে থাকবে।
প্রায় ৯০% সংক্রমিত লোক রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম। তাদের দেহে রোগের কোনো লক্ষণ থাকে না। সাধারণত এরা জানতেই পারে না যে, তারা যক্ষ্মা জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত। তবে যদি তাদের দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এইচআইভি, অপুষ্টি বা অন্য কোনো রোগ দিয়ে ভেঙে পড়ে, তবে দেহের মধ্যকার জীবাণু সক্রিয় হয়ে যক্ষ্মা ঘটাবে
প্রতিরক্ষা দুর্বল হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘদিন ভালো থাকার পরও ১০% সংক্রমিত ব্যক্তির যক্ষ্মা দেখা দেবে।
চক্র ভঙ্গ
সফলতা
রোগ নির্ণয় ও পূর্ণ মেয়াদ চিকিৎসা একবার চিকিৎসা শুরু হলে অন্যকে সংক্রমিত করার আশঙ্কা হ্রাস পায়।
চিকিৎসা ব্যতীত ৬০ - ৭০% সক্রিয় যক্ষ্মাগ্রস্থ রোগী মারা যাবে।

যক্ষ্মা চক্র

বারংবার সংক্রমণ

এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তি যক্ষ্মাক্রান্ত হলে তা চিকিৎসা দিয়ে নির্মূল করার পরও আবার এসে এ রোগ দিয়ে আক্রান্ত হতে পারে।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি

আমাদের সমাজে এইচআইভি ও যক্ষ্মা (কুষ্ঠ রোগও বটে) আক্রান্ত ব্যক্তিরা সমভাবে নিগৃহীত হয়। লোকজন তাদের সভয়ে এড়িয়ে চলে।

যক্ষ্মা জীবাণু

এক ধরনের ক্ষুদ্র জীবাণু, যা রঞ্জিত করার পর খনিজ অম্ল (Mineral Acid) দিয়ে ধৌত করা যায় না অর্থাৎ Acidfast bacillus দিয়ে যক্ষ্মা ঘটে। যথা—

১। *Mycobacterium tuberculosis*—মানুষের যক্ষ্মার জন্য মুখ্যত দায়ী।

২। *Mycobacterium bovis*— গরু ছাগলের যক্ষ্মা ঘটায়। যক্ষ্মা আক্রান্ত গরুর দুধ (পাস্তুরিত না করে) খেলে মানুষের যক্ষ্মা হতে পারে।

এই উভয় প্রকার জীবাণুকে কক'স ব্যসিলাই (Koch's Bacilli) বলে। তবে সাধারণ লোকের শরীরে যক্ষ্মা ঘটায় না এমন একটি দুর্বল জীবাণু (Atypical mycobacteria) এইডস রোগীদের যক্ষ্মাক্রান্ত করে থাকে যথা : *Mycobatoricous avilum intracellulare*-MAI।

জীবাণু দর্শন (কফ পরীক্ষা)

সাধারণত সকালের কাশি সংগ্রহ করে জিল–নিলসেন (Zeihl-Neelsen) পদ্ধতিতে রঞ্জিত করে প্রথমে ৪০× এবং পরে তেল নিমজ্জিত লেন্স (oil immersion lens) দিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে জীবাণু দেখতে হয়। দর্শন শেষে বিবরণ দেয়ার সময় জীবাণুগুলো নিম্নোক্তভাবে লিপিবদ্ধ করতে হয় :

দর্শন	লিপিবদ্ধকরণ
> ১০ ব্যসিলাই/এলাকা	+++
১–১০ ব্যসিলাই/ এলাকা	++
১০–১০০ ব্যসিলাই/ ১০০ এলাকা	+
১—৯ ব্যসিলাই /এলাকা	১০০ সঠিক সংখ্যা

জীবাণু চাষ (culture)

গবেষণাগারে লয়েনস্টেইন–জেনসেন মাধ্যমে (Lowenstein-Jensen Medium) ৪ থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে যক্ষ্মার জীবাণু চাষ করে উৎপাদন করা যায়।

যক্ষ্মার প্রকারভেদ

যক্ষ্মা দু ধরনের হতে পারে। যথা–

১। **ফুসফুসের যক্ষ্মা :** হাঁচি–কাশির সময় রোগীর দেহ থেকে যক্ষ্মা জীবাণু ছড়িয়ে মুখ্যত সুস্থ লোকের ফুসফুসে নিঃশ্বাসের সাথে ঢুকে বাসা বাধে এবং লসিকা ও রক্ত দিয়ে

দেহভ্যন্তরে ছড়ায়। এ বাসা থাকে সাধারণত ফুসফুসের চূড়ায়। সেখানে তা দানাদার ক্ষুদ্র আব (Granulomatous Tubercle) সৃষ্টি করে যার মধ্যভাগ ধ্বংস (caseation necrosis) হয়ে যায়। একে প্রাথমিক জটিলতা বা প্রাইমারি কমপ্লেক্স (Primary complex) বা গন কমপ্লেক্স (Gohn complex) বলে। ফুসফুস ছাড়া টনসিল, অন্ত্রে, ক্ষুদ্রান্ত্রের ঝালরের (Mesenteric) লসিকা গ্রন্থিতেও তা হতে পারে।

২। ফুসফুস বহির্ভূত যক্ষ্মা : ফুসফুস ছাড়া শরীরের অন্য যে-কোনো স্থানে হতে পারে প্রাথমিক সংক্রমণ ছড়িয়ে যাবার ফলে যথা— অস্থি, লসিকা গ্রন্থি, মূত্র ও প্রজননতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র (মস্তিষ্কাবরণীর যক্ষ্মা), অন্ত্র ইত্যাদি।

ফুসফুসে যক্ষ্মাক্রান্ত ব্যক্তি মারা যাওয়া বা ভালো না হওয়া পর্যন্ত গড়ে ২০–২৮ ব্যক্তিকে সংক্রমিত করে। চিকিৎসা ছাড়া থাকলে এদের ৬০ থেকে ৭০% আক্রান্ত লোক অবশেষে মারা যাবে।

উপসর্গ ও লক্ষণ

* দীর্ঘস্থায়ী জ্বর
* নৈশঘর্ম
* রক্তশূন্যতা
* ওজন হ্রাস

এছাড়া কিছু সাধারণ উপসর্গ যথা--

* গা ম্যাজ ম্যাজ করা
* ক্ষুধামান্দ্য
* উদরাময়
* মাংসপেশী ব্যথা
* স্ফীত ব্যথাদায়ক লসিকা গ্রন্থি

রোগ নির্ণয়

যক্ষ্মা রোগ নির্ণয়ের জন্য নিম্নোক্ত পরীক্ষাগুলো করা উচিত :

* বুকের রঞ্জন ছবি (x-ray)
* কফ পরীক্ষা ও জীবাণু চাষ
* টিউবারকুলিন (মনটোক্স) পরীক্ষা

এইচআইভি সংক্রমিতদের যক্ষ্মা নির্ণয়

সাধারণত যক্ষ্মা রোগ ধরা পড়ার পরই আরো অনুসন্ধান করে জানা যায় লোকটি অনেক আগে থেকেই এইচআইভি দিয়ে সংক্রমিত। দেখা গেছে এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর যক্ষ্মা হলে খুব তাড়াতাড়ি তার এইডস বিকাশ লাভ করে।

রোগের প্রারম্ভে এইচআইভি সংক্রমিত ও যক্ষ্মা রোগীর উপসর্গ দেখে তেমন কোনো পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। বোঝা যায় না দুটির মাঝে কোনটি হয়েছে। এমনকি টিউবারকুলিন (মনটোক্স) পরীক্ষায়ও তা সনাক্ত করা সম্ভব নয়। এ পরীক্ষা দিয়ে ব্যক্তিটির প্রতিরক্ষা

ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া পরিমাপ করা হয়। কিন্তু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যাওয়ায় তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটে না, ফলে প্রায়ই রোগ থাকা সত্ত্বেও ফলাফল না-বোধক (False negative) হয়।

বুকের রঞ্জন ছবি বা এক্স-রে দিয়েও রোগ নির্ণয় কঠিন। সাধারণ লোকের যক্ষ্মা রোগ হলে জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার তড়িৎ প্রতিক্রিয়ার ফলে ফুসফুসের কোষকলা ধ্বংস হয়ে স্থানে স্থানে গর্ত (cavities) সৃষ্টি হয় এবং এক্স-রে করা হলে তা ধরা পড়ে। কিন্তু এইচআইভি সংক্রমণে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল থাকায় প্রতিক্রিয়া তেমন ঘটে না, ফুসফুস খুব সামান্যই ধ্বংস হয় এবং ফলে গর্ত হবার সম্ভাবনা কমে যায়। বুকের এক্স-রে তাই প্রায়ই যক্ষ্মার কোনো আভাস দেয় না।

থুথুর জীবাণু চাষ (sputum culture) দিয়েই একমাত্র সঠিক রোগ নির্ণয় সম্ভব (ওপেন টিবি বা উন্মুক্ত যক্ষ্মা)।

চিকিৎসা

এইচআইভি আক্রান্ত যক্ষ্মা রোগী এবং সাধারণ যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসা একই প্রকার ওষুধ দিয়ে করতে হবে। কিন্তু এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর যক্ষ্মা সাধারণত আরোগ্য হয় না শুধু অবদমিত করে রাখা যায়।

চিকিৎসার জন্য নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করা হয় :

* বিছানায় বিশ্রাম : যতদিন তীব্র উপসর্গ থাকে ততদিন।
* কাশিতে যতদিন জীবাণু পাওয়া যাবে ততদিন রোগীকে অন্যদের কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে রাখতে হবে।
* উচ্চশক্তির উচ্চ আমিষ খাদ্য
* কাশির জন্য প্রয়োজনবোধে কোডেইন ফসফেট ৮ থেকে ১৫ মিলিগ্রাম দিনে চারবার সেবনের জন্য দেয়া যেতে পারে।

বীজঘ্ন ব্যবহার

যক্ষ্মা নিরোধে যেসব বীজঘ্ন ব্যবহার হয় তা হলো :

১। স্ট্রেপ্টোমাইসিন	১৫–২০ মিলিগ্রাম/কেজি/দিন বা ওজন > ৪৫ কেজিতে ১ গ্রাম এবং < ৪৫ কেজি হলে বা বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে ৭৫ গ্রাম (এইচআইভি রোগীদের স্ট্রেপ্টোমাইসিন দেয়া অনুচিত)	
২। রিফামপিসিম	পূর্ণবয়স্ক	শিশু
	>৫০কেজি ৬০০মিলিগ্রাম < ৫০ কেজি	১২ মিলি গ্রাম/কেজি (৬০০ মিলিগ্রামের বেশি নয়)

৩। আইসোনায়াজিড	২০০ থেকে ৩০০ মিলিগ্রাম (সিলিয়ারি যক্ষ্মা ও মস্তিষ্কাবরণী প্রদাহে ১০ মিঃগ্রাম/কেজি	৫ মিলিগ্রাম/কেজি
৪। ইথামবিউটল	প্রথমে ২৫ মিলিগ্রাম/কেজি পরে ১৫ মিলি গ্রাম/কেজি	
৫। পাইরাজিনামাইড	>৫০ কেজি ১.৫ গ্রাম ৫০ থেকে ৭৪ কেজি ২ গ্রাম >৭৫ কেজি ২.৫ গ্রাম	৩০ মিলিগ্রাম/কেজি
৬। সোডিয়াম প্যারাঅ্যামাইনো স্যালিসাইলেট	১০ থেকে ২০ গ্রাম	৩০০ মিলিগ্রাম/কেজি
৭। থায়াসেটাজোন	১৫০ মিলিগ্রাম	২ মিলিগ্রাম/কেজি
চিকিৎসার মেয়াদ		
(ক) ৯ মাস মেয়াদি চিকিৎসা	প্রথম ২ মাস : রিফামপিসিন আইসোনায়াজিড + ইথামবিউটল বা স্ট্রোপ্টোমাইসিন পরবর্তী ৭ মাস : রিফামপিসিন + আইসোনিয়াজিড	
(খ) ৬ মাস মেয়াদি চিকিৎসা	প্রথম ২ মাস : রিফমপিসিন আইসোনিয়াজিড + ইথামবিউটল বা স্ট্রোপ্টোমাইসিন + পাইরাজিনামাইড	
	পরবর্তী ৪ মাস : রিফামপিসিন + আইসোনিয়াজিড	

সন্ধানী রোগের চিকিৎসাতে উল্লেখ এইডস সংশ্লিষ্ট সুযোগ আছে—

(গ) ডটস (DOTS Dirietly observed therapy--short course) : ডটস হলো সরাসরি পর্যবেক্ষণ ভিত্তিতে স্বল্পকালীন চিকিৎসা। এ পদ্ধতিতে রোগীকে সরাসরি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ওষুধ খাইয়ে সংক্ষিপ্ত (দু'মাস) সময়ের মধ্যে আরোগ্য করা হয় এবং পদ্ধতিটি খুবই ফলপ্রসূ এবং বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত।

ঙ) বহু ওষুধরোধী যক্ষ্মা (MDR TB-multiple drugs resistance TB) চিকিৎসা করা দূরূহ। কমপক্ষে দু বৎসর ওষুধ সেবন প্রয়োজন হয়।

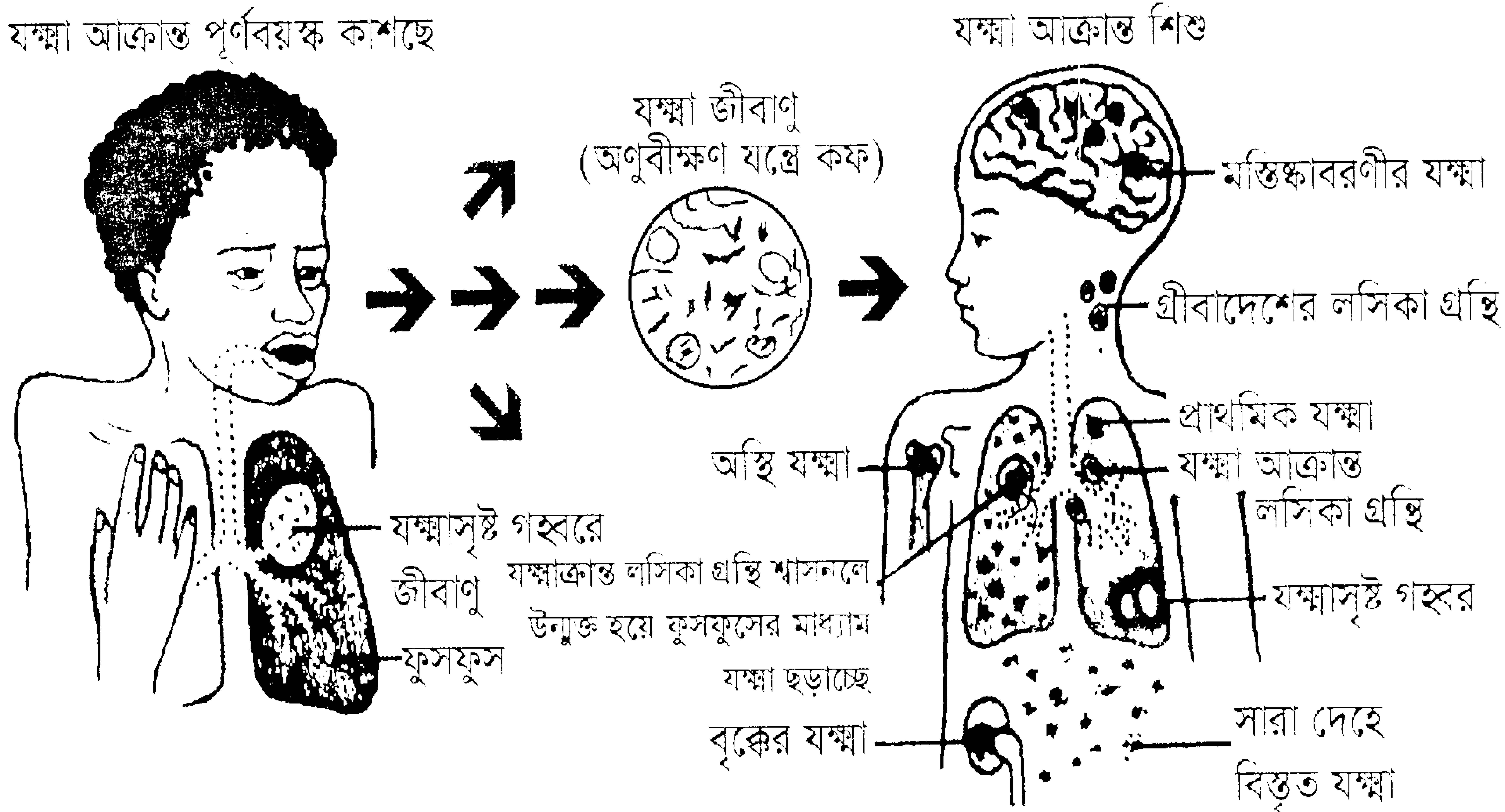

যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত শিশু ও পূর্ণবয়স্ক

যক্ষ্মা চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া

	পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া	মুখ্যত যে ওষুধ দায়ী	গ্রহণীয় ব্যবস্থা
গৌণ	পরিপাকতন্ত্রের বিপর্যয়	যে-কোনো সেবনযোগ্য ওষুধ	রোগীকে আশ্বস্ত করুন। ওষুধের সঙ্গে পানি কম দিন। খাবার গ্রহণের পর যথেষ্ট দেরি করুন। প্রয়োজনে বমি নিরোধক খান।
	কমলা রঙের নিঃসরণ	রিফামপিসিন	রোগীকে আশ্বস্ত করুন।
	সন্ধিস্থলে ব্যথা	পাইরাজিনামাইড	ব্যথানাশক দিন।
	কেন্দ্রাতিগ স্নায়ুপ্রদাহ (Peripheral neuropathy)	আইসোনিয়াজিড	পাইরিডক্সিন ১০ মি: গ্রাম প্রতিদিন
	চক্ষু-স্নায়ুপ্রদাহ	ইথামবিউটল	ইথামবিউটল বন্ধ করে যাচাই (evaluation) করুন।
মুখ্য	শ্রবণ স্নায়ু বিপর্যয় (Auditony nerve inpairment	স্ট্রেপ্টোমাইসিন	স্ট্রেপ্টোমাইসিন বন্ধ করে যাচাই করুন।
	ভেস্টিবুলার স্নায়ু বিপর্যয়	স্ট্রেপ্টোমাইসিন	স্ট্রেপ্টোমাইসিন বন্ধ করে যাচাই করুন।
	যকৃত প্রদাহ তথা জন্ডিস (Jaundice)	প্রায় সব যক্ষ্মাবিরোধী ওষুধ	চিকিৎসা বন্ধ করে যাচাই করুন।
	অভিঘাত (shock), ত্বকরক্তি (purpura)	রিফামপিসিন	চিকিৎসা বন্ধ করে হাসপাতালে পাঠান
	তীব্র বৃক্ক-অকার্যকরতা (Acute Renalfuilure)	স্ট্রেপ্টোমাইসিন	চিকিৎসা বন্ধ করে হাসপাতালে পাঠান
	বহিস্ত্বক মোচনশীল চর্ম প্রদাহ (Exfoliative dermatitis)	থায়োসিটাজোন	চিকিৎসা বন্ধ করে হাসপাতালে পাঠান।

বিসিজি এবং এইচআইভি

যক্ষ্মার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য যেসব দেশে যক্ষ্মা মহামারি আছে সেখানে জন্মের পর কিছুদিনের মাঝেই (বাংলাদেশে ৩ দিনের মধ্যে) শিশুকে বিসিজি বা ব্যাসিলাস ক্যালমেট গোয়েরিন টিকা দেয়া হয়।

এ টিকা সম্ভবত ১৫ বৎসর পর্যন্ত যক্ষ্মার আক্রমন থেকে শিশুকে রক্ষা করে। সাধারণত যাদের অনাক্রম্যতা হ্রাস (immuno-deficiency) পেয়েছে, তাদের জীবিত জীবাণুজাতীয় টিকা (Live vaccine) দেয়া হয় না। কিন্তু অনুন্নত দেশে যেখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে হাম, পোলিও প্রভৃতি নানারকম সংক্রামণ রোগ-জীবাণুর অবাধ বিচরণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে সেখানে এ নিয়ম পুরোপুরি খাটে না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে শুধু উপসর্গবিহীন এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তিকেই বিসিজি টিকা দেয়া যাবে। কিন্তু যাদের এইডস সংশ্লিষ্ট জটিলতা আছে তাদেরও টিকা দেয়া উচিত নয়। নিচে এইচআইভি সংক্রমণে টিকা দেয়া সম্পর্কে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরিবর্ধিত টিকাদান কার্যক্রম (EPI) অনুমোদিত নীতি পরিবেশিত হলো :

এইচআইভি সংক্রমণ ও টিকাদান নীতিমালা

	টিকা	উপসর্গহীন (রোগের প্রকাশ নেই)	ক্লিনিক্যাল এইডস (এইডস-র উপসর্গ বিদ্যমান)
শিশু	বি.সি.জি.	হ্যাঁ (অর্থাৎ টিকা দিতে হবে)	না
	ডি.পি.টি.	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	অ.পি.ভি.	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	আই.পি.ভি.	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	হাম	হ্যাঁ	হ্যাঁ
মহিলা	ধনুষ্টংকার-এর মন্দীভূত বিষ (Tetanus toxoid)	হ্যাঁ	হ্যাঁ

মনে রাখতে হবে

* উপসর্গ যথা স্থায়ী কাশি থাকলে তা যক্ষ্মার ইঙ্গিত বহন করে এবং অবশ্যই কাশি পরীক্ষা করতে হবে।
* ওষুধ সেবনের কিছুদিনের মধ্যে উপসর্গ বিলুপ্ত হলেও চিকিৎসার মেয়াদ সম্পূর্ণ করতে হবে।
* যেসব আত্মীয়স্বজন রোগীর সংস্পর্শে এসেছে তাদের সবাইকে পরীক্ষা করা উচিত।
* কারো জ্বর, ওজন হ্রাস এবং দীর্ঘস্থায়ী কাশি থাকলে অবশ্য যক্ষ্মা আছে কি-না পরীক্ষা করে সন্দেহমুক্ত হতে হবে।
* এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির সাধারণ লোকদের চেয়ে দশগুণ বেশি যক্ষ্মা হবার আশঙ্কা থাকে।
* দেহের অন্যান্য স্থানের চেয়ে ফুসফুসেই বেশি যক্ষ্মা হয়ে থাকে।
* যক্ষ্মা এইডস-এর বিকাশকে ত্বরান্বিত করে।
* তীব্র বহিঃস্তক মোচনশীল চর্মপ্রদাহ (severe exfoliative dermatitis) এড়াবার জন্য থায়াসিটাজোনা-এর পরিবর্তে ইথামবিউটল ব্যবহার করতে হবে।

* এইচআইভি আক্রান্ত শিশুকে কখনোই থায়াসিটাজোন দেয়া উচিত নয়।
* এইচআইভি বিস্তার এর আশংকা হ্রাসের জন্য স্ট্রেপ্টোমাইসিন ব্যবহার করা অনুচিত।
* ১২ বছরের ছোট শিশুকে ইথামবিউটল এবং ৫ বছরের ছোট শিশুকে স্ট্রেপ্টোমাইসিন দেয়া উচিত নয়।
* গর্ভবতী মহিলাকে স্ট্রেপ্টোমাইসিন দেয়া উচিত নয় কেননা তা গর্ভফুল অতিক্রম করে গর্ভজাত শিশুর শ্রবণ স্নায়ু এবং বৃক্কের ক্ষতিসাধন করে।
* এইচআইভি আক্রান্তদের মাঝে যাদেরকে মানসম্মত স্বীকৃত ওষুধ স্ট্রেপ্টোমাইসিন, আইসোনিয়াজিড এবং থায়াসিটাজোন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়েছে তাদের চেয়ে যাদের রিফামপিসিনভিত্তিক সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা দেয়া হয়েছে তাদের মৃত্যুর হার কম।
* এইচআইভি সংক্রমণের ফলে কারো অনাক্রম্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে যক্ষ্মার চিকিৎসার মেয়াদ দীর্ঘায়িত করার প্রয়োজন হতে পারে।

টিউবারকুলিন পরীক্ষা

(যক্ষ্মা আছে কি–না জানার জন্য নিম্নোক্ত পরীক্ষাগুলো করা হয়)

* ম্যানটোক্স পরীক্ষা (Mantoux Test) : এতে ৫ একক (5TU) বিশুদ্ধ গৌণ আমিষ (purified protein derivative-PPD) ত্বকাভ্যন্তরে সূঁচি প্রয়োগের মাধ্যমে দিয়ে ৪৮ থেকে ৭২ ঘন্টা পর প্রতিক্রিয়া মাপা হয় (নিম্ন বাহুর সম্মুখ এলাকায়)। ১০ মিমি. বা আরো বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে এলাকা ফুলে উঠলে লোকটি যক্ষ্মা জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত বুঝায় (এইচআইভি সংক্রমিতদের ৫ মিমি. ফুলে উঠলেই যক্ষ্মায় উপস্থিতি হিসেবে গণ্য করা হয়)।

* হীফ পরীক্ষা (Heaf lest) : এতে ১ ফোঁটা বিশুদ্ধ গৌণ আমিষ (PPD) ত্বকে রেখে ৬ বার সূঁচ ফোটানো হয়। প্রতিক্রিয়া পরিমাপ করা হয় ৩–৭ দিন পর ৪টি ধাপ (Grade) অনুযায়ী। ১০ মিমি. বা বেশি ব্যাসার্ধ নিয়ে ফুলে উঠলে তাকে ৪র্থ ধাপ হিসেবে ধরা হয়।

* টাইন (tine) পরীক্ষা
* ইমোপরীক্ষা (Imotest)

নবম অধ্যায়

এইডস ও ফুসফুস প্রদাহ

১৯৮১ সালে অ্যামেরিকাতে এইডস আক্রান্ত কিছু পুরুষ রোগীর মাঝে *Pnenmocystis carinii* ঘটিত এক বিরল ফুসফুস প্রদাহ (নিউমোনিয়া) পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য আগে থেকেই জানা ছিল এ বিরল ফুসফুস প্রদাহ কেবল যাদের অনাক্রম্যতা বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে তাদের ক্ষেত্রেই ঘটে। বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের এইডস রোগীদের মধ্যেই এ সংক্রমণ দেখা যায়।

অতীতে *Pneumocystis carenii* কে প্রোটোজোয়া মনে করা হতো। এখন জেনেটিক পরীক্ষার সাহায্যে বুঝা গেছে যে এটি এক ধরনের ছত্রাক। জীবনের প্রারম্ভেই এ ছত্রাকের সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটে এবং প্রতিরক্ষিকা সৃষ্টি হয় যদিও দেহে কোনো রোগ লক্ষণ দেখা যায় না। যক্ষ্মা জীবাণুর মতো এটিও দেহে বছরের পর বছর লুকিয়ে থাকতে পারে এবং দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়লেই সে তার স্বমূর্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং রোগ সৃষ্টি করে। গ্রীষ্মমণ্ডলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব অনেকটা কম। যক্ষ্মাই সেখানে ফুসফুসের প্রধান সুযোগ-সন্ধানী সংক্রমণ।

উপসর্গ

এইডস রোগীদের দেহে অত্যন্ত ধীরে সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাসের পর মাস ধরে *Pneumocystis carenii* ঘটিত ফুসফুস প্রদাহ ঘটে। প্রাথমিক উপসর্গগুলো এইডস সংশ্লিষ্ট জটিলতা (ARC)-এর মতো হতে পারে যথা :

- গা ম্যাজ ম্যাজ করা,
- ওজন হ্রাস,
- জ্বর ইত্যাদি।

এক্ষেত্রে ফুসফুসীয় রোগের তেমন কোনো লক্ষণ না-ও থাকতে পারে। ক্রমান্বয়ে রোগীর —

* শুকনো কাশি দেখা দিতে পারে। শ্বাসকষ্টও (ঘন ঘন ছোট শ্বাস) থাকতে পারে।
* কফ উৎপাদন কমে যায় তবে জীবাণু সংক্রমণ ঘটলে এর ব্যতিক্রম ঘটে।
* পূর্ণ শ্বাসগ্রহণ সম্ভব হয় না।
* মাঝে-মধ্যে ফুসফুস আবরণী প্রদাহজনিত বুক ব্যথা হয়, জ্বর ও শ্বাস দ্রুত থাকে।

রোগ নির্ণয়

১. **বুকের রঞ্জন চিত্র** (x-ray) : প্রথমদিকে স্বাভাবিক থাকতে পারে। পরে কোষকলার ফাঁকে ফাঁকে ফুসফুসীয় মূলবৃত্তিক ছায়া (perihilar Unterstitial shadowing) পরিলক্ষিত হতে পারে।

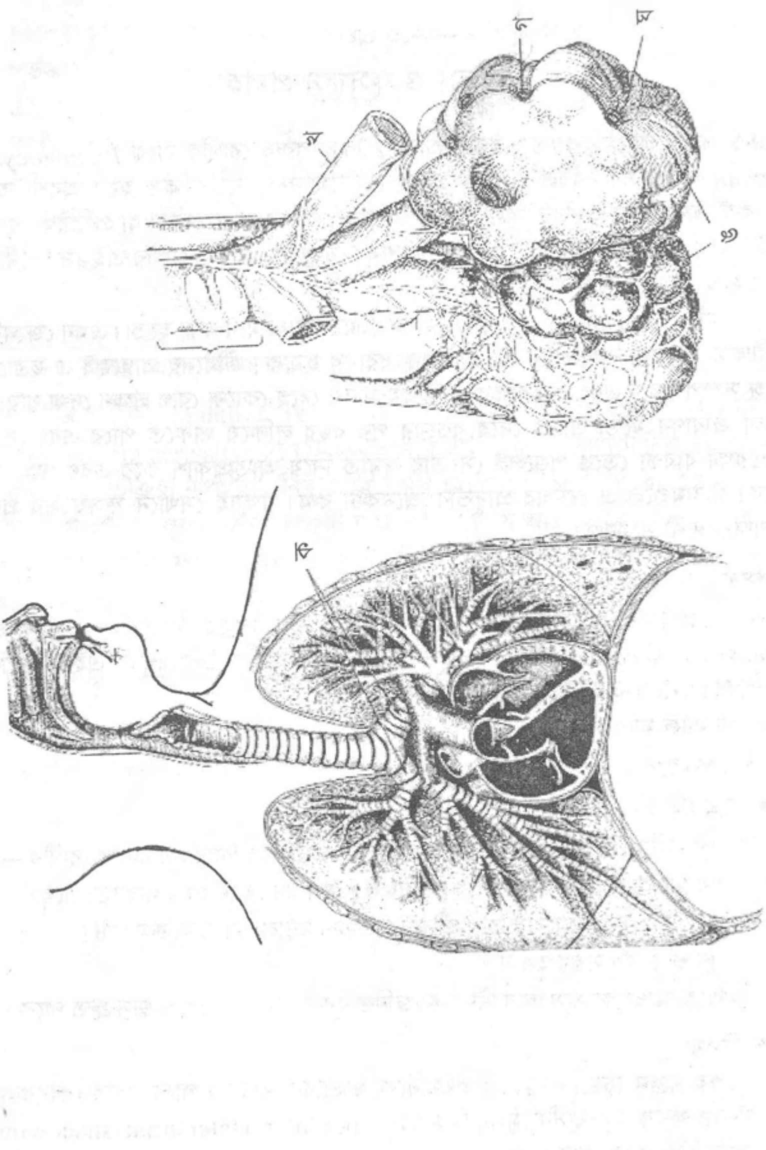

২. **প্রাথমিকভাবে ফুসফুসের ক্রিয়া পরিবর্তন :** ফুসফুসের সর্বাধিক শ্বসন ক্ষমতা (Forced pulmonary vital capacity) এবং কার্বন মনোক্সাইড স্থানান্তর (transfer) হ্রাস পায়।
৩. **ধমনীতে অক্সিজেনের পার্শ্বচাপ :** শেষদিকে হ্রাস পায়।
৪. **পরীক্ষার জন্য কফ সংগ্রহকরণ :** একাজ বেশ কঠিন তবে সম্পৃক্ত লবণাক্ত দ্রবণের স্প্রে দিয়ে তা সংগ্রহ সম্ভব। খুব সতর্কতার সাথে কোষ পরীক্ষা (cytological examination) করে pnenmocystis-কে সনাক্ত করা সম্ভব।
৫. **জীবিত কোষ পরীক্ষা :** অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে শ্বসননলবীক্ষণ যন্ত্র (Bronchoscope) দিয়ে শ্বসন নল ধৌত করে বা জীবিত কোষ পরীক্ষা (Biopsy) করে সঠিক রোগ নির্ণয় করা যেতে পারে।

রোগীকে কৃত্রিমভাবে কাশি উৎপাদন করে কফ পরীক্ষা করা হলো নবতম পরীক্ষার একটি। অবশ্য অনুন্নত দেশে এ রোগ নির্ণয় করা কঠিন।

চিকিৎসা

নিম্নোক্ত ওষুধগুলো ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত চিকিৎসার্থে ব্যবহার করা যায় :
কোট্রাইমোক্সাজোল (ট্রাইমোথোপ্রিম ২০ মি. গ্রাম/কেজি/দিন এবং সালফামেথোক্সাজোল ১০০ মি.গ্রাম/কেজি/দিন/বিভক্ত মাত্রায়, বা ডেপসোম ১০০ মি. গ্রাম/দিন + ট্রাইমথোপ্রিম ২০ মি: গ্রাম/কে.জি/দিন বা পেন্টামিডিন ৪ মি.গ্রাম/কে.জি/দিন। শিরাভ্যন্তরে, প্রথম দুটি মাত্রা শিরাভ্যন্তরে দিয়ে পরবর্তীগুলো মুখে সেবনের জন্য দেয়া চলে। ওষুধ সেবনের ৩ থেকে ৭ দিন পর রোগীর উন্নতি দেখা যায়, যথা— জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্ট নাড়ীর গতি ও শ্বসন হার কমতে থাকে।

বুকের রঞ্জন চিত্রে তেমন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না এমনকি প্রথম কিছুদিন চিকিৎসাকালীন আরো অবনতি দেখা যায়। পেন্টামিডিন আজকাল নাক দিয়ে শুঁকেও গ্রহণ করা যায়, তবে এর কার্যকারিতা প্রমাণিত নয়।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কখনো চর্মে ফুসকুঁড়ি, জ্বর, শ্বেত রক্ত কণিকা হ্রাস ইত্যাদি দেখা যায়। স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকদের মনে রাখতে হবে :
১. কোট্রাইমেক্সোজোল প্রচণ্ড বমিভাব বা বমন ঘটাতে পারে।
২. পেন্টামিডিন শরীরে অস্বাচ্ছন্দ্য, রক্তচাপ হ্রাস, রক্তে চিনির মাত্রা হ্রাস (পরে চিনি অসহনশীলতা) ঘটায়।
৩. এইডসের চিকিৎসার্থে ব্যবহৃত জিডোভুভিন (ভাইরাসবিরোধী AZT) সৃষ্ট অস্থিমজ্জার বিষাক্ততা বা ক্ষতি (myelotoxicity) আরো বাড়িয়ে দেয় ডেপসোন।

চিকিৎসা দেয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু রোগীর দেহে রোগ দ্রুত বিকাশলাভ করে এবং রোগী অক্সিজেন স্বল্পতায় (Hypoxic) ভোগে। সুতরাং অতিরিক্ত মূল্যবান চিকিৎসা হিসেবে উচ্চমাত্রায় মিথাইল প্রেডনিসোলোন অর্থাৎ ৪০ মি. গ্রাম দিনে তিনবার করে ৩ থেকে ৪ দিন

দেয়া যায়। এ ওষুধ বেশিদিন দেয়া উচিত নয়, কেননা তা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে অবদমিত (immune suppressive) রাখে।

প্রতিরোধ

এইডস রোগীদের *Pneumocystis carinii* ফুসফুস প্রদাহ একটি সাধারণ ব্যাপার। চিকিৎসা গ্রহণ সত্ত্বেও কয়েক মাস পর তা পুনরায় দেখা দিতে পারে। এজন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া একটি সমস্যা, তবে নিম্নোক্ত ওষুধগুলো সাধারণভাবে ব্যবহার করা চলে :

১. প্রতিদিন কম মাত্রায় কোট্রাইমোক্সাজোল বা ডেপসোন।

২. সাপ্তাহিক ফেনসিডার (সালফাডক্সিন/ পাইরিমোথামিন) বা ডেপসোন/ পাইরিমেথামিন

দুই সপ্তাহ পর পর নাকে শুঁকে পেন্টামিডিন (pentamisone inhalation) গ্রহণ।

দশম অধ্যায়

এইচআইভি সংক্রমণ ও মুখের রোগ

এইচআইভি সংক্রমণের প্রথম ও শেষ উভয় পর্যায়েই মুখে নানারকম রোগ হয়। অবশ্য এসব রোগলক্ষণ এইচআইভি সংক্রমণ ছাড়াও অন্যান্য পীড়া ও অপুষ্টি রোগেও দেখা দিতে পারে। সুতরাং শুধু মুখের লক্ষণ দেখেই এইডস রোগী সনাক্ত করা উচিত নয়, তবে সন্দেহ করা যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখতে হবে প্রকৃতই তার এ রোগ আছে কি–না। অবশ্য এইচআইভি সংক্রমণে প্রায়ই অন্য কোনো রোগ লক্ষণ ধরা পড়ার আগে মুখেই প্রথম তার আভাস দেখা যায়। এজন্য দাঁতের ডাক্তারই সর্বপ্রথম রোগী সনাক্ত করে চিকিৎসার জন্য যথাযথ স্থানে পাঠাতে পারেন। ১৯৮৬ সালে ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিউনিটি এইচআইভি সংক্রমণের সাথে সংশ্লিষ্ট মুখের ৪০টির বেশি রোগের শ্রেণীবিভাগ করেছেন।

ছত্রাক সংক্রমণ

এইচআইভি সংক্রমণে সবচেয়ে বেশি (৪০%) রোগীর) মুখের ক্যান্ডিডামযতা (candidiasis) বা থ্রাশ (Thrush) হয়। এ রোগে মুখগহবরে সাদা এক ধরনের কপট পর্দা (pseudomembranous white patch) পড়ে। এগুলো মুখের ছাদ অর্থাৎ তালুতে, গালের ভিতর দেয়ালে দৃষ্ট হয় এবং সহজেই চেঁছে তোলা যায়। কখনো কখনো তালু এবং জিহবার উপরিভাগে লালচে (erythematous) ক্যান্ডিডামযতা দেখা দেয়।

জীবাণু সংক্রমণ

নানা ধরনের জীবাণু মাড়ির রোগ ঘটায় এবং এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির দেহ এসব জীবাণু সহজেই আক্রমণ করতে পারে। এ রোগে মাড়ি ফুলে উঠে, চাপ দিলে রক্ত বের হয়, দাঁতের গোড়া থেকে আলগা হয়ে আসে এবং গোলাপির বদলে লালচে দেখায়। রোগীর মুখে দুর্গন্ধ থাকে এবং স্বাদ বিশ্রী হয়ে যায়।

মাড়ির পচনশীল প্রদাহ (Nectrotising gingivitis)

আজকাল খুবই বিরল তবে এইচআইভি সংক্রমিত রোগীর দেহে তা আবার ফেরত এসেছে। এ রোগকে পরিখামুখও (Trench mouth) বলে। এতে মাড়ির কলাতন্তু মরে গিয়ে ধূসর রঙ ধারণ করে এবং দাঁতের চারপাশে পুরানো রক্ত ও পূঁজ জমা হয়। হাম পরবর্তী অপুষ্টি তথা এইচআইভি–তে আক্রান্ত শিশুদের ক্ষেত্রে এ রোগ প্রায়ই দেখা যায়।

মুখের পচনশীল প্রদাহ (Necrotising stomatitis) বা ক্যানক্রাম অরিস (Cancrum oris) : **এটি** মাড়ির পচনশীল প্রদাহ থেকেও খারাপ রোগ এবং তা মাঝে মাঝে এইচআইভি

আক্রান্ত মায়ের সন্তানদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এ ভয়াবহ রোগ পূর্ণ বিকাশলাভ করলে দুর্বল শিশুর গাল ফুটো হয়ে যেতে পারে।

ভাইরাস সংক্রমণ

এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তি সহজেই বিবিধ ভাইরাসের কবলে পড়ে। প্রায় ১০% এইডস রোগীর হার্পিসজনিত মুখ প্রদাহ (Herpetic stomatitis) ও রোমশ শ্বেতী রোগ (Hairy leukoplakia) দেখা যায়। হার্পিসজনিত মুখ প্রদাহে মাড়ি ও ঠোঁটে উজ্জ্বল লাল ফোস্কা পড়ে, চোয়ালের নিচে ব্যথাদায়ক ফোলা এবং গলা ব্যথা (sore throat) থাকে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা

এইচআইভি এইডস রোগীর মুখকে বিভিন্ন রোগের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে হলে নিম্নোক্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে :

ক. কিভাবে দাঁত বিশেষ করে মাড়ি ও দাঁতের সংযোগস্থল পরিষ্কার করতে হয় তা রোগীকে শেখাতে হবে। ভালো দাঁতের ব্রাশ বা দাঁতন (মেছওয়াক) দিয়ে প্রতিবার খাবার পর দাঁত পরিষ্কার করতে হবে। দাঁতের গোড়ায় জমা পাথরের মতো শক্ত ময়লা (tartar) দন্ত বিশেষজ্ঞের কাছে গিয়ে ঘন ঘন বিদূরিত করতে হবে ।

খ. নিয়মিত হালকা গরম লবণাক্ত পানিতে ভালো করে কুলি (rinse) করতে হবে।

গ. প্রতিদিন তাজা ফল–মূল ও সবজি গ্রহণ করে অপুষ্টি দূর করতে হবে।

চিকিৎসা

ক্যান্ডিডাময়তা (থ্রাশ)

শিশু, যারা দুর্বল, যারা অপুষ্টিতে ভুগছে, যারা নকল দাঁত ব্যবহার করছে বা বীজঘ্ন (antibiotic) ব্যবহার করছে তাদের মুখে ক্যান্ডিডাময়তা বা থ্রাশ হতে পারে। মুখের এ ধরনের অবস্থা এইচআইভি সংক্রমণের ইঙ্গিত বহন করে। এ রোগে নিম্নোক্তভাবে চিকিৎসা করতে হবে :

* এইচআইভি ব্যতীত অন্য কোনো কারণে ক্যান্ডিডাময়তা হয়েছে কিনা তা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে।
* অপুষ্টি থাকলে তা দূর করতে হবে।
* এইচআইভি ছাড়া অন্য কোনো কারণে বীজঘ্ন পেতে থাকলে তা সম্ভব হলে বন্ধ করে দিতে হবে।
* একটি তুলা শলাকা দিয়ে সাদা পর্দার উপর বড়দের ক্ষেত্রে দিনে ৪ বার শিশুদের ক্ষেত্রে দিনে ৩ বার এবং ৫ বৎসরের ছোট শিশুদের দিনে দুবার নিস্টাটিন ক্রিম লাগাতে হবে। নিস্টাটিন না পাওয়া গেলে জেনশন ভায়োলেট (Gentian Violet) লাগানো যেতে পারে। এ ছাড়া অন্যান্য ওষুধ যথা মাইকোনাজল, এম্ফোটিরিসিন–বি, ক্লোট্রাইমাজল বা ক্লোরোহেক্সিডিন লাগানো যেতে পারে। এগুলো বড়ি হিসেবে ব্যবহার করলে দিনে ৩ বার চুষতে হবে।

* ৩ থেকে ৪ সপ্তাহ উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পর কোনো উপকার না পেলে তাকে আরো ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

মাড়ির রোগ

উপরে বর্ণিত প্রতিরোধ ব্যবস্থার নিয়মগুলো মানতে হবে। রক্তপড়া বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত দিনে তিন থেকে চার বার গরম পানিতে লবণ গুলে কুলি করতে হবে। রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে দিনে একবার কুলি করলেও চলবে। কুলি করার জন্য ক্লোরহেক্সিডিনও ব্যবহার করা চলে।

পচনশীল মুখ ও মাড়ির প্রদাহ

এটা খুবই মারাত্মক রোগ। কালবিলম্ব না করে রোগীকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে এবং চিকিৎসা শুরু করতে হবে। নিচের ছক অনুযায়ী তিন দিন তাকে পেনিসিলিন দিতে হবে।

পচনশীল মুখ এবং মাড়ির প্রদাহে চিকিৎসা (NacroLisuing stomatitis Gingivitis)

বেনজাইল পেনিসিলিন (স্ফটিকময় বা ক্রিস্টালাইন)

দশ লক্ষ (১০,০০,০০০) এককে দুই মিলিলিটার বিশুদ্ধ পানি যোগ করে মিশ্রণ বানিয়ে মাংসপেশী বা শিরাভ্যন্তরে প্রতি ছয় ঘন্টা পর পর দিতে হবে।

বা প্রকেইন পেনিসিলিন :

ত্রিশ লক্ষ এককে (৩০,০০,০০০) দশ মিলিলিটার বিশুদ্ধ পানি দিয়ে দ্রবণ বানিয়ে শিরাভ্যন্তরে দিনে একবার দিতে হবে।

যে মাত্রায় দিতে হবে :

দেশরীরের ওজন (কেজি)	পানি ও পেনিসিলিনের দ্রবণ (মিলিলিটার)	
	বেনজাইল (ক্রিস্টালাইন) পেনিসিলিন	প্রকেইন পেনিসিলিন
৩–৫	০.৫	১
৬–৯	০.৫	১.৫
১০–১৯	১	২
২০–২৯	১.৫	৩
৩০–৪৯	২	৩
পূর্ণবয়স্ক	২	৪

এছাড়া গরম পানি দিয়ে কুলি করতে হবে। ৫% হাইড্রোজেন পারক্সাইডে একটি পরিষ্কার ন্যাকড়া ভিজিয়ে মাড়ি মোছা প্রয়োজন। শিশুদের ক্ষেত্রে এক অংশ হাইড্রোজেন পারোক্সাইডের সাথে পাঁচ অংশ পানি মিশিয়ে ব্যবহার করা উচিত।

তুলা দিয়ে মাড়ি শুকিয়ে স্থানীয় অবেদনকারী (local anesthetic) ওষুধ লাগাতে হবে। সম্ভব হলে দাঁতের গোড়া থেকে কিছু শক্ত ময়লা (tartar) দূর করেতে হবে।

দিনে দুটো (৫০০ মিঃ গ্রাম বড়ি) করে খাদ্যপ্রাণ সি বড়ি এক সপ্তাহ পর্যন্ত দিতে হবে। হাইড্রোজেন পারক্সাইডের দুর্বল দ্রবণ মুখে নিয়ে কয়েক মিনিট রেখে কুলি করতে হবে। শিশুদের মাড়ি দিনে চারবার এ দ্রবণ দিয়ে মুছে দিতে হবে। তিনদিন পর গরম পানিতে লবণ দিয়ে কুলি করা যেতে পারে। দাঁত নরম ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে।

হার্পিসজনিত মুখ প্রদাহ (Herpetic stomatitis) : ফোস্কা/মুখে ঘা

ওষুধ দিয়ে হার্পিস ভাইরাস বিনষ্ট যায় না। ফোস্কাগুলো দশদিন পর এমনিতেই চলে যাবে। তবে নিম্নোক্তভাবে চিকিৎসা করা যেতে পারে।

- জ্বরের জন্য অ্যাসপিরিন বা অ্যাসিটামিনোফেন দিতে হবে।
- ঠোঁটের উপরের ঘা–এ জেনশন ভায়োলেট (Gentian violet) বা পেট্রোলিয়াম জেলি লাগিয়ে দ্বিতীয় দফা সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে।

একাদশ অধ্যায়

এইডস এবং উদরাময়

দীর্ঘদিনের (পুরানো) উদরাময় এবং একইসাথে ওজন হ্রাস এইডস-এর একটি সাধারণ উপসর্গ। তবে উদরাময়, পানিশূন্যতা এবং সৃষ্ট অপুষ্টি সফলভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব।

উদরাময় কি?

মলে যখন পানির অংশ বেড়ে যায়, বার বার মল ত্যাগ হয় তথা মলের পরিমাণ বেড়ে যায় তাকে উদরাময় (diarrhoea) বলে।

যদি উদরাময় সহসা শুরু হয় এবং মাত্র কয়েকদিন স্থায়ী থাকে তাকে তীব্র (Acute) উদরাময় বলে। কিন্তু উদরাময় মাসের পর মাস বা বছরের পর বছর স্থায়ী হলে তাকে পুরানো (chronic diarrhoea) উদরাময় বলে।

কেন উদরাময় ঘটে?

যখন অন্ত্র স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারে না অর্থাৎ অন্ত্রে অনেক বেশি তরল পদার্থ নিঃসৃত হয় বা অন্ত্র হজমের পর অনেক কম তরল পদার্থ শোষণ করে তখন উদরাময় ঘটে। পরজীবী, জীবাণু বা ভাইরাস এজন্য দায়ী। তাই সবসময় স্বাস্থ্যসম্মতভাবে প্রস্তুত স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করা উচিত।

উদরাময় বিপজ্জনক

উদরাময়ের সবচেয়ে মারাত্মক দিক হলো পানিশূন্যতা। এতে দেহের প্রয়োজনীয় পানি ও লবণ বের হয়ে যায়।

পানিশূন্যতার লক্ষণ

১. তৃষ্ণা
২. দ্রুত হৃদস্পন্দন
৩. মুখগহবরে শুষ্কতা
৪. কোটরাগত চোখ
৫. চর্মের স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস

এছাড়া রোগীর ক্ষুধামান্দ্য ঘটে ও বমি হয় ফলে সে আরো ওজন হারায়। ওজন হ্রাস, পানিশূন্যতা ক্ষুধামান্দ্য ইত্যাদির একত্র প্রভাবে রোগীর অনাক্রম্যতা (Immune system) আরো দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে সে আরো বেশি সংক্রমণপ্রবণ হয়ে উঠে এবং মারাও যেতে পারে। আন্ত্রিক জীবাণুগুলো দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে অন্ত্রের স্থায়ী ক্ষতিসাধন করতে পারে। এইডস রোগীদের ক্ষেত্রে এধরনের ব্যপার প্রায়ই ঘটে থাকে।

এইডস রোগীরা কেন উদারময়ে ভোগে?

খাবার এবং পানীয় উদরাময় সৃষ্টিকারী মারাত্মক জীবাণু দিয়ে দুষ্ট হতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক দেহে পাকস্থলীর অম্লরস এবং অন্ত্রের অনাক্রম্য ব্যবস্থা (gut immune defense system) আক্রমণকারী জীবাণুদের ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু এইচআইভি শুধু এই অনাক্রম্যতাকেই দুর্বল করে দেয় না উপরন্তু নিজেও সরাসরি অন্ত্রের ক্ষতিসাধন করে। তাই এইডস রোগীর উদরাময় ঘটে।

এইডসজনিত উদরাময় সংঘটক

এইডস রোগীর দুর্বল দেহে প্রবেশ করে যেসব জীবাণু ও পরজীবী উদরাময় ঘটায় তাদের প্রধান হলো :

জীবাণু : নিম্নলিখিত জীবাণুসমূহ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ—

Salmonella (স্যালমোনেলা)

Schigela (শিগেলা)

পরজীবী : নিম্নলিখিত পরজীবীসমূহ বিশেষভাবে গুরত্বপূর্ণ—

Cryptosporidium (ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়াম)

Isospora belli (আইসোস্পোরা বেলি)

মারাত্মক উদরাময়, পেটে ব্যথা, বমন এবং শোষণে ব্যাঘাত (malabsorption) ঘটায়।

ভাইরাস : নিম্নলিখিত ভাইরাসসমূহ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ—

Cytomegalo (সাইটোমেগালো ভাইরাস)

এটি পেটে ব্যথা এবং অপেক্ষাকৃত কম মারাত্মক উদরাময়

ব্যাসিলাস : নিম্নলিখিত ব্যাসিলামসমূহ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ

Mycobacterium tuberculosis (মাইকোব্যাক্টোরিয়াম টিউবারকুলোসিস)

যক্ষ্মা জীবাণু মাঝে মাঝে অন্ত্র আক্রমণ করে এবং বহুদিন ধরে (Chronic) উদরাময় ও শোষণ ব্যাঘাত ঘটায়। এইচআইভি অন্ত্রের ঝিল্লী আবরণের ক্ষতি করে ফলে প্রায়ই উদরাময় ও শোষণ ব্যাঘাত ঘটে।

এইডস সংশ্লিষ্ট উদরাময়ের চিকিৎসা

উদরাময়ের কারণ যাই হোক না কেনো দেহ থেকে নির্গত হয়ে যাওয়া পানি ও লবণের ঘাটতি পূরণ করা হলো সর্বাপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য খাবার স্যালাইন দিতে হবে। একই সাথে অতিরিক্ত পানীয় হিসেবে চা, স্যুপ, ডাবের পানি, ভাতের মাড় এবং ফলের রস দেয়া যেতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফ অনুমোদিত খাবার স্যালাইনে (ORS) থাকে :

৩.৫ গ্রাম সোডিয়াম ক্লোরাইড (বা ২.৫ গ্রাম সোডিয়াম বাইকার্বোনেট)

১.৫ গ্রাম পটাশিয়াম ক্লোরাইড

২০ গ্রাম গ্লুকোজ (অ্যানহাইড্রাস বা অজলীয়)

(১ লিটার পরিষ্কার পানিতে উপরোক্ত দ্রবণ তৈরি করতে হবে)

বাড়িতে নিম্নোক্তভাবে খাবার স্যালাইন তৈরি করা যায় :

১ সমান চা চামচ (৫ মিলি.) সাধারণ রান্নার লবণ

৮ সমান চা চামচ চিনি

১ লিটার পরিষ্কার পানি

ঘরে খাবার স্যালাইন তৈরি করার অপর একটি স্বীকৃত প্রক্রিয়া হলো :

* তিন আঙুলের প্রথম ভাঁজ পর্যন্ত এক চিমটি লবণ
* এক মুঠো গুড়

* আধসের ফুটন্ত পানি ঠাণ্ডা করে বা সমপরিমাণ টিউবওয়েলের পানিতে ভালো করে গুলে রোগীকে খেতে দিতে হবে।

* প্রত্যন্ত অঞ্চলে চিনি বা গুড় না পাওয়া গেলে বিকল্প হিসেবে চাল দিয়েও খাবার স্যালাইন তৈরি করা যায়। এজন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে—

* এক মুঠো (২০ থেকে ২৫ গ্রাম) চাল ধুয়ে পানিতে ভিজিয়ে নরম করতে হবে।
* নরম চালকে শিলপাটায় মিহি করে বাটতে হবে।

* সোয়া দুই গ্লাস পানিতে (প্রায় ৬০০ মিলি) তা গুলে একটা পরিষ্কার হাড়িতে করে তা চুলোয় বসাতে হবে। এবার দ্রবণটা ফুটতে শুরু করলে তা নামিয়ে ঠাণ্ডা করে তিন আঙুলের প্রথম ভাঁজ পর্যন্ত এক চিমটি লবণ মেশালেই রোগীকে দেবার খাবার স্যালাইন পাওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে ৬ থেকে ৮ ঘন্টা পর তা পরিবেশনের উপযুক্ত থাকবে না।

খাবার গ্রহণের পূর্বে হাত ধোয়া উদরাময় প্রতিরোধের পূর্বশর্ত

বিশেষ সংক্রমণজনিত উদরাময়ের চিকিৎসা

এইডস রোগীকে নানাবিধ সংক্রমণ সহজেই কাবু করে এবং কিছু কিছু উদরাময় সৃষ্টিকারী সংক্রমণের ক্ষেত্রে বীজঘ্ন ব্যবহার প্রয়োজন

উদরাময়ের কারণ	মনোনীত বীজঘ্ন
Salmonela Isopora beli	**কোট্রাইমোক্সাজোল** ৯৬০ মি. গ্রাম দিনে দুবার ৯ থেকে ২১ দিন
আন্ত্রিক যক্ষ্মা	যক্ষ্মাবিরোধী চিকিৎসা।
ক্রিপ্টোস্পোরিডোসিস	নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। টেট্রাসাইক্লিন
কলেরা	**টেট্রাসাইক্লিন** প্রাপ্তবয়স্ক : ৫০০ মিলি. দিনে ৪ বার, ৩দিন শিশু : প্রতি কেজি ওজনে দিনে ৫০ মিলি. হিসেবে ৪ মাত্রায় ভাগ করে ২ দিন **ফুরাজলিডিন** প্রাপ্তবয়স্ক : ১০০ মিলি. ৬ ঘন্টা পর পর ৫ দিন শিশু : প্রতি কেজি ওজনে ৫ মি. ৪ মাত্রায় ভাগ করে, ৩ দিন (১ মাস বয়সের কম শিশুকে দেয়া নিষেধ)।
কলেরা	**কোট্রাইমোক্সাজোল** পূর্ণবয়স্ক : ৯৬০ মিলি. (১৬০ মিঃ গ্রাম ট্রাইমেথোপ্রিম এবং ৮০০ মিলি. সালফামেথোক্সাজোল) দিনে দুবার, ৩–৫ দিন শিশু : ৬ থেকে ৫ মাস ১২০ মিলি., ৬ মাস থেকে ৫ বৎসর ২৪০ মিলি., ৬–১২ বৎসর ৪৮০ মিলি., দিনে দুবার ৫ দিন (দেড় মাস বয়সের নিচে দেয়া অনুচিত)
শিগেলা রক্ত আমাশয়	**কোট্রাইমোক্সাজোল** উপরোক্ত মাত্রায় ৫ দিন বা নালিডিক্সিক অ্যাসিড পূর্ণবয়স্ক : ১ গ্রাম ৬ ঘন্টা পর পর ৫–৭ দিন শিশু : প্রতি কেজি দৈহিক ওজনে ৫০ মিলি. ৪ মাত্রায় ভাগ করে (৬ ঘন্টা পর পর), ৫ দিন (তিন মাসের কম বয়সের শিশুকে দেয়া নিষেধ)

বিশেষ দ্রষ্টব্য : উপরোক্ত সব মাত্রাগুলো মুখে সেবনের জন্য।

উদরাময় ও খাদ্য গ্রহণ

স্বাস্থ্যকর খাবার স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে রান্না করে উদরাময়ে খাবার–দাবার চালিয়ে যেতে হবে। এজন্য অল্প অল্প করে বার বার সহজপাচ্য অথচ শক্তি উৎপন্নকারী খাবার গ্রহণ করা

উচিত। আঁশ (fiber) এবং অতিরিক্ত মশলাযুক্ত (Spicy) খাবার বর্জন করা প্রয়োজন। তবে খাবারে সামান্য সবজিজাত তেল যোগ করলে তার শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে। উদরাময়ে দেহে লবণ পানি ছাড়াও প্রচুর পটাশিয়াম হারায়। এজন্য খাদ্য তালিকায় পটাশিয়ামসমৃদ্ধ খাবার থাকা উচিত যথা : কলা, আম, পেঁপে, আনারস, ডাব, লেবু ইত্যাদি।

উদরাময় সরঞ্জাম (Kit)

এইডস বা অন্য কারণে যাদের বার বার উদরাময় হয় তাদের সবার বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের ব্যবহারের জন্য কতোগুলো প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম রাখলে ভালো হয় :

* সাবান : হাত ধোবার জন্য
* ব্লিচ : মলযুক্ত কাপড়–চোপড় পরিষ্কার করার জন্য
* অতিরিক্ত অন্তর্বাস ও বিছানার চাদর
* তুলা, টয়লেট পেপার বা ন্যাকড়া
* খাবার স্যালাইন
* পানি গরম করার ব্যবস্থা ও পাত্র
* পেট্রোলিয়াম জেলি বা অন্য বীজঘ্ন মলম

পায়ু এলাকা পরিষ্কার করার পর লাগালে বার বার মলত্যাগের ফলে প্রদাহ ও জ্বালা–পোড়া কমবে।

মনে রাখতে হবে

সুযোগ–সন্ধানী সংক্রমণ (Opportunistic infection)

* সিডি ৪ + সংখ্যা ৩০০ কোষ /μ লিটারের নিচে নেমে গেলে যক্ষ্মা এবং উপদংশ (সিফিলিস) রোগ পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে।
* সিডি ৪+ সংখ্যা ২০০ কোষ লিটার /μ লিটারের নিচে নেমে গেলে *Pneumocystis carinii*-ঘটিত ফুসফুসপ্রদাহ, মস্তিষ্কের টক্সোপ্লাজমাময়তা (cecrebral Toxoplasmosis) ছত্রাক সংক্রমণ (ক্রিপ্টোকক্কাসজনিত মস্তিষ্কাবরণী প্রদাহসহ) ঘটে।
* সিডি ৪ + সংখ্যা ১০০ কোষ μ লিটারের নিচে নেমে গেলে মাইকোব্যাক্টেরিয়াম এভিয়াম সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে
* সিডি ৪ + সংখ্যা ৫০ কোষ μ লিটারের নিচে নেমে গেলে সাইটোমেগালোভাইরাস ঘটিত অক্ষিপট প্রদাহ (retinitis) পরিপাকতন্ত্রের (Gastrointestinal) রোগ দেখা দিতে পারে।

এইচআইভি সংক্রমণে চর্ম সমস্যা

ক : সার্বিক চর্ম প্রদাহ

* চুলকানিযুক্ত চর্মের ফুসকুঁড়ি
* ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

Bangladesh Library Dhaka

খ :	* সংক্রমণ/অধ্যুষণ :
	* জীবাণুজাত
	* ছত্রাকজাত
	* ভাইরাসজাত
	* পরজীবীজাত
গ :	* চর্মের আব বা অর্বুদ
	* যথা : কেপোসিস সর্কোমা
	(এই বিরল চর্মের কর্কট সাধারণত এইডস রোগে পরিদৃষ্ট হয়।

দ্বাদশ অধ্যায়

এইডস সনাক্তকরণ

এইডস রোগী

সংজ্ঞা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী যদি ১২ বছরের উর্ধ্ববয়স্ক মহিলা বা পুরুষের রক্তে এইচআইভি প্রতিরক্ষিকা থাকে (HIV positive) এবং নিচের যে-কোনো দুই বা ততোধিক বৃহৎ লক্ষণ তথা কমপক্ষে একটি ক্ষুদ্র লক্ষণ উপস্থিত থাকে তবে নিরীক্ষণ (Surveillance)–এর খাতিরে তার এইডস আছে বলা যাবে –

বৃহৎ বা মুখ্য লক্ষণ

* ওজন হ্রাস : $\geq$ ১০% দেহের ওজন
* একমাসের চেয়ে বেশি স্থায়ী পুরানো উদরাময়
* একমাসের চেয়ে বেশি স্থায়ী জ্বর (একটানা বা বিরতিযুক্ত)

ক্ষুদ্র বা গৌণ লক্ষণ

* একমাসের চেয়ে বেশি স্থায়ী দীর্ঘদিনের কাশি
* সার্বিক চুলকানিযুক্ত চর্ম প্রদাহ (Generalized pruritic Dermatitis)
* হার্পিস জোস্টার রোগের ইতিহাস
* মুখ ও গলবিলের ক্যান্ডিডাময়তা
* পুরানো ক্রমবর্ধমান বা বিস্তৃত সাধারণ হার্পিস সংক্রমণ (Chronic progressive or disseminated herpes simplex infection)

সার্বিক কেপোসিস সার্কোমা (Caposis sarcoma) বা ক্রিপ্টোকক্কাসঘটিত মস্তিষ্কাবরণী প্রদাহ থাকলে এইডস সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।

পরীক্ষাগারে রোগ নির্ণয়

(ক) প্রতিরক্ষিকা বা অ্যান্টিবডি সনাক্তকরণ

এইচআইভি (HIV) ভাইরাস শনাক্ত করার চেয়ে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে এইচআইভি–এর বিরুদ্ধে যে প্রতিরক্ষিকা বা অ্যান্টিবডি তৈরি হয় তা সনাক্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ।

সিরোপজিটিভ

যে ব্যক্তির রক্তে এইচআইভি প্রতিরক্ষিকা বা অ্যান্টিবডি আছে তাকে এইচআইভি যুক্ত বা এইচআইভি পজিটিভ বা সিরোপজিটিভ (Seropositive) বলে। এ দিয়ে বুঝায় মহিলা বা

পুরুষটি এইচআইভি দিয়ে সংক্রমিত হয়েছে। রোগ নির্ণয়ের জন্য আজকাল সাধারণত দুটি পরীক্ষা করা হয় । যথা –

১। এলাইজা (ELISA)

ইমিউনোসরবেন্ট অ্যাসে বা এলাইজা দিয়ে এইচআইভি এনজাইম লিংকড প্রতিরক্ষিকা বা অ্যান্টিবডি সনাক্ত করা হয়। রক্তের নমুনার উপর এ পরীক্ষা করা হয়। ফলাফল হাঁ–বোধক হলে পরীক্ষা পুনরাবৃত্তি করতে হয়। দ্বিতীয় পরীক্ষায় সিদ্ধান্ত না নেয়া গেলে ওয়েস্টার্ন ব্লট (western blot) পরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

২। ওয়েস্টার্ন ব্লট

এটি হলো নিশ্চিতকরণ পরীক্ষা বা Confirmatory Test-এ পরীক্ষা দিয়ে ভ্রান্ত হাঁ–ধর্মী (False positive) ফলাফলকে বাতিল করে রোগ নির্ণয় নিশ্চিত করা যায়। তবে এ পরীক্ষা করা দুরূহ এবং এজন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত গবেষণাগার কর্মী প্রয়োজন।

(খ) ভাইরাস স্বতন্ত্রীকরণ (Virus isolation)

চাষ করা লসিকা কোষ (Cultured lymphocyte) থেকে এইচআইভি ভাইরাস আহরণ করা যায়। তবে এ পরীক্ষা খুবই ব্যয়বহুল এবং এর জন্য বিশেষ ধরনের গবেষণাগার প্রয়োজন।

(গ) এইচআইভি কিট (HIV kit)

বর্তমানে সস্তা এবং সহজলভ্য একধরনের রোগ নির্ণয়ের সরঞ্জাম (kit) বের হয়েছে যা দিয়ে খুব সহজেই এইচআইভি প্রতিরক্ষিকা বা অ্যান্টিবডি শনাক্ত করা যায় (PAT HIV DIP Stick)। তবে দ্রুত এইচআইভি পরীক্ষা (Rapid HIV test) অসুবিধা হলো রোগী হাঁ–বোধক ফলাফল শোনার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে পারেন ।

এইচআইভি সংক্রমণ নির্ণয়ের জন্য পরীক্ষা

(ক) প্রতিরক্ষিকা বা অ্যান্টিবডি পরীক্ষা

১। এনজাইম ইমিউনো অ্যাসে (EIA)

২। এনজাইম লিংকড ইমিউনোসরবেন্ট অ্যাসে (ELLA)

৩। রেডিও ইমিউনো প্রিসিপিটেশন অ্যাসে (RIPA)

৪। ওয়েস্টার্ন ব্লট অ্যাসে

(খ) এইচআইভি উপখণ্ডের (Subparticle) জন্য পরীক্ষা

১। এইচআইভি পি–২৪ (P-24 antigen) পরীক্ষা

গ) পূর্ণ এইচআইভি ভাইরাসের জন্য পরীক্ষা

১। এইচআইভি চাষ (পি –২৪ অ্যান্টিজেন বা রিভার্স ট্রান্সক্রিপ্টেজ সনাক্ত করার জন্য)

ঘ। এইচআইভি নিউক্লিয়িক অ্যাসিডের অংশের জন্য পরীক্ষা

এইচআইভি–তে ডি.এন.এ. বা আর.এন.এ.–এর জিন সম্প্রসারণের (Gene amplification) জন্য পলিমারেজ শৃঙ্খল প্রতিক্রিয়া (polymerase chain reaction-PCR)

এইচআইভি প্রতিরক্ষিকার সাম্প্রতিক পরীক্ষা

১. এইচআইভি পরীক্ষা (আমেরিকা)
২. হিমোগ্লুটিনেশন পরীক্ষা (ব্রাজিল)
৩. মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি পরীক্ষা (কানাডা)
৪. ল্যাটেক্স অ্যাগ্লুটিনেশন পরীক্ষা (আমেরিকা)
৫. কারপা কোষ পরীক্ষা (জাপান)
৬. প্যাথ এইচআইভি ডিপস্টিক (PATH FIV DIPstick) উন্নয়নশীল দেশে ব্যবহারের জন্য)

এখানে উল্লেখ্য যে, সিডি–৪ কোষযুক্ত লসিকা কোষ চাষ (Lymphocyte culture) করে এইচআইভি জন্মানো ও শনাক্তকরণ সম্ভব। আজকাল এক্ষেত্রে টি–৪ কোষ ব্যবহৃত হচ্ছে।

এইচআইভি প্রতিরক্ষিকা পরীক্ষা এবং তার তাৎপর্য

এক্ষেত্রে এইচআইভি পরীক্ষা করে দেখা হয় ব্যক্তির দেহে এইচআইভি–এর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষিকা বা অ্যান্টিবডি আছে কি না। যদি থাকে অর্থাৎ হাঁ–বোধক হয় তাহলে বোঝাবে লোকটি এইচআইভি সংক্রমিত হয়েছে। অবশ্য না–বোধক হলেই লোকটি যে এইচআইভি সংক্রমণ মুক্ত তা বলা যাবে না। কেননা সংক্রমণ এরপর হাঁ–বোধক ফলাফল পেতে প্রায় ছয় মাস সময় দরকার হয়। কখনো কখনো আবার ভ্রান্ত ফলাফল অর্থাৎ ভ্রান্ত হাঁ–বোধক (False positive) ফলাফল পাওয়া যায়। সুতরাং নিশ্চিত হবার জন্য পরীক্ষাটি পুনরায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত।

হ্যাঁ–বোধক ফলাফল পাওয়া মানেই এই নয় যে ব্যক্তিটির এইডস হবেই। বেশ কিছু লোকের কোনো উপসর্গ হয় না বা হলেও খুব মারাত্মক হয় না। তবে উপসর্গ থাকুক বা না থাকুক যেহেতু লোকটি সংক্রমিত হয়েছে সে অপরকেও সংক্রমিত করতে পারবে।

শিশুদের এইডস নির্ণয়

শিশুদের ক্ষেত্রে এইডস নির্ণয় করার জন্য কমপক্ষে দুটি মুখ্য লক্ষণ এবং একটি গৌণ লক্ষণ তার দেহে উপস্থিত থাকা উচিত।

মুখ্য লক্ষণ

* ওজন হ্রাস বা ধীরগতিতে দেহ বৃদ্ধি
* একমাসের বেশি স্থায়ী উদরাময়
* একমাসের বেশি স্থায়ী জ্বর

গৌণ লক্ষণ

* সার্বিক লসিকা গ্রন্থি বৃদ্ধি
* মুখ ও গলবিলে ছত্রাক (thrush) অধ্যুষণ
* বারংবার সাধারণ রোগের সংক্রমণ

* স্থায়ী কাশি
* সার্বিক চর্মরোগ

বহু শিশুর এসব লক্ষণ দেখা যেতে পারে তবে পিতা বা মাতা বা উভয়ে যদি এইচআইভি আক্রান্ত হয় তবে রোগ নির্ণয় সঠিক বলে বিবেচনা করতে হবে।

গবেষণাগারে এইচআইভি পরীক্ষা না করেও এইডস সনাক্তকরণ

আটলান্টার সেন্টার অব ডিজিজ কন্ট্রোল এন্ড প্রিভেনশন (Centre of Disease Control and Prevention)-এর মতে নিম্নোক্ত রোগ পরিস্থিতিতে গবেষণাগারে পরীক্ষা না করেও এইডস-এর উপস্থিতি সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া যায় :

* খাদ্যনল, শ্বাসনল ও তার মুখ্য শাখা (Bronchi) বা ফুসফুসের ক্যান্ডিডাময়তা (Candidiasis)
* ফুসফুসের বাইরে ক্রিপ্টোকক্কাসময়তা (Cryptococcosis)
* ক্রিপ্টোস্পোরজনিত উদরাময়
* শুধু যকৃত, প্লীহা বা লসিকা গ্রন্থির সাইটোমেগালো ভাইরাস সংক্রমণ
* সাধারণ হার্পিস (Herpes simplex) জাত চর্ম ক্ষত
* ৬০ বছরের চেয়ে কম বয়স্ক ব্যক্তির কেপোসিস সার্কোমা
* ৬০ বছর চেয়ে কম বয়স্ক ব্যক্তির মস্তিষ্কে লিম্ফোমা
* লসিকাজাত ফুসফুস প্রদাহ (Lymphoid interstitial pneumonitis.
* ছড়ানো মাইকোব্যক্টেরিয়াম এভিয়াম জটিলতা সংক্রমণ (Dissseminated *Mycobacterium avium* complex infection)
* Pneumocystis Carenii ঘটিত ফুসফুস প্রদাহ
* প্রগোসিভ মাল্টিফোকাল লিউকোএনসেফালোপ্যাথি (Papova বা Jc ভাইরাস) (progressive multifocal leucoencephalopathy) বা পার্ভোভাইরাস মস্তিষ্ক প্রদাহ (Parvovirus encephalitis)
* টক্সোপ্লাজমাজনিত মস্তিষ্ক প্রদাহ (Toxoplasmic encephalitis)

সিডি ৪+ (CD_4+) লসিকা কোষের সংখ্যা হ্রাস রীতি

এইচআইভি সংক্রমণে সিডি-৪ লসিকা কোষের সংখ্যা হ্রাস ৩টি পর্যায়ে হয় তবে রোগীভেদে হ্রাস প্রাপ্তির হারে তারতম্য ঘটে।

১। সংক্রমণের কয়েক মাসের মাঝে সঞ্চালনশীল সিডি ৪ কোষ সংখ্যা দ্রুত ৪০ থেকে ৫০% হ্রাস পায় এবং ১০০০ থেকে ১৩০০/ঘন লিটার হতে ৬০০ থেকে ৮০০/ঘন লিটার-এ পরিণত হয়।

২। অতঃপর দীর্ঘদিন ধরে ধীরগতিতে সংখ্যা কমতে থাকে।

৩। এইডস বিকাশ লাভের ১-২ বৎসর পূর্বে আবার দ্রুত সংখ্যা কমে যায়।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, সিডি ৪ কোষ প্রতি ঘন মিলিমিটার ২০০-এর নিচে হ্রাস পাওয়াকেই এইডস নামে অভিহিত করা যায়।

হার্পিসজোস্টার ভাইরাস দিয়ে
সৃষ্ট ফুস্কুড়ি

মুখের ছত্রাক অধ্যুষণ

মুখের রোমশ শ্বেতী

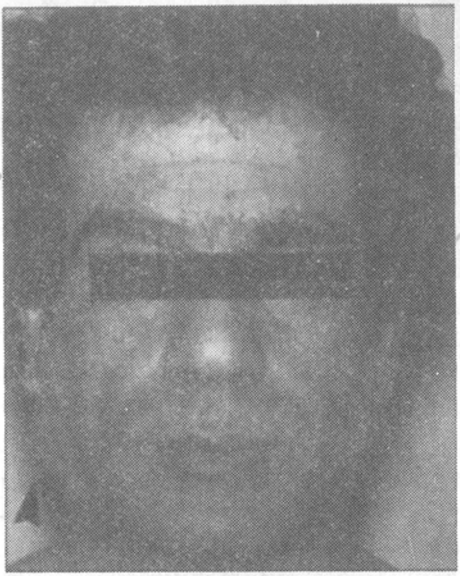

স্থায়ী সার্বিক লসিকা গ্রন্থি বৃদ্ধি

হার্পিস সিমপ্লেক্স ভাইরাস দিয়ে
সৃষ্ট পায়ুবৃত্তিক ক্ষত

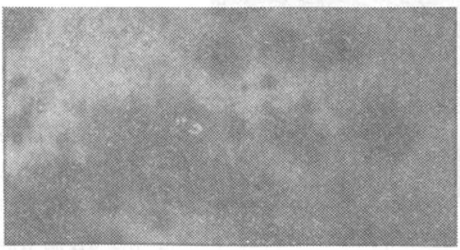

নিতম্ব এলাকায় হার্পিস সিমনপ্লেক্স
ভাইরাস সৃষ্ট ক্ষত

> এইচআইভি পরীক্ষা ও তার ফলাফলের গোপনীয়তা অবশ্য রক্ষা করতে হবে তা না হলে আক্রান্ত ব্যক্তি সমাজ থেকে পরিত্যক্ত হবার ভয়ে এই পরীক্ষা করাবে না এবং চিকিৎসা গ্রহণ করতেও নিরুৎসাহিত বোধ করবে।

গবেষণাগার প্রাপ্ত অনির্দিষ্ট তথ্য (Non-specific laboratory findings)

গবেষণাগার থেকে আরো কিছু সাহায্যকারী তথ্য পাওয়া যেতে পারে, যার সাহায্যে এইচআইভি সংক্রমণ হয়েছে কি–না তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা না গেলেও এইচআইভি সংক্রমণ হলে এসব লক্ষণ সাধারণভাবে পাওয়া যায়। যথা —

* রক্তাল্পতা (Anaemia)
* শ্বেত কণিকা (বিশেষত লসিকা কোষ) হ্রাস
* কোলেস্টেরল হ্রাস
* অনুচক্রিকা হ্রাস (Thrombocytopenia)
* রক্তে গামা গ্লোবিউলিন বৃদ্ধি
* রোগের প্রগতি বার্তা (Prognostic information)
* টি– লসিকা কোষের অস্বাভাবিকতা
* সাহায্যকারী সিডি৪ লসিকা কোষের (Helper CD4 lymphocyte) ক্রমবর্ধমান হ্রাস

রোগ প্রগতি নির্ণয়

CD4 লসিকাকোষ গণনা রোগের প্রগতি নির্ণয়ের জন্য বহুল ব্যবহৃত প্রথা। গণনা যতোই কমে যায় সুযোগ–সন্ধানী সংক্রমণের আশঙ্কা ততই বেড়ে যায়। একজন সুস্থ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাধারী স্বাভাবিক লোকের দেহে প্রতি ঘন লিটার রক্তে ৯৫০টির বেশি (950CD4 cer/μL) CD4 কোষ থাকে। এইডস বিকাশ লাভ করলে সিডি–৪ কোষ সংখ্যা ২০০–এর নিচে নেমে আসে। এইচআইভি সংক্রমিত দেহে সিডি–৪ কোষ ২০০–এর নিচে নেমে যাওয়াকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইডস–এর পরিচায়ক হিসেবে গণ্য করা হয়।

ভাইরাসবিরোধী ওষুধ কখন দিতে হবে?

ভাইরাসবিরোধী ওষুধ ব্যবহার করা উচিত কি–না বিবেচনার জন্য সিডি ৪ কোষ ৫০০–তে নেমে এলে প্রতি ৩ মাস অন্তর তা পুনঃগণনা করতে হবে এবং ২০০–এর নিচে নেমে এলে ভাইরাসবিরোধী ওষুধ দিতে হবে।

রোগের প্রগতি নির্ণয়ের জন্য কোনো কোনো গবেষণায় দেখা গেছে সিডি–৪ কোষ পুর্ণগণনা করার চেয়ে শতকরা হার নির্ণয় করা আরো বেশি বিশ্বাসযোগ্য। সিডি–৪ লসিকা কোষ ২০%–এর নিচে নেমে গেলে দ্রুত এইডস হবার আশঙ্কা থাকে।

পরামর্শদান (Counselling)

আগেই বলা হয়েছে এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির প্রতি অবহেলা, অবজ্ঞা, ঘৃণা, বয়কট ইত্যাদি সামাজিক সমস্যার কথা চিন্তা করে গবেষণাগারে সনাক্তকরণ কার্যক্রম গোপনে করা উচিত।

পরামর্শদানের সময় এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিকে সেসব ব্যাপারে পরামর্শ দেয়া আবশ্যক, তা হলো —

* কি করে তার রোগ বিস্তার হ্রাস ও রোধ করতে পারে,
* পরিবার-পরিকল্পনার কোন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে,
* কিভাবে যৌন জীবনযাপন করতে পারে ও
* কি প্রকারে বিভিন্ন যৌন সমস্যার মোকাবেলা করতে পারে।

এইডস রোগে যারা মৃত্যুশয্যায় ও যারা তাদের পরিচর্যা করে তাদের সবার ক্ষেত্রেই পরামর্শ আবশ্যক। এইচআইভি রোগীর যৌনসঙ্গী ও পারিবারিক সদস্যদেরও পরামর্শ দেয়া একান্তভাবে প্রয়োজন।

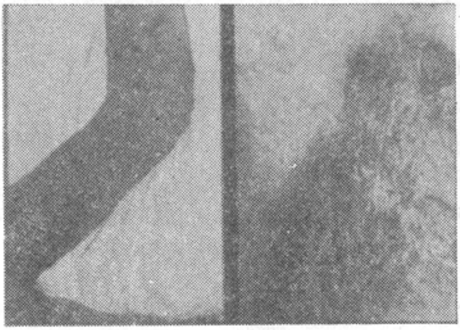

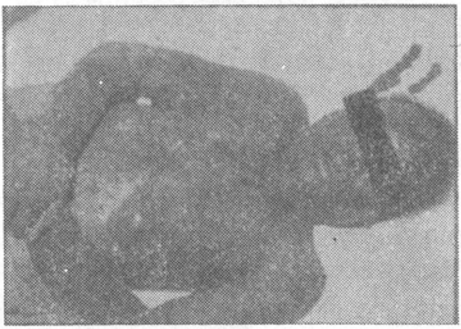

কেপোসিস সার্কোমা : ক্ষত লাল, বাদামী বা বেগুনী থাকে (ত্বক ছাড়াও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি (যথা: মুখ), ফুসফুস এবং অন্ত্রে দেখা যায়।

রোগী যদি তার আপনজনের সাথে একত্রে পরামর্শ গ্রহণ করে তবে তার জীবন-যাপনের বহু সমস্যাই সহজ হয়ে যাবে। এইচআইভি আক্রান্ত বা এইডস রোগীদের সর্বাধিক ভয় থাকে সামাজিক প্রত্যাখানের। পরিবার-পরিজন তাকে ভয়ে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিবে বা

সমাজে সে একঘরে হয়ে যাবে ভেবে অনেকে রোগের কথা নিজের আপনজনের কাছেও গোপন রাখে এবং কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা চিকিৎসা করায় না। তারা মারাত্মক দুশ্চিন্তা ও অসহায়তা বোধ করে এবং জীবন শেষে হবার আগেই নিজেকে মৃত ব্যক্তি হিসেবে চিন্তা করে। পরামর্শকরা তাদের হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করবেন যাতে জীবনের প্রতি তারা বাস্তব মনোভাব (Positive attitude) গ্রহণ করতে পারে।

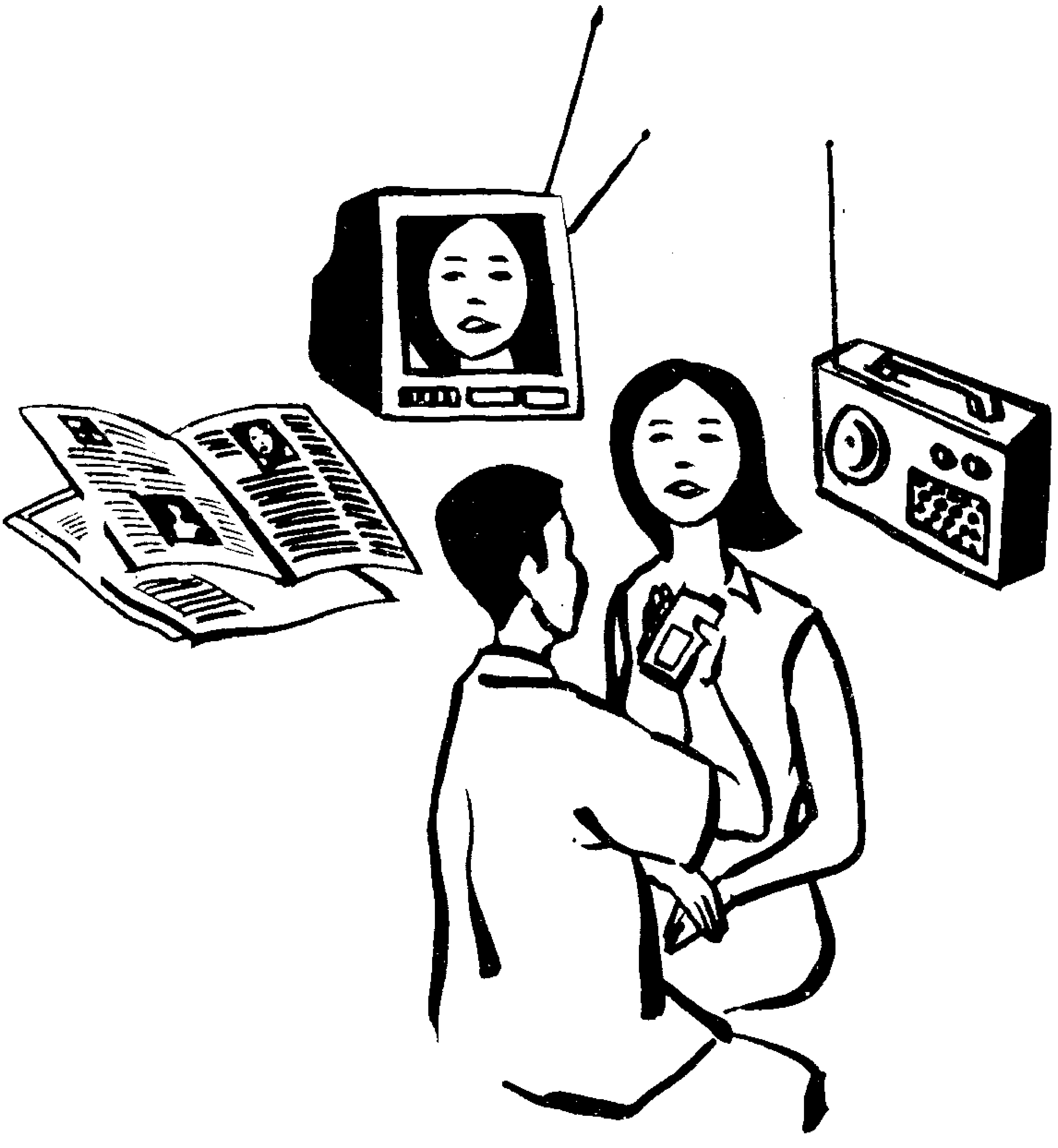

এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত ব্যাপক

স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকদের উচিত জনসাধারণকে এইডস সম্পর্কে সচেতন করা এবং একইসাথে তাদের মন থেকে এই রোগের ব্যাপারে অমূলক ভয় দূর করা। এজন্য রেডিও, টেলিভিশন, বিলবোর্ড, সিনেমা স্লাইডে প্রচার তথা মেডিকেল কলেজে শিক্ষা ছাড়াও বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, কল-কারখানা এবং বিভিন্ন সামরিক ও বেসামরিক অফিস-আদালতে মাঝে মাঝে এইডস সম্পর্কিত আলোচনা বা সেমিনার হওয়া উচিত, যাতে লোকে সহজেই এ রোগ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে। শুধু তাই নয় পতিতালয়েও সেমিনার তথা কর্মশালা করতে হবে এবং বিনামূল্যে কনডম ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে।

এইডস-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও পার্থক্যকরণভিত্তিক রোগ নির্ণয়

দেহের অংশ	লক্ষণ ও উপসর্গ	সম্ভাব্য কারণ
সাধারণ	জ্বর, ওজন হ্রাস	এইচআইভি সংক্রমণ, সুযোগ-সন্ধানী সংক্রমণ, কর্কট রোগ
চর্ম	ফুসকুঁড়ি, শুকনো চর্ম, লাল আব, ক্ষুদ্র ফোস্কা, ছাল ওঠা	তৈলাক্ত গ্রন্থিস্রাব (সেবোরিয়া) কেপোসিস সার্কোমা, মোলাস্কাম কন্টাজিওসাম, হার্পিস জোস্টার, গুটিকা প্রদাহ (Folliculitis)
লসিকা	গলা, বগল ও কনুই (ইপিট্রক্লিয়ার) এর লসিকা গ্রন্থি বৃদ্ধি	এইচআইভি সংক্রমণ, লসিকা অর্বুদ, ম-এ-আই সংক্রমণ, সাইটোমেগালো ভাইরাস সংক্রমণ, কেপোসিস সার্কোমা, যক্ষ্মা
চক্ষু	পরিধি এলাকার (Periphera field) দৃষ্টিক্ষীণতা তুলা দাগ (cottonwool spot), রেটিনা প্রদাহ	এইচআইভি সংক্রমণ, সাইটোমেগালো ভাইরাস সংক্রমণ, টক্সোপ্লাজমোসিস
মুখগহ্বর	সাদা দাগ (white plaque) ঘা, বেগুনি ক্ষত, দন্ত পার্শ্বিক প্রদাহ (Periodentitis)	ক্যান্ডিডাময়তা মুখের রোমশ ঝিল্লি শ্বেতী (Hairy leukoplakia), কেপোসিস সার্কোমা, এপথাস ঘা, সাধারণ হার্পিস
হৃৎপিণ্ড	তৃতীয় হৃদস্পন্দন, হৃদআবরণী ঘর্ষণ, হৃৎপিণ্ড বৃদ্ধি	হৃদপেশী বৈকল্য, সাইটোমেগালো ভাইরাস সংক্রমণ, হৃদআবরণী প্রদাহ
ফুসফুস	কাশি, বুদবুদজাতীয় শ্বাস শব্দ, বাঁশিজাতীয় শ্বাস শব্দ অক্সিজেনস্বল্পতা	জীবাণুজাত ফুসফুস প্রদাহ, ছত্রাক সংক্রমণ, যক্ষ্মা, কেপোসিস সার্কোমা, সাইটোমেগালো ভাইরাসজাত ফুসফুস প্রদাহ
পরিপাকতন্ত্র	যকৃৎ বৃদ্ধি, প্লীহা বৃদ্ধি	যকৃৎ প্রদাহ, সাইটোমেগালো ভাইরাস সংক্রমণ, যক্ষ্মা টক্সোপ্লাজমোসিস, এইচআইভি সংক্রমণ

দেহের অংশ	লক্ষণ ও উপসর্গ	সম্ভাব্য কারণ
জননেন্দ্রিয়, মূত্রতন্ত্র ও পায়ু পার্শ্বস্থ এলাকা	ঘা, উপদংশ ক্ষত নিঃসরণ, ফাটল, আঁচিল	সাধারণ হার্পিস, উপদংশ, উপদংশসদৃশ ক্ষত, প্রমেহ, ক্যান্ডিডাময়তা, ক্ল্যামাইডোময়তা, কেপোসিস সার্কোমা, স্কোয়ামাস কোষ কর্কট, ট্রাইকোমনিয়াময়তা।
স্নায়ুতন্ত্র	কেন্দ্রীয় চলক (Motor) ও সংজ্ঞাবাহী (sensony) স্নায়ুর কর্মক্ষমতা হ্রাস, খিঁচুনিগ্রস্ততা, সমন্বয়হীনতা, স্মৃতিবিভ্রম, একাগ্রতার অভাব, বোধগম্যতার অস্বাভাবিকতা	কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের টক্সোপ্লাজমোসিস, এইচআইভি সংক্রমণ, লসিকা অর্বুদ, ওষুধ সেবন।

BANSDOC Library
Accession No. 18029

ত্রয়োদশ অধ্যায়

গবেষণাগার ও এইচআইভি সংক্রমণ

যেসব গবেষণাগারে এইচআইভি (HIV) বা এইচআইভিযুক্ত বস্তু নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনা হয় সেখানকার কর্মচারীরা সবসময়ই এক ভয়ঙ্কর ঝুঁকির মধ্যে কাজ করেন।

যে-কোনো গবেষণাগারেই এইডস সংক্রমণের মারাত্মক ঝুঁকি থাকে। গবেষণাগারে কর্মী বা যেসব কাজ দিয়ে এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকিগ্রস্ত হয়ে পড়েন তার বিবরণ নিচের ছকে দেয়া হলো —

গবেষণাগারে এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকিযুক্ত ক্রিয়াকলাপ

ক্রিয়াকলাপ	যে ব্যক্তির ঝুঁকি আছে	সংক্রমণের পদ্ধতি
রক্তের নমুনা সংগ্রহ	রোগী	দূষিত সূঁচ, স্বাস্থ্যকর্মীর দূষিত হাত বা দস্তানা
	স্বাস্থ্যকর্মী	সূঁচ বা ভাঙা নমুনা পাত্র দিয়ে ত্বক বিদারণ, হাতের সাথে রক্তের সংস্পর্শ
নমুনা স্থানান্তরণ (গবেষণাগারের ভিতরে)	গবেষণাগার কর্মী পরিবহণ কর্মী	পাত্রের দূষিত বহির্ভাগ, ভাঙা পাত্র, নমুনা ঢেলে বা ছিটকে পড়া
এইচআইভির রক্তমস্তুবিদ্যা ও ভাইরাসবিদ্যা সম্পর্কীয় পরীক্ষা	গবেষণাগার কর্মী	ত্বক-বিদারণজনিত ক্ষত বা ত্বক ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সংস্পর্শ, নমুনাপাত্রের দূষিত বহির্ভাগ, দূষিত কর্মস্থান, ঢেলে বা ছিটকে পড়া নমুনা, ভাঙা নমুনা পাত্র, ছিদ্রযুক্ত দস্তানা
সাফাই ও রক্ষণাবেক্ষণ	গবেষণাগার কর্মী ঝাড়ুদার	ত্বক বিদারণজনিত ক্ষত বা সংস্পর্শজনিত সংক্রমণ, ঢেলে পড়া নমুনা, দূষিত কর্মস্থান

ক্রিয়াকলাপ	যে ব্যক্তির ঝুঁকি আছে	সংক্রমণের পদ্ধতি
আবর্জনা অপসারণ	গবেষণাগার কর্মী, ঝাড়ুদার পরিবহন কর্মী জনসাধারণ	দূষিত আবর্জনার সংস্পর্শে ফুটে যাওয়া এবং কাটা ক্ষত
নমুনা পরিবহন (অন্য কেন্দ্রে)	পরিবহন কর্মী, ডাককর্মী, জনসাধারণ	ভাঙা এবং চোঁয়াতে থাকা নমুনা পাত্র এবং প্যাকেজ

তরল ব্লিচ ও অ–ডি জ্যাভেল প্রভৃতি সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট দ্রবণগুলো বীজবারক হিসেবে চমৎকার।

গবেষণাগারে কর্মরত একজন স্বাস্থ্যকর্মী

মনে রাখতে হবে

নির্বীজন ও সংক্রমণমোচন পদ্ধতি

* সুঁচ ও সিরিঞ্জসহ পুনঃব্যবহার্য যন্ত্রপাতি ১২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাষ্পীয় তাপে অটোক্লেভ দিয়ে নির্বীজন করাই সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হিসেবে বিবেচিত।
* যেসব যন্ত্রপাতি উষ্ণতা সহ্য করতে পারে তা ১৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস শুষ্ক তাপ দিয়ে কমপক্ষে দু ঘন্টা রাখলে নির্বীজন সম্পন্ন হয়। প্লাস্টিক দ্রব্য এই উষ্ণতা সহ্য করতে পারবে না।

* কোনো কিছু না পাওয়া গেলে ২০ থেকে ৩০ মিনিটে যন্ত্রপাতি পানিতে অবিরাম ফোটানো নির্বীজনের সবচেয়ে সহজ ও বিশ্বাসযোগ্য উপায়।
* তরল ব্লিচ, অ-ডি জ্যাভেল প্রভৃতি সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট দ্রবণে ত্বকবিদারী ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ডুবিয়ে এইচআইভি-কে নিষ্ক্রিয় করা যায়। তবে ডোবানোর আগে স্থূল সংক্রমণ দোষ অপসারণের জন্য যন্ত্রপাতি ভালোভাবে পরিষ্কার করে শুকিয়ে নেয়া উচিত। ভেজা যন্ত্রপাতি বারবার নিমজ্জিত করলে দ্রবণ লঘু হয়ে তার কার্যকারিতা হারাবে।

সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট দ্রবণসমূহ (দ্রবণের গাঢ়তা কোনো কোনো দেশে ক্লোরোমেট্রিক ডিগ্রিতে প্রকাশ করা হয়।) :

* ১% দ্রবণে প্রতি লিটারে ১০ গ্রাম ক্লোরিন থাকে
* গৃহস্থালীর তরল ব্লিচে সাধারণত ৫% ক্লোরিন থাকে
* অ–ডি জ্যাভেলে (১৫ ডিগ্রি ক্লোরেম) মোটামুটি ৫% ক্লোরিন থাকে
* অ–ডি জ্যাভেলে (৪৮ ডিগ্রি ক্লোরেম) মোটামুটি ১৫% ক্লেরিন থাকে।
* ক্লোরিনযুক্ত চুনে মোটামুটি ৩৫% ক্লেরিন থাকে।

গবেষণাগারে পালনীয় সতর্কতা

সাধারণভাবে সংক্রামক রক্ত ও অন্যান্য দেহরসের সঙ্গে আমাদের হাত, চোখ, নাক ও মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সংস্পর্শ থেকেই প্রাথমিকভাবে এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে। সুতরাং এইডস বিষয়ক গবেষণাগারে নিযুক্ত কর্মচারীদের নিজেদের সুরক্ষার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য এইচআইভিযুক্ত বস্তু নিয়ে কাজ হয় এমন গবেষণাগারে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত —

১। কর্মীরা যে পেশা সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে সচেতন ও সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত সে বিষয়ে তত্ত্বাবধায়কদের সুনিশ্চিত হওয়া উচিত।

২। গবেষণারের কর্মীদের সূচনাতেই একবার রোগ পরীক্ষা করা উচিত এবং রক্তমস্তুর বা সিরামের একটি মূল নমুনা সংগ্রহ করে ভবিষ্যতের প্রসঙ্গের জন্য হিমায়িত অবস্থায় সঞ্চিত রাখা উচিত। সকল লব্ধ তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা কর্তব্য।

৩। গবেষণাগারে কোনো কর্মী সূঁচ প্রয়োগ বা ইনজেকশনের মাধ্যমে বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির মাধ্যমে রক্ত, অন্যান্য দেহরস বা ভাইরাস কালচার সামগ্রীর সংস্পর্শে এলে সেই আকর বস্তুতে ভাইরাস এবং বা তার অ্যান্টিবডি আছে কি–না পরীক্ষা করে দেখা উচিত। এইচআইভি অ্যান্টিবডি, ভাইরাস বা অ্যান্টিজেনের অস্তিত্ব ধরা পড়লে বা পরীক্ষার জন্য বস্তুটিকে পাওয়া না গেলে কর্মীর রক্ত পরীক্ষা করা উচিত। ঐ সংস্পর্শ ঘটার ১২ সপ্তাহ বা তিন মাসের মধ্যে কোনো তীব্র জ্বরজনিত অসুস্থতা দেখা দিলে সে কথা জানাতে হবে এবং তাকে যথাযথ পরীক্ষা করতে হবে। বিশেষত জ্বরের সাথে ত্বকে লালচে ফুসকুঁড়ি এবং লসিকা গ্রন্থি স্ফীত (লিমফোএডেনোপ্যাথি) থাকলে তা এইচআইভি সংক্রমণের ইঙ্গিত দেয়। তাৎক্ষণিকভাবে রক্তে দোষ না পাওয়া গেলেও কর্মীকে যথাক্রমে ৬ সপ্তাহ, তিন মাস এবং ছয় মাস পর আবার পরীক্ষা করা উচিত।

৪। গবেষণাগারের সকল কর্মীর অসুস্থতা ও অনুপস্থিতির নথিপত্র রাখা উচিত। তাদের এইচআইভি পরীক্ষার ফলাফল গোপন রাখা কর্তব্য।

৫। সংক্রামক বস্তু নিয়ে নাড়াচাড়া করার সময়ে রক্ত বা অন্যান্য দেহরসের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা থাকলে উত্তমমানের দস্তনা পরতে হবে। ভিনাইল বা ল্যাটেক্সনির্মিত দস্তানা এজন্য উপযুক্ত। প্রয়োজনে প্রথমে ০.১% ক্লোরিনযুক্ত হাইপোক্লোরাইট দিয়ে এবং পরে সাবান ও পানি দিয়ে দস্তানা পরা হাত ধুয়ে তা খুলে রেখে শুকিয়ে পুনঃব্যবহার করা যেতে পারে।

৬। দূষিত হয়েছে মনে হলেই দস্তানাগুলো বাতিল করে হাত ধুয়ে নতুন দস্তানা পরতে হবে।

৭। দস্তানা পরা হাতে চোখ, নাক বা দেহের অন্যান্য অনাবৃত ঝিল্লি বা ত্বক স্পর্শ করা নিষেধ।

৮। দস্তানা পরে কাজের জায়গা ছেড়ে যাওয়া এবং ঘুরে বেড়ানো অনুচিত।

৯। কাজ শেষ হলে দস্তানা খুলে অবিলম্বে সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে।

১০। গবেষণাগারে থাকাকালীন গাউন, মুখোশ বা এইডস শিল্ড (AIDS shield) অর্থাৎ ইউনিফর্ম পরে থাকতে হবে এবং যাওয়ার আগেই এই সুরক্ষাদায়ক পরিচ্ছদ খুলে রাখতে হবে।

১১। সম্ভাব্য এইচআইভি সংক্রমিত বস্তু নিয়ে কাজ করার সময় দরজা বন্ধ রাখতে হবে এবং বাইরে, **প্রবেশ নিষেধ**, লিখে রাখা ভালো।

১২। গবেষণাগারকে পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন ও বহিরাগত বস্তু এবং যন্ত্রপাতি থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

১৩। দিবসের কর্ম সমাপ্তিতে কাজের জায়গা ০.১% ক্লোরিন দিয়ে সংক্রমণমুক্ত করতে হবে।

১৪। যথাসম্ভব সূঁচ ও অন্যান্য তীক্ষ্ণ যন্ত্রপাতির ব্যবহার এড়িয়ে চলতে হবে এবং ব্যবহৃত সূঁচ, সিরিঞ্জ ও অন্যান্য তীক্ষ্ণ যন্ত্রপাতি একটি বিদারণ নিরোধক পাত্রে রাখতে হবে।

১৫। মুখ দিয়ে পিপেটে তরল বস্তু টানা নিষেধ।

১৬। গবেষণাগারে খাবার জিনিস বা প্রসাধন দ্রব্য রাখা নিষেধ।

১৭। গবেষণাগারে কীট–পতঙ্গ বা ইঁদুর ইত্যাদি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

১৮। সূঁচ–সিরিঞ্জসহ পুনঃব্যবহার্য ডাক্তারী যন্ত্রপাতি অটোক্লেভে ১২১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে (২৫০ ডিগ্রি ফারেনহাইট) বাষ্পীয় তাপে নির্বীজন করতে হবে। অটোক্লেভ না পাওয়া গেলে প্রেসার কুকারে কমপক্ষে ২ মিনিট বাষ্পীয় তাপে তা উত্তপ্ত করা যেতে পারে।

প্লাস্টিক সরঞ্জাম ছাড়া যেসব যন্ত্রপাতি উষ্ণতা সহ্য করতে পারে তা ১৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা ৩৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট শুষ্ক তাপ দিয়ে সন্তোষজনকভাবে নির্বীজন করা চলে। আর এগুলো সম্ভব না হলে এইচআইভিসহ অধিকাংশ রোগজীবাণু নিষ্ক্রিয় করতে ২০ থেকে ৩০ মিনিট পানিতে যন্ত্রপাতি অবিরাম ফেটাতে হবে। এছাড়া ০.১% ক্লোরিন (প্রয়োজনে ১%) বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা চলে তবে সূঁচ ও সিরিঞ্জের জন্য রাসায়নিক বীজবারক ব্যবহার করা নিষেধ।

অন্যান্য রাসায়নিক বীজবারক

বীজকারক	প্রয়োগ পদ্ধতি
* ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইট	১.৪ গ্রাম শুষ্ক রাসায়নিক দ্রব্য ১ লিটার পানিতে দ্রবীভূত করলে ০.১% ক্লোরিনের মতো দ্রবণ মেলে।
* সোডিয়াম ডাইক্লোরো আইসোসায়নিউরেট	১.৭ গ্রাম ১ লিটার পানিতে দ্রবীভূত করলে ০.১% ক্লোরিন পাওয়া যায়।
* ক্লোরামিন	ক্লোরামিন চূর্ণ বা বড়ির আকারে পাওয়া যায়।
* ইথানল এবং প্রোপ্যালন	ইথাইল অ্যালকোহল এবং আইসোপ্রোপিল অ্যালকোহল নমুনাপাত্রের বহির্গাত্র এবং বেথিডর উপরভাগ পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
* পভিডোন আয়োডিন	
* ফর্মালিন	ব্যবহার সীমিত। এতে ৩৫ থেকে ৪০% ফরমালডিহাইড, ১০% মিথানল এবং পানি থাকে।
* গ্লুটারাল (গ্লুটারালডিহাইড)	সাধারণত ২% দ্রবণ হিসেবে পাওয়া যায়। সক্রিয় দ্রবণে ডুবালে ৩০ মিনিটের কম সময়ে বিভাজনরহিত (vegetative) ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক ও ভাইরাসসমূহের বিনাশ ঘটায়।

চতুর্দশ অধ্যায়

এইডস নিয়ন্ত্রণ

এইডস নিয়ন্ত্রণের জন্য চারটি মৌলিক পদ্ধতি রয়েছে। এগুলো হচ্ছে—

১। প্রতিরোধ
   ক) স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে
   খ) রক্তজাত এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধ
২। রেট্রোভাইরাসবিরোধী চিকিৎসা
৩। সুনির্দিষ্ট সাবধানতা ব্যবস্থা (Prophylaxis)
৪। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা

স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিরোধ

এইডস-এর প্রতিষেধক টিকা (vaccine) বা চিকিৎসা বের না হওয়া পর্যন্ত জীবন বাঁচানোর জন্য একটি মাত্র পথ খোলা আছে তা হলো যথাযথ স্বাস্থ্য শিক্ষা, যথা কনডম ব্যবহার, বিবাহ ছাড়া যৌনসঙ্গম না করা, ইত্যাদি। অবশ্য কনডম ব্যবহার করলেই পূর্ণ নিরাপত্তা পাওয়া যাবে একথা সত্য নয়। একজনের দাড়ি কামাবার ব্লেড, টুথব্রাশ ইত্যাদি অন্যের ব্যবহার করা উচিত নয়। যারা শিরার মাধ্যমে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে তাদের জানাতে হবে ভাগাভাগি করে একই সূঁচ এবং সিরিঞ্জ একাজে ব্যবহার করা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। যেসব মহিলার এইডস আছে বা এইচআইভি দিয়ে সংক্রমিত তাদের গর্ভবতী হওয়া উচিত নয় কেননা তা গর্ভস্থ শিশু বা নবজাতকের দেহে সঞ্চারিত হবে। প্রতিরক্ষাবিষয়ক শিক্ষা সরঞ্জাম ও উপদেশ জনসাধারণের মাঝে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছড়াতে হবে। কারো এইচআইভি সক্রমণ হয়েছে সন্দেহ হলে তাকে এবং তার যৌন সঙ্গীদের খুঁজে বের করে এইচআইভি পরীক্ষা করতে হবে।

এইডসবিষয়ক স্বাস্থ্য শিক্ষা হতে হবে নিম্নরূপ ---

(১) **জনসাধারণের জন্য :** সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন, প্রচার পুস্তিকার তথ্যসমৃদ্ধ বিলবোর্ড জনসাধারণকে এইডস সম্পর্কের অবহিত করতে পারে। বিশেষত মসজিদের ইমামরা এ ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। ইমামদের প্রশিক্ষিত করলে তারা বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ মসজিদের মাধ্যমে রোগ ও তা থেকে বাঁচার উপায় ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হবেন। বিশেষত আমাদের দেশের ৯৯% লোক ধর্মপ্রাণ। তারা ইমাম সাহেবদের কথা সাধারণত মনে প্রাণে বিশ্বাস করবে।

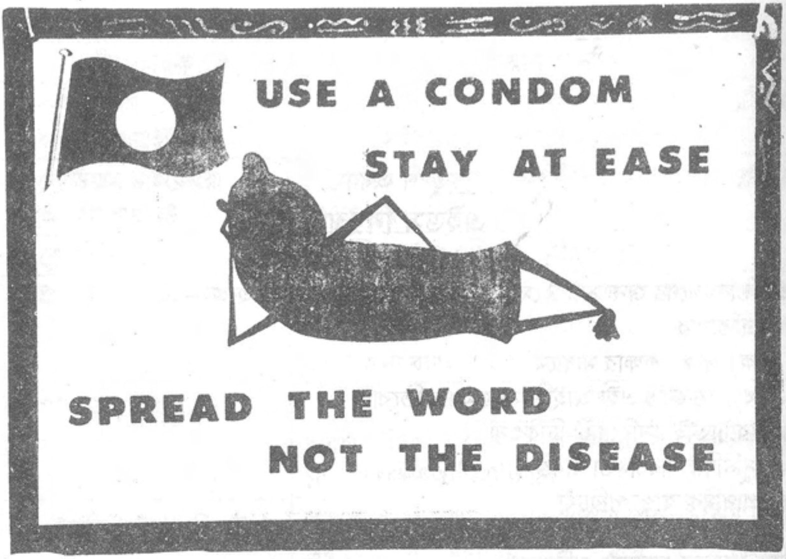

এইডস প্রতিরোধ করার জন্য অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের উদ্বুদ্ধকরণের জন্য প্রচারিত একটি পোস্টার (সৌজন্য : Aboriginal Medical Science Co-operative Ltd.)

(২) **হাসপাতালে বিশেষত :** অস্ত্রোপচার কক্ষ, রক্ত সংরক্ষণগার, গবেষণাগার কর্মী ও কলাকুশলী যারা ঝুঁকিপূর্ণ অথচ গুরুদায়িত্বে নিয়োজিত তাদের জন্য (গবেষণাগার ও এইচ আইভি সংক্রমণ দ্রষ্টব্য)

(৩) **আগামী প্রজন্মের জন্য :** স্বাস্থ্য শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হওয়া উচিত আমাদের আগামী দিনের নাগরিক অর্থাৎ বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক)। এ রোগ সম্পর্কে এখন থেকেই সচেতন করতে হবে যাতে যৌবনে তারা এ ঘাতক ব্যাধির শিকার না হন।

আমাদের দেশে এ ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম অনুপস্থিত থাকলেও শিক্ষকরা লক্ষ্য করে দেখবেন অপ্রচলিত শিক্ষাদানের সুযোগ বহু সময়েই আসে বিদ্যালয়ে। যেখানে স্বীকৃত কোনো কার্যক্রম নেই সেখানে অনিয়মিত আলোচনার মধ্য দিয়েই এইডস সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া যায়। এজন্য ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চিন্তাধারার সাথে মিল দেখে কৌশল ও পরিকল্পনা উদ্ভাবনের দায়িত্ব শিক্ষকের। উদাহরণস্বরূপ জীববিদ্যা বা চিকিৎসাবিষয়ক তথ্য পরিবেশনের সময় বা পারিবারিক জীবন, স্বাস্থ্য এবং শিশু পালনবিষয়ক শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে এইডস রোগ সম্বন্ধে শিক্ষা সহজেই অঙ্গীভূত করা যায়।

এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রম সফল করে তোলার জন্য শিক্ষক ও কার্যক্রম উপস্থাপকদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। একমাত্র সুপ্রস্তুত এবং সুষ্ঠু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপস্থাপকরাই ছাত্রদের শারিরীক ও মানসিক বৃদ্ধির দিকে নজর রেখে অল্পবয়স্কদের জ্ঞান, নৈপুণ্য ও মনোভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হবেন। প্রয়োজন হলে শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে স্বাস্থ্য

অধিকর্তা, শিক্ষকদের প্রতিনিধি সংস্থা, মাতাপিতা, যুব সমাজ এবং সাধারণ জনগোষ্ঠীগুলোর সহযোগিতায় এ শিক্ষা কার্যক্রমকে সার্থক করে তুলতে হবে। ভূমিকাতেই বলা হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং ইউনেস্কো মতামত দিয়েছেন এইডস রোগ বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত এবং বহু দেশে

শিশুদের যৌন-শিক্ষা প্রয়োজন। বিশ্ব এইডস দিবসে জেনেভাতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে একটি শিশু অংশগ্রহণ করছে।

এ মতামতকে গুরুত্ব সহকারে কার্যকর করা হয়েছে। সুখের বিষয় সরকার ২০০৪ সাল থেকে যৌন শিক্ষাকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার কথা ভাবছেন (দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫শে ডিসেম্বর ২০০২)। বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার জন্য শুধু স্বাস্থ্য শিক্ষক নন, বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকও বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন। একথা সত্যি আমাদের রক্ষণশীল সমাজে যৌন বিষয়ে আলোচনা করা নিষেধ। সমাজের এ নিষেধাজ্ঞার কথা মনে রেখে যৌনমিলন বা সহবাস, যার মাধ্যমে এইডস ছড়াতে পারে, সে শব্দগুলোকে সুচতুরভাবে পরিহার করার কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। তরুণ শিক্ষার্থীদের কাছে স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক বা চিকিৎসক যাতে বিব্রতবোধ না করেন অথচ সঠিক তথ্যটি সরবারহ করতে পারেন সেজন্য তিনি রূপকের মাধ্যমে গল্প ফেঁদে বসতে পারেন কার্টুন দিয়ে কল্পিত চরিত্র সৃষ্টি করে। তাহলে ব্যাপারটা তাদের কাছে আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকও শিক্ষকদের সুবিধার জন্য একটি নমুনা দেয়া হলো পরবর্তী পৃষ্ঠায়।

এইডস পরিচিতি

আমি
মৃত্যুদূত

আমি ধ্বংস
করি সবকিছু

কারো দেহে ঢুকলে দেহের
সৈন্যরা প্রতিরোধে ব্যস্ত হয়।

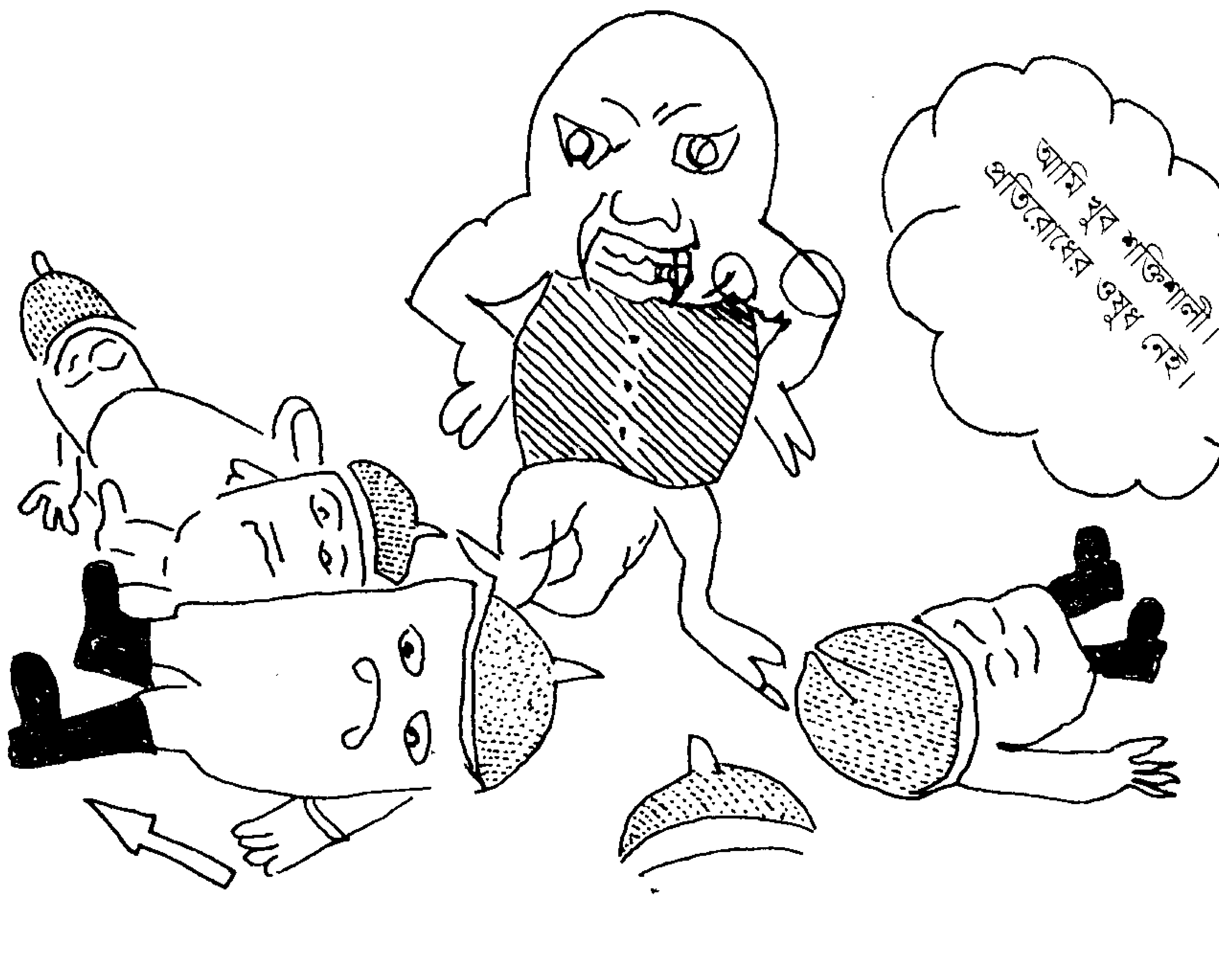
আমি খুব শক্তিশালী।
প্রতিরোধের ওষুধ নেই।

আমার এক শত্রু আছে—
তার নাম কনডম।

আমি এইডস আক্রান্ত।
আমাকে ঘৃণা করবেন না।

পঞ্চদশ অধ্যায়
রেট্রোভাইরাসবিরোধী চিকিৎসা

রক্তজাত এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধ

রক্তদান, অঙ্গদান ইত্যাদি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় কাজ। যারা নিজের রক্তে এইচআইভি বহন করেন অর্থাৎ যারা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ (High risk group) তাদের রক্তদান, অঙ্গদান বা বীর্যদান ইত্যাদি কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। কারো দেহে রক্তভরণের আগে সব রক্তের থলে এইচআইভি-১ ও এইচআইভি-২ মুক্ত কি-না পরীক্ষা করে দেখা উচিত। রোগীদের কেউ কেউ সংক্রমিত উৎপাদক ৮ ব্যবহার করে এইচআইভি সংক্রমিত হচ্ছে। নতুন রক্তদাতাকে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে এইচআইভি মুক্ত কি-না দেখতে হবে।

হিমোফিলিয়া রোগীদের দেহে রক্ত ভরণের আগে ফ্যাক্টর ৮ ও ফ্যাক্টর ৯ উত্তপ্ত করার প্রক্রিয়া দিয়ে সংক্রমণ হ্রাস করা যেতে পারে। হাসপাতাল ও ক্লিনিকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বিশুদ্ধতা (sterilization) পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে ইনজেকশন দেয়া উচিত নয় এবং দিতে হলে বিশুদ্ধ ও একবার ব্যবহারের পর পরিত্যজ্য অর্থাৎ ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ও সূঁচ ব্যবহার করা উচিত।

রেট্রোভাইরাসবিরোধী চিকিৎসা

বর্তমানে এইচআইভি সংক্রমণ ও এইডস-এর কোনো প্রতিষেধক (vaccine) বা তা সারিয়ে তোলার কোনো ওষুধ নেই। তবে সংক্রমণ অবদমিত (suppress) রাখার জন্য কিছু ওষুধ বের হয়েছে। ভাইরাসের বিরুদ্ধে এ রাসায়নিক চিকিৎসা (Antiviral chemotherapy) রোগ সরিয়ে তুলতে না পারলেও মারাত্মকভাবে সংক্রমিত রোগীর জীবনকাল বৃদ্ধি করতে সক্ষম। অবশ্য এসব ওষুধ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে (Immune system) পুনর্জীবিত করতে পারে না বা কোষের মধ্যে ঢুকে যাওয়া এইচআইভিকে ধ্বংস করতে পারে না।

রেট্রোভাইরাসবিরোধী চিকিৎসা

ওষুধ	নির্দেশক (Indication)	মাত্রা	পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া	প্রগতি পরিমাপ (monitor)
নিউক্লিওসাইড (Nucloside) জিডোভুডিন (zidovurine Azidothy midine AZT/ZDV)	ব্যথানাশক, রিভার্স ট্রান্সাক্রিপ্টেজ দমন CD$<৩০০ কোষ/ লিটার বা লক্ষণযুক্ত রোগ (বা উভয়)	৫০০-৬০০ মিলিগ্রাম প্রতিদিন বিভক্ত মাত্রায় সেবন করতে হবে।	রক্তশূন্যতা নিউট্রোফিল হ্রাস বমি ভাব, গা ম্যাজ ম্যাজ করা, মাথাধরা, নিদ্রাহীনতা	রক্ত : প্রকারভেদে এবং পূর্ণ গণনা (প্রতি ৩ মাসে)

ডিডানোসিন (didanosine) (ddI)	AZT সহ্য হয় না বা AZT দেয়ার পরও রোগ বাড়তে থাকলে বা AZT এর সাথে যৌথভাবে	১২৫-৩০০ মিলিগ্রাম মুখে দিনে দুবার	দেহের উপরিভাগের স্নায়ু প্রদাহ অগ্ন্যাশয় প্রদাহ, শুষ্ক মুখ, যকৃৎ প্রদাহ	রক্ত : প্রকারভেদে ও পূর্ণ গণনা, এ মাইনোট্রাসফারেজ, পটাশিয়াম মাইলেজ, ট্রাইগ্লিসারাইড, মাসিক স্নায়ু তন্ত্রের পরীক্ষা
জেলসিটাবিন (Zalcitabine) (ddc)		০.৩৭৫ থেকে ০.৭৫ মিলি গ্রাম মুখে দিনে ৩ বার	দেহের বহির্ভাগে স্নায়ু প্রদাহ, এপথাস ঘা, যকৃত প্রদাহ	মাসিক স্নায়ুতন্ত্রের পরীক্ষা, এ মানো-ট্রান্সফারেজ
স্টাভুডিন (Stavudine) (d4T)	CD4≤ ৩০০ কোষ/μলি এবং ডিডানোসিন ও AZT হয় না।	৪০-৬০ মিলি গ্রাম প্রতিদিন মুখে (দেহের ওজন অনুপাতে) ২-৩ মাত্রায়	দেহের বহির্ভাগে স্নায়ুপ্রদাহ, যকৃত প্রদাহ। অগ্ন্যাশয় প্রদাহ	প্রতিমাসে স্নায়ুতন্ত্রের পরীক্ষা, অ্যামাইনোট্রান্সফারেজ, অ্যা মাইলেজ

আরো অন্যান্য ওষুধের মধ্যে রয়েছে

৩ টিসি (3 TC) ল্যামিভুডিন (Lamivudine)	দেহের বহির্ভাগের স্নায়ু প্রদাহ, বমিভাব, বমি, মাথা ব্যথা
প্রোটিয়েজ অবদমনকারী (protease inhibitor) স্কুইনাভির (Squinavir)	ফুসকুঁড়ি, মাথাব্যথা, দেহের বহির্ভাগের স্নায়ু প্রদাহ।
রিটোনাভির (Ritonavir) ইনডিনাভির (Indiravir)	বমিভাব, বমি, পেটে ব্যথা, উদরাময়, মাথাব্যথা বিলিরুবিন বৃদ্ধি, বৃক্ক পাথুরী
অনিউক্লিয়োসাইড রিভার্স ট্রান্সাক্রিপ্টেজ অবদমনকারী (Non-Nucleoside reverse transcriptase inhibitor)	
নেভিরাপিন (Nevirapin) ডেলাভিরিডিন (Delaviridine) লোভিরাইড (Loviride)	

সুনির্দিষ্ট সাবধানতা (Specific prophylaxis)

যতদিন পর্যন্ত ভাইরাসের বিরুদ্ধে আরো কার্যকর ওষুধ না পাওয়া যায় ততদিন পর্যন্ত চিকিৎসার প্রধান লক্ষ্য হবে এইডস–এর উপসর্গের চিকিৎসা করা। সিডি ৪–এর সংখ্যা প্রতি মাইক্রোলিটারে ২০০ কোষের নিচে নেমে এলে (CD4 200 cells/μL) *Pneumocystis*

carinii ঘটিত ফুসফুস প্রদাহের বিরুদ্ধে বিশেষ সাবধানতা গ্রহণ করা উচিত। এক্ষেত্রে যে ওষুধ ব্যবহার করা হয় তা হলো :

ট্রাইমেথোপ্রিম–সালফামেথোক্সাজোল (Tremethoprin-sulphamethoxazole), পেন্টামিডিন (aerosolized pentamidie) এবং ডেপসোন (Dapsone)।

কোনো বিশেষ ওষুধ পাওয়া সত্ত্বেও *Pneumocystis carinii* সংক্রমণ ঘটলে রোগীকে অন্য ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে।

এক–তৃতীয়াংশ এইডস রোগী *Mycobacterium avium* নামক যক্ষ্মার জীবাণু দিয়ে আক্রান্ত হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে রিফাবুটিন (Rifabutin) দিয়ে যাদের সিডি ৪ কোষ ২০০/μলিটারের কম তাদের সংক্রমণ কমানো যায়। তবে রিফাবুটিন দেয়ার আগে ব্যক্তিটির সক্রিয় যক্ষ্মা আছে কি–না দেখা উচিত। *Mycobacterium tuberulosis*–এর সংক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য নয় মাস থেকে এক বৎসর পর্যন্ত প্রতিদিন আইসোনিয়াজিড (Isoniazid) ৩০০ মিলিগ্রাম মাত্রায় খাওয়া উচিত। যেসব এইচআইভি সংক্রমিত রোগীর পিপিডি (PPD) প্রতিক্রিয়া বা মনটোক্স পরীক্ষা হাঁ–বোধক এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির জন্য ৫ মিলিমিটার পর্যন্ত পরিমাপকেই হাঁ–বোধক বা পজিটিভ হিসেবে ধরা হয়। তাদের সবার এ ওষুধ গ্রহণ করা উচিত।

কোনো কোনো অবস্থায় কেপোসিস সার্কোমা ইন্টারফেরন, কেমোথেরাপি বা তেজস্ক্রিয় রশ্মি (radiation) দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। সাইটোমেগালো ভাইরাসঘটিত অক্ষিপট প্রদাহ গ্যানসিক্লোভির (Ganciclovir) এবং *Cryptococcus*ঘটিত মস্তিষ্কাবরণী প্রদাহ ফ্লুকোনাজল (Fluconazole) দিয়ে নিয়ন্ত্রিত রাখা যায়। খাদ্যনলের ক্যান্ডিডামযতা বা বারবার ঘটিত যোনির ক্যান্ডিডাময়তা ফ্লুকোনাজল (Fluconazole) বা কেটোকোনাজল (ketoconazole) দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। হার্পিস জোস্টার (Herpes zoster) এবং হার্পিস সিমপ্লেক্স (Herpes simplex)-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় অ্যাসাইক্লোভির (Acyclovir) বা ফসকামেট (Foscamet)।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা

এইডস এত ব্যাপক যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার সবক্ষেত্রেই তার ভূমিকা আছে। মা ও শিশুসহ দেশের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা কর্মকাণ্ডে এইডস অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

মনে রাখতে হবে

১। কারো এইচআইভি সংক্রমণ হয়েছে সন্দেহ হলে তাকে এবং যৌন সঙ্গীদের এইচআইভি পরীক্ষা (HIV test) করাতে হবে।

২। যক্ষ্মা রোগের ওষুধ থায়াসিটাজোন (Thiacetazone), এইডস রোগীর দেহে তীব্র পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তাই যক্ষ্মাক্রান্ত এইডস রোগীকে থায়াসিটাজোন দেয়া অনুচিত।

৩। হেপাটাইটিস–বি থেকে এইচআইভি–১ কম সংক্রামক। ১ মিলিলিটার দূষিত রক্তে ৫০টি এইচআইভি থাকে, কিন্তু হেপাটাইটিস বি অণু (particles) থাকে $১০^৯$ (সূত্র: Practice of Surgery, Bali and Love, সংস্করণ ২২, ১৯৯৫)।

ষোড়শ অধ্যায়

এইডস সংশ্লিষ্ট সুযোগ-সন্ধানী রোগের চিকিৎসা

যক্ষ্মার চিকিৎসা

যক্ষ্মা রোগের যথাযথ চিকিৎসার জন্য বিচে উল্লিখিত চিকিৎসা ব্যবস্থা পরিচালনা করতে হবে। এজন্য যথারীতি ব্যবস্থ্য গ্রহণ করা উচিত।

প্রথম দুই মাস		
৫০ কিলোগ্রামের কম	← ওজন →	**৫০ মিলিগ্রাম বা বেশি**
রিফামপিসিন ১৫০ মিলিগ্রাম		রিফামপিসিন ৩০০ মিলিগ্রাম
+ আইসোনিয়াজিড ১০০ মিলিগ্রাম		+ আইসোনিয়াজিড ১৫০ মিলিগ্রাম
+ পাইরাজিনামাইড ৫০০ মিলিগ্রাম		+ পাইরাজিনামাইড ৫০০ মিলিগ্রাম
পরবর্তী চার মাস		
রিফামপিসিন ১৫০ মিলিগ্রাম আইসোনিয়াজিড ১০০ মিলিগ্রাম		রিফামপিসিন ৩০০ মিলি গ্রাম আইসোনিয়াজিড ১৫০ মিলিগ্রাম
(এ সম্পর্কিত আরো তথ্য যক্ষ্মা অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে)		

Peneumocystis carinii ফুসফুস প্রদাহের চিকিৎসা

তীব্র সংক্রমণকালে – শিরাভ্যন্তরে উচ্চমাত্রায় সেপট্রিন (ট্রাইমেথোপ্রিম ২০ মিলিগ্রাম/কেজি/দিন + সালফামেথোক্সাজল ১০০ মিলিগ্রাম/কেজি/দিন) বিভক্ত মাত্রায় ২১ দিন এবং সেসাথে ফোলিনিক অ্যাসিড ১৫ মিলিগ্রাম/দিন।

অতঃপর চিকিৎসা অব্যাহত রাখতে ট্রাইমেথোপ্রিম ১৬০ মিলিগ্রাম/দিন + সালফামেথোক্সাজল ৮০০ মিলিগ্রাম/দিন।

কাজ না হলে বা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হলে

পেন্টামিডিন ৪মিলিগ্রাম/কেজি/দিন ২১দিন এবং ১৪দিন পরপর ৪ মি:লি: গ্রাম/কেজি শিরায়

* পেন্টামিডিন নাসিকা পথেও দেওয়া যায়।

(এ সম্পর্কিত আরো তথ্য নিউমোসিস্টিম কারিনি অধ্যায়ে দেয়া হয়েছে)

এইডস সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুযোগ-সন্ধানী রোগের চিকিৎসা

রোগ	ওষুধ
টক্সোপ্লাজমোসিস	পাইরিমেথামিন এবং লিউকোভরিনসহ সালফাডিয়াজিন
ক্রিপ্টোস্পোরিডিয়োসিস	সাহায্যকারী চিকিৎসা
মাইক্রোস্পোরিডিয়া সংক্রমণ	অক্টিয়োটাইড এসিটেট হাইপার-এলিমেন্টেশন
সাইটোমেগালো ভাইরাস রোগ	গেনসাইক্লোভির সোডিয়াম, ফসকারনেট সোডিয়াম
হারপিস সিমপ্লেক্স	অ্যাসাইক্লোভির
ক্যান্ডিডাময়তা	ক্লোট্রাইমাজল, কেটোকোনাজিল, ফ্লুকোনাজল
হিস্টোপ্লাজমাময়তা	এম্ফোটেরিসিন-বি
Mycobacterium avium intracellulari	নিম্নোক্ত ওষুধগুলোর ৪-৫টি সহযোগে চিকিৎসা : ইথামবিউটল হাইড্রোক্লোরাইড, ক্লোফাজিমিন, সিপ্রোফ্লুক্সাসিন, এমিকেসনি সালফেট, ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন, রিফামপিসিন রিফাবুটিন
উপদংশ (সিফিলিস)	অনান্ত্রিক পেনিসিলিন

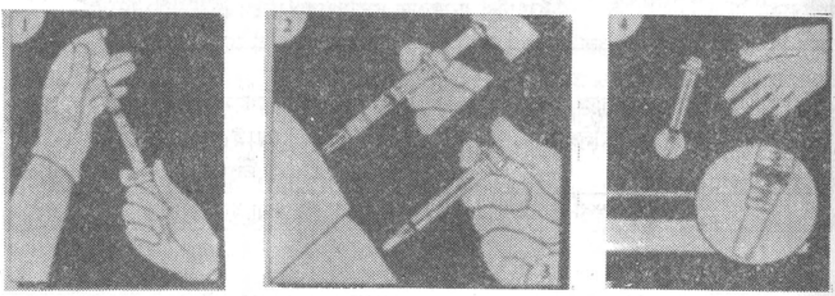

অটোমেটেড রিট্রাকশন সিরিঞ্জ দিয়ে ইনজেকশন

সতর্কভাবে HIV বিরোধী ওষুধ ব্যবহার (Prophylactic use Anti-HIV drug)

যেসব স্বাস্থ্য কর্মীর ত্বকের মাধ্যমে এইচআইভি সংক্রমণের আশঙ্কা করা হয়, যথা—এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির রক্ত সংগ্রহকালে সূঁচ বিদ্ধ হয়ে (Needle stick injury) বা তাদের দেহে অস্ত্রোপচারকালে ধারালো যন্ত্রপাতির আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে হাত কেটে যায়, ইত্যাদি। এ ধরনের আঘাতে ০.৩% ক্ষেত্রে এইচআইভি সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, এসব ক্ষেত্রে অবিলম্বে জিডোভুডিন সেবন করলে শতকরা ৮০ ভাগ ব্যক্তির ক্ষেত্রে রক্ত দূষণ প্রতিরোধ করা যায়। অবশ্য জিডোভুডিন সেবনের পরও রক্ত দূষণ ঘটতে পারে।

রক্ত দূষণ (seroconversion) ঘটবে কি-না তা নির্ভর করে কতটুকু দূষিত রক্ত দেহে ঢুকেছে এবং রোগীর রোগ কত বেশি মারাত্মক পর্যায়ে ছিলো তার উপর। সূঁচ ফুটলে তাই

পরবর্তী ১–২ ঘন্টার মধ্যেই ওষুধ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এজন্য জিডোভুডিন (Zidovudine), ল্যামিভুডিন (Lamivudine) এবং ইন্ডিনাভির (Indinavir) চার সপ্তাহ পর্যন্ত গ্রহণ করতে হবে (Davidson's Principles and Practice of Medicine, 18th ed. 1999)।

এইডস এড়াতে সূঁচের আঘাত (Needle stick injury) থেকে বাঁচার জন্য আজকাল অটোমেটেড রিট্রাকশন সিরিঞ্জ ব্যবহার করা হয়।

সাবধানতা হিসেবে কোট্রাইমোক্সাজোল ব্যবহার

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আফ্রিকাতে যাদের উপসর্গবিশিষ্ট এইচআইভি সংক্রমণ তথা সিডি–৪ কোষ হ্রাস বিদ্যমান তাদের প্রতিদিন কোট্রাইমোক্সাজোল বীজঘ্ন ব্যবহার গ্রহণ করতে উপদেশ দেন। এছাড়া শিল্পোন্নত দেশে *Pneumocystis carinii* ঘটিত ফুসফুস প্রদাহ, জীবাণুগত ফুসফুস প্রদাহ, উদরাময়বিশিষ্ট রোগসমূহ, রক্তদুষ্টি (septicaemia) এবং টক্সোপ্লাজময়তা (Toxoplasmosis) প্রতিরোধের জন্য নিয়মমাফিক কোট্রাইমোক্সাজোল ব্যবহৃত হয়।

হাতে দস্তানা পরিধান করে নিরাপদ পদ্ধতিতে রোগীর রক্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে

দুর্ঘটনাজনিত এইচআইভি সংক্রমণ এর ব্যবস্থাপনা

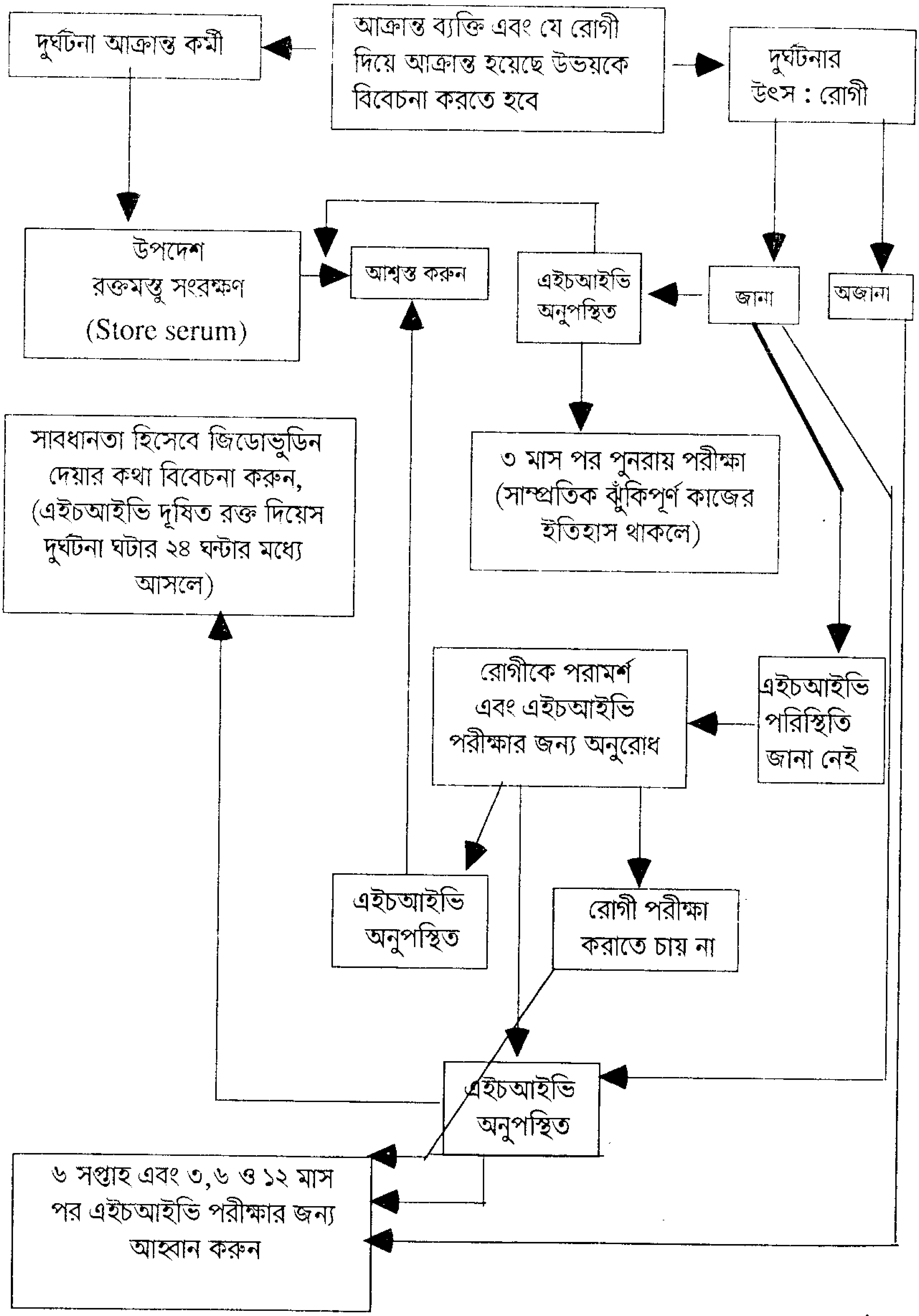

সপ্তদশ অধ্যায়

এইচআইভি সংক্রমণ, শল্যচিকিৎসা ও শল্যবিদ

অন্যান্য রোগীর মতো এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তিদের যে–কোনো শল্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। এসব সমস্যার সমাধান সাধারণ রোগীদের মতোই শল্যচিকিৎসার মাধ্যমে করতে হবে। তবে সংক্রমণ যাতে অন্যদের দেহে না ছড়ায় এ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। অবশ্য কিছু সমস্যা ও রোগ বিশেষভাবে এইচআইভি সংক্রমণের সাথে জড়িত এবং মাঝে মাঝে শল্য চিকিৎসার প্রয়োজন যথা :

* অন্ত্র, মলাশয় এবং পায়ুর রোগ, বিভিন্ন সংক্রমণ তথা কর্কট।
* লসিকা গ্রন্থির জীবিত কোষ পরীক্ষা (biopsy)–সঠিক রোগ নির্ণয়ের জন্য
* দীর্ঘদিন শিরামাধ্যমে ওষুধ (কেমোথেরাপি : বিশেষত সাইটোমেগুলো ভাইরাসজাত অক্ষিপট (প্রদাহ বা কর্কট রোগে) দানের জন্য শিরা উন্মোচন।

পায়ুর রোগ

আঁচিল (warts) : এগুলো সাধারণত পায়ুসঙ্গমজাত (হিউম্যান পেলিলোমা ভাইরাস) যৌন রোগ এবং অস্ত্রোপচার দিয়ে কর্তন করে, ডায়াথার্মি দিয়ে পুড়িয়ে, লেসার রশ্মির সাহায্যে বা পডোফাইলিন (Podophyllin) লাগিয়ে চিকিৎসা করা হয়। এইচআইভি সংক্রমণের ফলে অনাক্রম্যতা হ্রাস পেলে এগুলো কর্কটায়িত হয় (intraepithelial neoplasia-AIN) এবং পরবর্তীতে তা পূর্ণবিকশিত পায়ুর কর্কটরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

পায়ুবৃত্তিক জীবাণুদুটি (sepsis)

এইচআইভি সংক্রমিতদের অন্যান্যদের মতো পায়ুর ভগন্দর হতে পারে। পায়ুকামজনিত আঘাত তথা অনাক্রম্যতা হ্রাস এর ফলে পায়ু এলাকায় সহজেই জীবণুদুষ্টি ও পূঁজাশয় সৃষ্টি হয়। এইচআইভি সংক্রমণ সংশ্লিষ্ট সিডি ৪+ লসিকা কোষ (CD4+ Lynphoeyte) সংখ্যা হ্রাসের ফলে আরোগ্য লাভ দেরিতে হয়। কোষ সংখ্যা ১০০–এর নিচে না নেমে গেলে বিশেষ চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই।

পায়ু ও মলাশয়ের ক্ষত

পায়ুনলের (Analcanal) যে–কোনো স্থানে বা নিম্নমলাশয়ে (lower rectum) ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে এবং সাধারণত তা এইডসসংশ্লিষ্ট। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগুলো সাধারণ হার্পিস (Herpes simplex) ভাইরাস দিয়ে ঘটে। ভাইরাসের ক্ষেত্রে অ্যাসাইক্লোভির দিয়ে প্রথম চিকিৎসা করা উচিত। কখনো ক্ষত এলাকা কর্তন করে অপসারণ করে পায়ুপথ ধীর সম্প্রসারণ (Gentle anal stretch) করার প্রয়োজন হয়।

পায়ুর অর্বুদ বা কর্কট (Anal neoplasia)
সাধারণ লোকদের চেয়ে এইচআইভি সংক্রমিতদের পায়ুর কর্কট অনেক বেশি হয়। সবচেয়ে বেশি দেখা যায় পায়ুর শল্কসদৃশ কোষের (Squamos cell) কর্কট এবং পায়ু বা মলাশয় μ বৃত্তিক হজকিন, নয় লসিকা অর্বুদ (Non Hodgkins, lymphoma) বা কেপোসিস সার্কোমা। পায়ুবৃত্তিক লসিকা অবুর্দের ফলে তা পায়ুবৃত্তিক পূঁজাশয় বলে ভ্রম হতে পারে তাই এইচআইভি সংক্রমিতদের কাটাছেঁড়া করে পুঁজ নির্গমনের চেষ্টা না করে ত্বক অটুট রেখে সূঁচ ঢুকিয়ে শোষণ (Needle aspiration) করা উচিত।

মলধারণ অক্ষমতা (Faecal incortinence)
যেসব সমকামী অত্যধিক পায়ুকামে লিপ্ত থাকে তাদের পায়ুর অভ্যন্তরীণ চক্রপেশী (internal anal sphincter) দুর্বল ও ঢিলা হয়ে যায়। ফলে সঠিকভাবে মলধারণ করতে পারে না, তদুপরি পায়ুপ্রদাহ (proctitis) থাকে।

তীব্র উদর ব্যথা (Acute abdomen) **এবং এইডস**
প্রায় ১০% এইডস রোগীর তীব্র উদর ব্যথা হয় এবং পেট ব্যথার জন্য ৫% এইডস রোগীর অস্ত্রোপচার করার প্রয়োজন পড়ে। এজন্য জরুরিভিত্তিতে উদর উন্মোচন ও পরিদর্শন (emergency laparotomy) করতে হয়। যেসব কারণে এ ধরনের অস্ত্রোপচার দরকার হয় তা হলো :

১. **উপান্ত্রপ্রদাহ** (Appendicitis) : যেসব ক্ষেত্রে উপসর্গ ও লক্ষণ দেখে কোনো এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির উপান্ত্র প্রদাহ হয়েছে বলে সনাক্ত করা হবে সেসব ক্ষেত্রে তাকে সাধারণ লোকের মতোই অস্ত্রোপচার করে উপান্ত্র অপসারণ করে নিয়মমাফিক অস্ত্রোপচারোত্তর যত্ন নিতে হবে।

২. *Mycobacterium avium* **ইন্টাসেলুলারি সংক্রমণ :** এ ধরনের যক্ষ্মাতে অকারণ পেট ব্যথা (vague abdominal pain) এবং একই সাথে জ্বর এবং অস্থিমজ্জা অবদমিত (bone marrow suppression) থাকে। এক্ষেত্রে উদর উন্মোচন না করে সূঁচ দিয়ে লসিকা গ্রন্থিরস বের করে পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ শনাক্ত করা উচিত।

৩. **হজকিন নয় লসিকা অর্বুদ** (Non Hodgkins lymphoma) : সনাক্তকরণের জন্য উদর উন্মোচন করে লসিকা গ্রন্থির জীবিতকোষ পরীক্ষা (biopsy) পরিহার করতে হবে। এ রোগে যারা বিশেষ ওষুধ বা কেমোথেরাপি দিয়ে চিকিৎসা করান তাদের কারো ক্ষুদ্রান্ত্র ছিদ্র হয়ে (অর্বুদজনিত কোষমৃত্যুর জন্য) সহসা তীব্র পেট ব্যথা দেখা দিতে পারে। জরুরিভিত্তিক উদর উন্মোচন করে চিকিৎসা করলে এক্ষেত্রে প্রায়ই বিফলতা দৃষ্ট হয় তাই এইচআইভি সংক্রমিতদের অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চিকিৎসা যথাসম্ভব এড়িয়ে যাওয়া উচিত।

৪. **পিত্তনল প্রদাহ** (Cholangitis) : সম্ভবত এইচআইভি রোগীর ক্ষেত্রে সাইটোমেগালো ভাইরাস দিয়েই এ প্রদাহ ঘটে এবং অস্ত্রোপচার অপ্রয়োজনীয়।

৫. **লসিকা অর্বুদ** (Lymphoma) : উদরের নন–হজকিন লসিকা অর্বুদ ছাড়াও দেহের অন্যত্র যথা প্যারোটিড গ্রন্থি বা মধ্যবক্ষে (Mediastinum) লসিকা অর্বুদ হতে পারে। অস্ত্রোপচার দিয়ে কর্তন মাধ্যমে জীবিতকোষ পরীক্ষা বায়োপ্সি (Biopsy) কোনো উপকারে আসে না। তবে অস্ত্রোপচার ব্যতীত জীবিত কোষ পরীক্ষা করা যেতে পারে।

৬. **প্লীহা অপসারণ** (Spleenectomy) : এইচআইভি সংশ্লিষ্ট স্বয়ংজাত (autoimmune) অনুচক্রিকা হ্রাস (thrombocytopenia)-এর ক্ষেত্রে কখনো কখনো অস্ত্রোপচার মাধ্যমে প্লীহা অপসারণ করা প্রয়োজন হয়।

রোগীর দেহ থেকে শল্যবিদের দেহে এইচআইভি সংক্রমণ

শল্যবিদ রোগী নিয়ে কাটা–ছেঁড়া করেন। রক্ত নিয়েই তাঁকে কাজ করতে হয় আর এ রক্তের মাধ্যমেই মূলত এইচআইভি ছড়ায়। তাই এইডস রোগে আক্রান্ত হবার তাদের প্রবল সম্ভাবনা থাকে। বিশেষত এইচআইভি সংক্রমণের প্রথম শেষভাগে যখন রক্তে এ ভাইরাসের উপস্থিতি খুব বেড়ে যায়, তখন সংক্রমণ ছড়াবার আশঙ্কাও বেশি থাকে। রোগের প্রথমদিকে রক্তমস্তুতে সদ্য পরিবর্তন (seroconversion) আসায় রোগী নিজেও তার রোগের অস্তিত্ব জানে না এবং অসতর্ক শল্যবিদকে সহজেই সংক্রমিত করতে পারে। শল্যবিদের সংক্রমিত হবার আশঙ্কা অনেকাংশে নির্ভর করে :

* রোগীর মধ্যে এইচআইভি সংক্রমিতদের সংখ্যা ;
* দৈনিক অস্ত্রোপচার সংখ্যা ;
* অস্ত্রোপচারের জন্য ব্যয়িত সময়ের দৈর্ঘ্য ;
* শল্যবিদের নিজস্ব সাবধানতা ; ইত্যাদির উপর।

একটা পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের এইচআইভি সংক্রমণপ্রবণ শহরে ৩০ বৎসর কাজ করলে একজন শল্যবিদ ৮০০ বার অস্ত্রোপচার করলে একবার সংক্রমিত হতে পারেন। অথচ আফ্রিকা অর্থাৎ যেখানে অগুণতি এইডস রোগীর বাস সেখানে একই ধরনের এবং মেয়াদের চাকুরি করলে এ শল্যবিদ প্রতি চারবার অস্ত্রোপচারে একবার সংক্রমিত হওয়ার আশংকায় থাকবেন।

সংক্রমণের উৎস

দূষিত রক্তময় ফাঁপা সূঁচ দিয়ে ত্বকবিদ্ধ হয়েই অধিকাংশ স্বাস্থ্য কর্মী সংক্রমিত হয়। সেলাই সূঁচ (ফাঁপা নয়) বিদ্ধ হয়েও শল্যবিদ, সেবিকা বা স্বাস্থ্য কর্মী সংক্রমিত হতে পারেন। তবে সূঁচ ফাঁপা হলে তাতে দূষিত রক্ত ভরা থাকে তাই সংক্রমণের আশংকা দশগুণ বেড়ে যায়। তা ছাড়া শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি এবং ত্বকে দূষিত রক্ত ছলকে পড়েও শল্যবিদ সেবিকা ইত্যাদি রোগগ্রস্ত হতে পারেন।

সাবধানতা

অস্ত্রোপচারকালে এইচআইভি সংক্রমণরোধে জন্য যেসব পন্থা অবলম্বন করা উচিত তা পরবর্তী পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হলো :

* সব রোগীকে অস্ত্রোপচারের পূর্বে নিয়মমাফিক এইচআইভি সংক্রমণ আছে কি–না পরীক্ষা করা (অবশ্য কোনো কোনো দেশে এর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অভিমত রয়েছে)।
* চোখে প্রতিরোধক চশমা বা মুখে মোটর সাইকেলের হেলমেটের মতো স্বচ্ছ আবরণ পরা।
* পানি প্রতিরোধক (বিশেষত সম্মুখভাগে) গাউন পরিধান করা।
* পায়ে স্যান্ডেল বা জুতা মোড়ক (shoe cover) পরিধানের পরিবর্তে হাঁটু–নিম্ন বুট পরা (এতে কোনো ধারালো যন্ত্রপাতি হাত থেকে পড়ে গেলে পা রক্ষা পাবে)।
* সাধারণত অস্ত্রোপচার কার্যে ব্যবহৃত গৌণ হাতের (ডানহাতি শল্যবিদের বাঁ হাতে) তর্জনী এবং বুড়ো আঙুলের নিকটস্থ করতলে সেলাইকালীন সূঁচ বিদ্ধ হয় তাই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।
* হাতে দুজোড়া দস্তানা পরিধান করতে হবে। এতে দস্তানা ফুটো হয়ে হাতে রক্ত লাগার আশংকা পাঁচ গুণ হ্রাস পায়। ভিতরে পরা দস্তানাটি আকারে বড় এবং বাইরেরটি ছোট হলে ভালো হয়।
* স্বল্প সংখ্যক সহকারী দিয়ে অস্ত্রোপচার করা এবং অনাবশ্যক নিজে বা সহকারীর নড়াচড়া না করা। প্রয়োজনে কোনো সহকারী স্থান পরিবর্তন করতে চাইলে শল্যবিদ সে সময় অস্ত্রোপচার বন্ধ রাখবেন তাতে সহকারীর হাতে আঘাত লাগার আশংকা হ্রাস পায়।
* ধীর অথচ নিয়মমাফিকভাবে রক্তক্ষরণ রোধের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে অস্ত্রোপচার করা।
* অস্ত্রোপচার এলাকার উপর দিয়ে একজনের হাত থেকে অন্যজনের হাতে ধারালো যন্ত্রপাতি সরবরাহ না করা। সরবরাহ করতে হলে একটি বৃক্ক পাত্রে (Kidney dish) যন্ত্রটি রেখে সহকারী বা সেবিকা (scrub nurse) তা শল্যবিদকে এগিয়ে দিবেন। এতে আঘাতজনিত দুর্ঘটনার আশংকা হ্রাস পাবে।
* রোগী নির্বাচনের সময় নিম্নোক্ত রোগীদের ব্যাপারে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন :
  ক. এইচআইভি সংক্রমিত
  খ. রোগী বয়স্ক এবং অবিবাহিত (বিশেষত পাশ্চাত্যে এরকম লোকের সমকামী হবার সম্ভাবনা থাকে)
  গ. শিরাভ্যন্তরে মাদক গ্রহণের ইতিহাস
  ঘ. উৎপাদক ৮ (Factor VII) দিয়ে চিকিৎসিত হিমোফিলিয়া রোগের ইতিহাস
  ঙ. সাহারা নিম্নাঞ্চলের অধিবাসী
  চ. উপরোক্ত ঝুঁকিপূর্ণ লোকদের শয্যাসঙ্গী

এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির রক্ত দিয়ে দূষিত হলে শল্যবিদের করণীয়

* সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেয়া কলের পানিতে দূষিত এলাকা ধুয়ে পরিষ্কার করুন।
* রোগীর এইচআইভি পরীক্ষা না করিয়ে থাকলে অবিলম্বে তা করতে পাঠান আপনি সংক্রমিত রক্তের সংস্পর্শে এসেছেন কি–না তা জানতে।

* যকৃত প্রদাহের (Hepatitis) টিকা নিন। কেননা এইচআইভি দিয়ে সংক্রমিত হবার চেয়ে যকৃত প্রদাহের ভাইরাস দিয়ে সংক্রমিত হবার আশঙ্কা বেশি।
* নিজের এইচআইভি পরীক্ষা করান যদিও রক্তমস্তুতে পরিবর্তন আসতে যথেষ্ট সময় লাগতে পারে।
* রক্তমস্তুতে পরিবর্তন এসেছে কি-না জানার জন্য ১২ সপ্তাহ পরে আবার এইচআইভি পরীক্ষা করান । অবশ্য এ সময়টা খুবই উদ্বেগে কাটবে।
* যদি কোনো চিকিৎসক জানতে পারেন তিনি এইচআইভি সংক্রমিত তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা তার হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে জানাবেন যাতে তিনি যদি শল্যবিভাগে কাটা-চেরা ইত্যাদি দায়িত্বে থাকেন তাকে যাতে এসব দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে অন্য কাজে নিয়োজিত করা হয়। এতে রোগীদের সংক্রমিত হবার সম্ভাবনা থাকবে না।

নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের রক্তদান, অঙ্গদান, বীর্যদান করা উচিত নয়

* যে পুরুষ অন্য পুরুষের সাথে কখনো যৌন কর্ম করেছেন ;
* যেসব পুরুষ ও মহিলা ইনজেকশন দিয়ে কখনো মাদকদ্রব্য গ্রহণ করেছেন ;
* যারা যৌন কর্মী ;
* যারা এইচআইভি দিয়ে সংক্রমিত বা সংক্রমিত হয়েছেন বলে ধারণা পোষণ করেন ;
* উপরোক্ত কারো বিগত দু বছরের যৌনসঙ্গী ;
* হিমোফিলিয়া রোগীর যৌনসঙ্গী ;
* যকৃত প্রদাহ (হেপাটাইটিস) বি এবং সি-এর বাহক।

অষ্টাদশ অধ্যায়
দন্ত চিকিৎসকের চেম্বারে পালনীয় সতর্কতা

শল্যবিদ ও দন্ত চিকিৎসকরা এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসা করতে দিয়ে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে নিজেরাই এ ভাইরাসের শিকার হতে পারেন। তাই এক্ষেত্রে চিকিৎসকদের বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। নিচে দন্ত চিকিৎসকের চেম্বারে অবশ্য পালনীয় কিছু সতর্কতা উল্লেখ করা হলো —

* রোগীকে দেখার পর হাত ধুয়ে ফেলতে হবে। এক্ষেত্রে মোলায়েম সাবান ব্যবহার করা উচিত। রক্ত ও থুথুর সংস্পর্শ এড়ানোর জন্য রবারের দস্তানা ব্যবহার করা শ্রেয়।
* চোখে প্রতিরক্ষা হিসেবে চশমা এবং মুখে মুখোশ পরিধান করা উচিত। অন্যথায় ড্রিল মেশিন দিয়ে কাজ করার সময় চোখে-মুখে গুঁড়ো এসে পড়তে পারে।
* হাফ-হাতা জামা পরে রোগীর দাঁতে অস্ত্রোপচার করতে হবে। ভিজে গেলে বা নোংরা মনে হলে জামা বদলে ফেলতে হবে। তবে এধরনের পোশাক অস্ত্রোপচার কক্ষের বাইরে পরিধান করা উচিত নয়। রোগীর ত্বক বা চর্মে কোনো কাটা বা ক্ষত থাকলে তার স্পর্শ এড়িয়ে চলুন।

যন্ত্রপাতি নির্বীজন ও পরিষ্কার

সূঁচ, সিরিঞ্জসহ সব ধরনের যন্ত্রপাতি সম্ভাব্য ভালোভাবে নির্বীজন করা উচিত। ধারালো যন্ত্র বা সূঁচ ত্বকে বিদ্ধ হতে পারে তাই এ কাজে হাতে রবার বা ল্যাটেক্সের দস্তানা ব্যবহার করা শ্রেয়। কাজ শেষে সব যন্ত্রপাতি বিশুদ্ধ পানিতে ধুয়ে রাখা প্রয়োজন।

নির্বীজন (Sterilization)

শুকনো তাপ : বন্ধ চুল্লিতে (closed oven) ১৭০° সেন্টিগ্রেডে দু ঘন্টা পর্যন্ত তাপ দিতে হবে।

বাষ্প : চাপযুক্ত বন্ধ পাত্রে ১২১° সে. তাপে একবার চাপে (প্রতি বর্গইঞ্চিতে ১৫ পাউন্ড চাপ) ২০ মিনিট ধরে প্রয়োগ করতে হবে।

জীবাণুমুক্তকরণ

পরিস্কার শুকনো যন্ত্রপাতি নিম্নোক্ত উপায়ে জীবাণুমুক্ত (disinfection) করা যায় কিন্তু নির্বীজন করা যায় না। পদ্ধতিগুলো পরবর্তী পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হলো —

পানিতে ফুটিয়ে : ফুটন্ত পানিতে ২০ মিনিট পর্যন্ত যন্ত্রপাতি ডুবিয়ে রেখে। এ পদ্ধতিতে এইচআইভি, যকৃত প্রদাহের বি ভাইরাস (virus) এবং জীবাণু (bacteria) নিষ্ক্রিয় করা যায়, কিন্তু গুটিযুক্ত (spore) জীবাণু অক্ষত থাকে।

দন্ত চিকিৎসকের চেম্বার এইডস রোগের অন্যতম প্রধান সূতিকাগার

রাসায়নিকভাবে : সূঁচ এবং সিরিঞ্জ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে জীবাণুমুক্ত করা উচিত নয়। যদি নির্বীজন বা পানিতে ফুটানো সম্ভব না হয় কেবল সেক্ষেত্রেই চর্মবিদারী ও দেহভ্যন্তরে (invasive) ব্যবহার করার যন্ত্রপাতি রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে বীজাণুমুক্ত করা যেতে পারে। নিচে বীজাণুমুক্ত করার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের নাম এবং কতোক্ষণ সেসবে ডুবিয়ে রাখতে হবে, তা উল্লেখ করা হলো—

রাসায়নিক দ্রব্যের নাম	**কতোক্ষণ ডুবিয়ে রাখতে হবে**
পানিযুক্ত ২% গ্লুটারাল (গ্লুটারালডিহাইড)	জীবাণুমুক্ত করার জন্য কক্ষতাপে ৩০ মিনিট। নির্বীজন করার জন্য কক্ষতাপে ১০ ঘন্টা
৬% হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড	কক্ষতাপে ৩০ মিনিট (জীবাণুমুক্ত করার জন্য)

এখানে উল্লেখ্য যে, ব্যবহার করা আগে যন্ত্রপাতিগুলো রাসায়নিক দ্রব্য থেকে উঠিয়ে বিশুদ্ধ পানিতে ধুয়ে দস্তানা পরা হাতে বা সাঁড়াশি দিয়ে ধরতে হবে এবং নির্বীজন করা তোয়ালে দিয়ে মুছে ফেলতে হবে।

বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য এইচআইভি নির্মূল বা হত্যা করতে পারে। নিচে এ ধরনের কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্যের নাম উল্লেখ করা হলো—

* গ্লুটারালডিহাইড ২% বা VIRKON পাউডার
* পভিডোন আয়োডিন ২%
* ক্লোরিন দ্রবণ ০.৫%
* অ্যালকোহল ৭০%
* শল্যকর্মের স্পিরিট (surgical spirit) ৭০%
* হাইড্রোজেন পারক্সাইড ৬%
* লাইজল ৩%

এখানে উল্লেখ্য যে, স্যাভলন এবং ডেটল দিয়ে এইচআইভি ভাইরাস হত্যা করা যায় না। তবে অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি ২০ মিনিট ধরে পানিতে ফুটালে এইচআইভি মারা যাবে। গবেষণাগারে এইচআইভি সংক্রমণ অধ্যায়ে আরো বিস্তারিত তথ্য আছে।

উনবিংশ অধ্যায়

এইচআইভি রোগী ও যৌনতা

এইডস বা এইচআইভি সংক্রমণ হয়েছে বলে যৌনজীবন ত্যাগ করতে হবে এধরনের একটি ধারণা অনেকের মনেই রয়েছে। এইচআইভি হয়েছে অতএব যৌনক্রিয়া পরিহার করে চলতে হবে। কিন্তু এ ধারণাটি একেবারেই সঠিক নয়। মানুষসহ প্রত্যেকটি প্রাণীর জীবনের মৌলিক চাহিদা দুটি—

১। খাবার (বেঁচে থাকার জন্য)

২। যৌনক্রিয়া (বংশবৃদ্ধির জন্য)

সুতরাং যৌনতা একটি মৌলিক দৈহিক চাহিদা এবং তা পরিপূরণ করতে হবে। তবে এইচআইভি রোগীর ব্যাপারে সতর্ক পদক্ষেপে এগুতে হবে। এইডস বিশেষজ্ঞরা এর নাম দিয়েছেন নিরাপদ যৌনক্রিয়া বা সেফার সেক্স (Safer sex)। অনিরাপদ যৌনক্রিয়ায় দূষিত বীর্য, যোনির নিঃসরণ বা রক্ত (মাসিক স্রাবের রক্তসহ) অন্যের দেহে চলে যায়।

নিরাপদ যৌনক্রিয়া

যৌনকর্মের যুগলদের যে-কোনো একজনের দেহে এইচআইভি ভাইরাস থাকলে তা তার রক্ত, বীর্য, যোনির নিঃসরণ ইত্যাদি থেকে যোনি, শিশ্ন, পায়ু বা মুখগহ্বরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি দিয়ে অপরের দেহ তথা রক্তে চলে যেতে পারে। এজন্য যৌনকর্ম করার আগে নিজেকে নিরাপদ বা বিপদমুক্ত রাখার জন্য বেশ কিছু নিয়ম মেনে এগুতে হয়। প্রকৃতপক্ষে এটিই নিরাপদ যৌনক্রিয়া।

নিরাপদ যৌনক্রিয়া অর্থ হচ্ছে —

* যৌনাঙ্গে শিশ্ন প্রবিষ্ট না করে যৌনক্রিয়া সম্পন্ন করা, যথা— হস্তমৈথুন, উরুর ফাঁকে যৌনকর্ম, যৌনাঙ্গ নিয়ে নাড়াচাড়া করা, ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই শিশ্ন যোনি বা পায়ুপথে প্রবেশ করানো যাবে না।
* যৌনক্রিয়ার সময় প্রতিবন্ধক পদ্ধতি অর্থাৎ কনডম ব্যবহার করা। এজন্য পুরুষ ও মহিলাদের আলাদা আলাদা কনডম পাওয়া যায়। এতে একজনের দেহের এইচআইভি অপরজনের দেহে প্রবেশ করতে পারে না। এ ধরনের পন্থা অবলম্বন করাকে সংরক্ষিত যৌনক্রিয়া (protected sex) বলে।

অবশ্য নিরাপদ যৌনক্রিয়ার পূর্বে যৌন সহচরের সাথে আগেই শর্ত ঠিক করে নিয়ে একমত হতে হবে যে নিজেদের স্বার্থেই যৌনক্রিয়ার বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে কেবল চার বা পাঁচটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে এবং বাকিগুলো, অর্থাৎ যেসব পদ্ধতিতে রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে, সেগুলো বর্জন করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এভাবেই সফল ও নিরাপদ যৌনক্রিয়া সম্ভব।

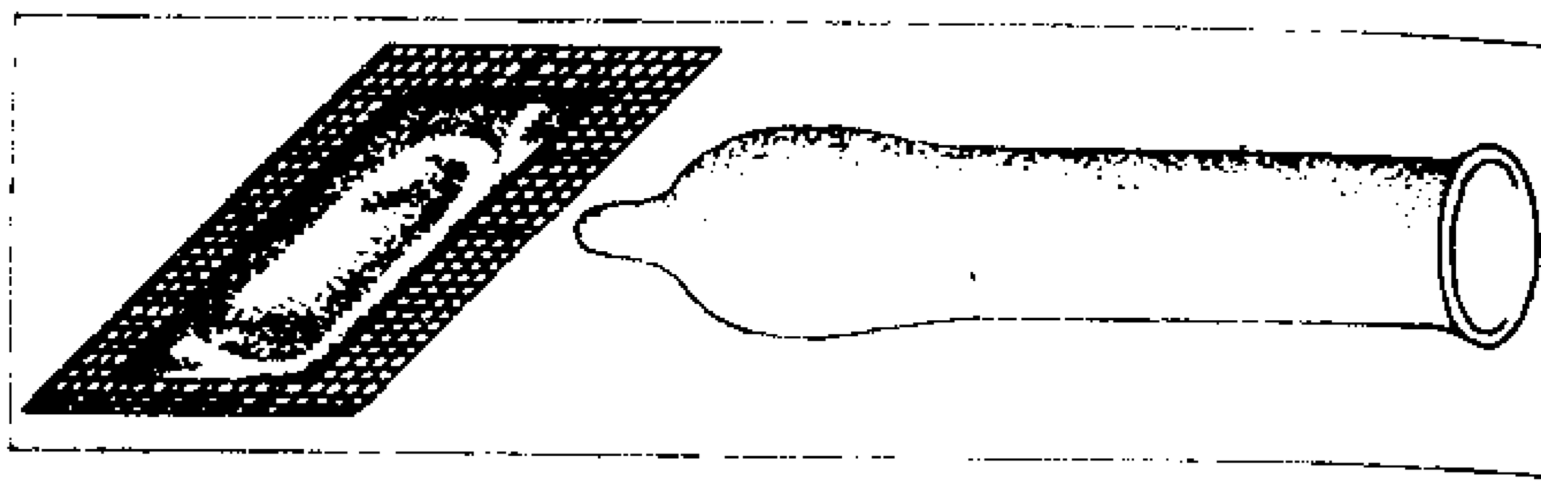

কনডম : নিরাপদ যৌনক্রিয়ার অপরিহার্য উপকরণ

সঠিক পদ্ধতিতে কনডম ব্যবহারের নিয়ম

* কনডম কেনার সময় মেয়াদ ঠিক আছে কি-না দেখে নেয়া উচিত। কখনো রোদে রাখা হয়েছে এমন কনডম কেনা উচিত নয়। জীর্ণ বা নষ্ট কনডম ব্যবহার করা অনুচিত। কনডম বাড়িতে সংরক্ষণ করতে হলে তা ছায়াযুক্ত ঠাণ্ডা ও শুকনো স্থানে রাখতে হবে। কনডম দেহের উষ্ণতায় (বিছানায় তোষকের নিচে) রাখা অনুচিত।

* মিলনের সময় শিশ্ন শক্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে কনডম পরিধান করতে হবে। তবে শিশ্ন যোনি স্পর্শ করার আগেই তা করতে হবে। কনডমের মোড়ক খোলার সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত যাতে আংটি বা নখের আঁচড়ে তা ছিদ্র না হয়।

* ভাঁজ করা কনডম ধীরে ধীরে শিশ্নের উপর গড়িয়ে খুললে তা পরা হয়ে যাবে।

* আরাম বোধ করার জন্য জলে দ্রাব্য পিচ্ছিলকারক পদার্থ ব্যবহার করা যায়, তবে তৈলাক্ত পদার্থ যথা– ভেসেলিন ব্যবহার কনডমের জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিকারক। তবে ননোক্সিনোল–৯ (Nonnoxynol-9) যুক্ত কোনো পিচ্ছিলকারক ব্যবহার করা হলে সবচেয়ে ভালো পাওয়া যায়। এতে একদিকে শিশ্ন যেমন পিচ্ছিল হয়, অন্যদিকে তেমনি এইচআইভি ও শুক্রকীট মারা যায়। গবেষণাগারে পরিচালিত বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে, পরখনলে ননোক্সিনোল বা মেনফাগোল (Menfagol) এইচআইভিকে নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে।

* বীর্যস্খলনের পর শিশ্ন নরম হবার পূর্বেই খুব সাবধানে কনডমটি শিশ্নের গোড়ায় চেপে রাখা অবস্থায় বের করে আনতে হবে যাতে যোনিতে বীর্য উপচে না পড়ে।

* ব্যবহৃত কনডম পায়খানা অর্থাৎ কমোড বা প্যানে ফেলে দেয়া ভালো। যত্রতত্র ফেললে শিশুরা তা বেলুন ভেবে খেলবে এবং মুখ দিয়ে ফোলানোর চেষ্টা করবে। ফলে শিশুরা মারাত্মক ধরনের যে-কোনো যৌনব্যাধি, এমনকি এইচআইভি দিয়েও সংক্রমিত হতে পারে। কোনো কনডমই দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা উচিত নয়।

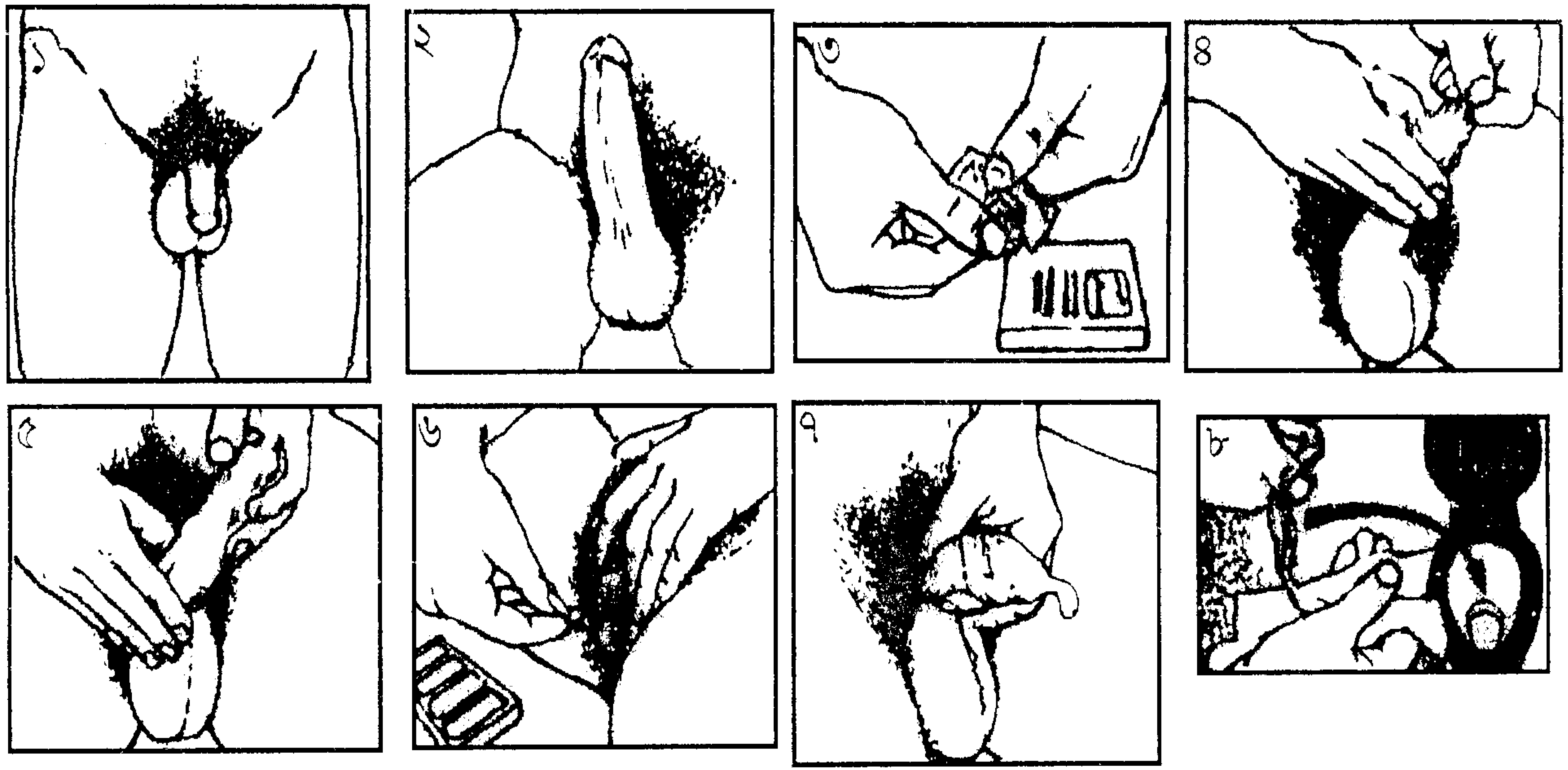

কনডম পরার নিয়ম

ব্রাজিলের গে (Gay) সম্প্রদায়ের একদল লোক যাদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ বেশি হয়

যোনিতে সঙ্গম (Vaginal sex)

* এটি স্বাভাবিক যৌনক্রিয়া বা যৌন পদ্ধতি। কনডম বীর্য বা যোনির নিঃসরণে থাকা এইচআইভি-কে সুস্থ যৌন সহচরের যৌনাঙ্গের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির স্পর্শে আসতে দেয় না অর্থাৎ এটি একধরনের প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।

মহিলাদের কনডম

* পরিবার পরিকল্পনার্থে মিলনের ১৫ মিনিট পূর্বে আঙুল দিয়ে যতদূর সম্ভব যোনিতে শুক্রকীটনাশক বড়ি ঠেলে দেয়া যেতে পারে, কিন্তু কখনও, কোনো অবস্থাতেই যোনি বা শিশ্নে রাসায়নিক বীজাণুবারক দ্রব্য প্রয়োগ করা উচিত নয়। কারণ এসব রাসায়নিক পদার্থ এইচআইভি-কে তো মারবেই না, বরং তা যৌনাঙ্গের মারাত্মক ধরনের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।
* যেভাবে সঙ্গম করলে কষ্ট হয় বা রক্তপাত হয় তা বর্জন করা উচিত। ঋতুকালীন বা সন্তান প্রসবের পর মা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত যৌনমিলন করা অনুচিত।
* যৌনাঙ্গে ক্ষত, চুলকানি, ব্যথা বা ক্ষরণ থাকলে চিকিৎসা করে সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত সঙ্গম স্থগিত রাখতে হবে।

পায়ু সঙ্গম (Anal intercourse)

এটি যৌনমিলনের একটি অস্বাভাবিক পন্থা। এতে শিশ্ন মলদ্বারে প্রবেশ করানো হয়। সাধারণত সমকামীরা এ পন্থা অবলম্বন করে। অবশ্য কখনও কখনও বিবাহিত দম্পতিরাও গর্ভ এড়াবার জন্য এ পথ অবলম্বন করে যৌন মিলন করে থাকেন। এধরনের যৌনমিলন যথেষ্ট কষ্টসাধ্য এবং অনিরাপদ তো বটেই। এক্ষেত্রে কনডম ব্যবহারেও কোনো বিশেষ সুবিধা

ডায়াফ্রাম ও ডায়াফ্রাম পরার পদ্ধতি

পাওয়া যায় না। কারণ যোনি সঙ্গমের তুলনায় পায়ু সঙ্গম প্রক্রিয়ায় কনডম অধিক হারে ছিঁড়ে যায়। তাই —

* পায়ু সঙ্গম না করাই নিরাপদ।
* যদি গর্ভ এড়ানোই উদ্দেশ্য হয় তবে অন্য যে-কোনো পন্থা গ্রহণ করতে হবে।
* সঙ্গমে বৈচিত্র্যের জন্য হলেও অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করা উচিত।
* যদি পায়ুকাম করতেই হয় তবে ননোক্সিনল-৯ বা মেনফাগল বা অন্য যে-কোনো জলে দ্রবণীয় পিচ্ছিলকারকসহ শক্তিশালী কনডম ব্যবহার করা প্রয়োজন। কনডম ছিঁড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে বলে যৌন সহচরের দেহের বাইরে বীর্যস্খলন করা উচিত।

মুখ সঙ্গম (oral intercourse)

এটিও একটি অস্বাভাবিক পন্থা। এতে দম্পতিরা একে অপরের যৌনাঙ্গ লেহন বা চুম্বন করে থাকে। এ পদ্ধতিকে অনেকে সিক্সটি নাইন (69) বলে। যদি যৌন সহচরের মুখে কোনো ক্ষত বা রক্তপাত থাকে এবং সেখানে বীর্যস্খলন হয় বা পুরুষ সঙ্গী যদি নারী সঙ্গীর যোনির রক্ত বা ক্ষরণ লেহন করে তবে তা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এবং মারাত্মক যৌনরোগ তথা এইচআইভি সৃষ্টি করতে পারে। সুস্থ থাকার জন্য অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়া পরিহার করে সর্বদা একজন যৌন সঙ্গীর (স্ত্রী) প্রতি বিশ্বস্ত থাকাই উচিত।

বিংশ অধ্যায়

বাংলাদেশ এবং এইডস

বাংলাদেশ পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা এবং তার ২০০-এর অধিক শাখা-প্রশাখা দিয়ে পরিবৃত্ত। সমুদ্রপৃষ্ঠের সামান্য উপরে ২০°–৩৪ ও ২৬°-৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°–০১ ও ৯২°–৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে এর অবস্থান। এদেশের আয়তন ৫৭,২৯৪ বর্গমাইল (১৪৮,৩৯৩ বর্গ কিলোমিটার) এবং সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যাপ্তি হলো ১৮০ মাইল (৩০০ কিলোমিটার)। পৃথিবীর অষ্টম জনবহুল এ দেশের লোক সংখ্যা ১৯৯৫ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ১২ কোটি। বাংলাদেশের পরিসংখ্যান দপ্তরের হিসেব অনুযায়ী ২০০০ সালে তা ১৪ কোটিতে পরিণত হবার কথা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় ১.৮১%। আগামী ৩৮ বছরে দেশের এ জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। প্রতি বর্গমাইলে বর্তমানে গড়ে ২০০০ লোক বাস করে অর্থাৎ জনবসতির ঘনত্বের দিকে এদেশ পৃথিবীর শীর্ষে। জনসংখ্যার ৮৪% গ্রামে বাস করে। দেশটিতে ৬৮,০০০ গ্রাম রয়েছে। আর তরুণ শিক্ষিত প্রজন্মের একটি বৃহৎ অংশ চাকুরির উদ্দেশ্যে সাধারণত বিদেশ যাত্রার দিকে আগ্রহী থাকে। এ বিপুল জনসংখ্যার সম্প্রদায় অনুযায়ী লোকসংখ্যার শতকরা হার নিচে দেয়া হলো —

মুসলিম	৮৮.৩%
হিন্দু	১০.৫%
বৌদ্ধ	০.৬%
খ্রীষ্টান	০.৩%
অন্যান্য	০.৩%
শিক্ষার হার	৩২.৪%

বাংলাদেশের সভ্যতার ইতিহাস প্রায় ১০০০ বছরের পুরানো। তিব্বতীয়, মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় আর্য বংশ থেকে আজকের বাংলা ভাষা-ভাষী জনগোষ্ঠীর উৎপত্তি। এদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রাচীন এবং এখন পর্যন্ত কৃষিকাজই দেশের প্রধান (৩৮.০৭%) অর্থনৈতিক ভিত্তি।

কিছু বিশেষ দিক

এ দেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয় লেগেই আছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা এদেশের নিত্যসঙ্গী। গত ৩২ বছরে ১৬টি মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় ঘটেছে এ দেশে। পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র এদেশে মানুষের মাথাপিছু আয় মাত্র ২২০ ডলার। জনসংখ্যার ৬০% লোকের কোনো ভূমি নেই। শিক্ষার হারও অত্যন্ত কম। এদেশের মাত্র ৩৮% পুরুষ ও ২৫% মহিলা শিক্ষিত। শিশু মৃত্যুর হারও এখানে সর্বাধিক। ১০০০টি জীবিত শিশুর মাঝে ৭১ জনই মারা যায়। সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে প্রতি

Library Dhaka

১০০০ জনের মধ্যে ৪.৪ জন মা প্রাণ হারান। এদেশে তরুণ সংখ্যা অধিক অর্থাৎ জনসংখ্যার ৪৩% তরুণ এইডসের ব্যাপারে এ তথ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সমস্যার শেষ নেই। তবে এসব সমস্যার মধ্যে প্রধান হলো ---

(ক) সংক্রমণ (Infection)

(খ) পুষ্টিহীনতা (Malnutrition)

(গ) জনসংখ্যাধিক্য (Overpopulation)

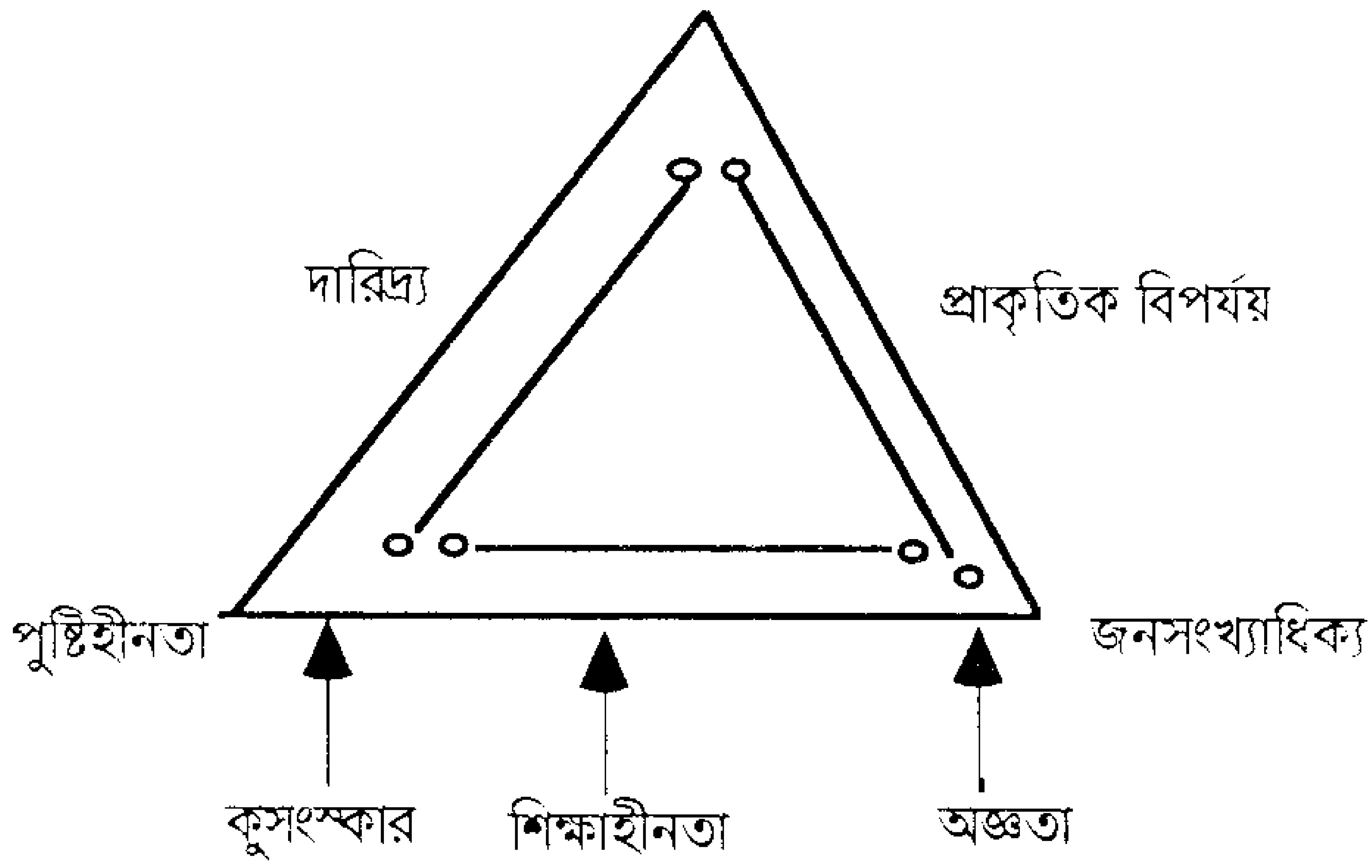

উপরোক্ত এই তিনটি ব্যাপার একটি প্রাণঘাতী ত্রিভূজ সমস্যার সৃষ্টি করে এবং ব্যাপারগুলো একটি অপরটির উপর প্রভাব বিস্তার করে। ১৯৫০ সালে এদেশে সংক্রামক রোগে মৃত্যুর দুই-তৃতীয়াংশ কারণ ছিলো ম্যালেরিয়া, কলেরা বা সান্নিপাতিক জ্বর, উদরাময় ও শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ। আজও এ অবস্থার তেমন কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটে নি। শিশু এবং পূর্ণবয়স্ক নির্বিশেষে ধনুষ্টংকার, উদরাময়, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগের শিকার হয় এদেশে। আসলে এদেশ জীবাণু, ভাইরাস, পরজীবি ও মাইকোটিক সংক্রমণ বিস্তারের এক সূতিকাগার। এছাড়া ৭০৫টি শিশুর উপর গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে ১০ থেকে ২০%-এর কোষভিত্তিক অনাক্রম্যতা হ্রাস (Cell Mediated Immune Deficiency) রয়েছে। স্বাভাবিক শিশুর তুলনায় এদের প্রায় ৫০% বেশি উদরাময় হয়। এইচআইভি সংক্রমণের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

বাংলাদেশে এইচআইভি বিস্তারের আরো কয়েকটি দিক

প্রাকবিবাহ যৌন সম্পর্ক

একটি গবেষণা চলিয়ে দেখা গেছে (Aziz *et al.*, ১৯৯৫) আমাদের দেশে প্রাকবিবাহ যৌন সম্পর্ক যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে। বিশেষত এটি নিম্নবিত্তদের মধ্যেই অধিক পরিলক্ষিত হয়। তাদের ৫০% জনই কোনো না কোনো সময় প্রাকবিবাহ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছে। Folmer *et al*, ১৯৯২ সালে পর্যবেক্ষণ করেছেন প্রাকবিবাহ যৌন কর্মে ব্যাপৃতদের মধ্যে মাত্র ২৯% কনডম্ ব্যবহার করে। একাধিক গবেষণায় (Islam and Money, ১৯৮৯ এবং Begum,

১৯৭৬) দেখা গেছে, বেশ কিছু অবিবাহিত মেয়ে প্রাকবিবাহ যৌন সম্পর্কের কারণে গর্ভপাতও ঘটায়।

বিবাহবহির্ভূত যৌন সম্পর্ক

১৯৯৩ সালে একটি গবেষণায় দেখা গেছে, দূরগামী ট্রাক চালকদের ৬০%–ই বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে। তা ছাড়া মেলোসিন (১৯৮১), ফোলমার (১৯৯২) পর্যবেক্ষণ করেছেন গ্রাম্য সমাজেই বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক বেশি।

সমকামিতা : মেলেনি ১৯৮১ সালে পর্যবেক্ষণ করেছেন এদেশে বিভিন্ন সামাজিক স্তরে সমকামিতা বেশ ব্যাপক হারে প্রচলিত।

বেশ্যাবৃত্তি : বাংলাদেশে প্রায় এক লক্ষ সামাজিক যৌনকর্মী (community sex worker) রয়েছে (Meloney *et al.*, ১৯৮১)। এরা সাধারণত অশিক্ষিত, তালাকপ্রাপ্তা বা স্বামী ছাড়া–ছাড়ি হয়ে যাওয়া মহিলা। এরা মূলত কোনো বেশ্যালয়ে থাকতে পারে বা ভ্রাম্যমান অবস্থায় বিরাজ করে (Khan *et al.*, ১৯৯২)।

এদের খদ্দের সাধারণত ব্যবসায়ী, ছাত্র, রিক্সাচালক, ট্রাকচালক ও বিদেশী ভ্রমণবিলাসী পর্যটক। পতিতাদের মাঝে সিফিলিস, গনোরিয়া, ক্ল্যামাইডোসিস, ট্রাইকোমনিয়াসিস, হার্পিস, শ্যাংকরয়েড প্রভৃতি যৌনরোগ বিদ্যমান।

বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় কম হলেও এদেশে এ রোগ বিস্তারের সহায়ক বেশ কিছু ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় আছে যথা :

* যৌনবাহিত রোগের আধিক্য;
* কম মাত্রায় কনডম ব্যবহার;
* শিরাভ্যন্তরে মাদক গ্রহণকারীদের ভাগাভাগি করে একই সুঁচ ব্যবহারের আধিক্য;
* একই যৌনকর্মীর একাধিক খদ্দের (এশিয়ার সবচেয়ে বেশি);
* এইচআইভি/এইডস বিষয়ে অজ্ঞতা;
* পাশ্ববর্তী দেশগুলোতে এইচআইভি সংক্রমণের আধিক্য;
* জনসংখ্যার স্থানিক পরিযান (বিদেশে বা শহর থেকে গ্রামে বা গ্রাম থেকে শহরে পরিযান বা গমন)
* পতিতালয়গুলোতে উপযুক্ত স্বাস্থ্য সেবা ও রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকা।
* উচ্চবিত্তের লোকের ঘন ঘন ভারত, থাইল্যান্ড ও অন্যান্য এইচআইভি বহুল দেশে প্রমোদ ভ্রমণ, কিন্তু দেহে এইচআইভি, হেপাটাইটিস–বি, সি বা অন্য রক্তবাহিত রোগ বহন করেন কি–না জানবার ব্যবস্থা না থাকা।
* পেশাদার রক্তদাতার পরিমাণ ৮০%।

উপরোক্ত কারণসমূহের জন্য বাংলাদেশ এইডস–এর মরণ থাবার আয়ত্বে। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এখানে এইচআইভি খুব সহজেই বিস্তার লাভ করতে সক্ষম। কারণ এর তিনদিকে রয়েছে ভারত এবং একপাশে মায়ানমার। প্রতিবেশী এ দুটি দেশেই এইচআইভি–এর উপস্থিতি মারাত্মক।

ওয়ার্লড ভিশন বাংলাদেশ–এর সমীক্ষা অনুযায়ী (World Vision Bangladesh Annual Report October 2000, September 2001) অনুযায়ী ২০০০ সালের শেষে

পৃথিবীতে এইচআইভি নিয়ে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ৩৬.১ মিলিয়ন। এর দুই-তৃতীয়াংশই থাকে আফ্রিকাতে। প্রায় ১.৮ মিলিয়ন বা তার চেয়ে বেশি লোক এইডস-এর ফলে মৃত এবং তারও এক চতুর্থাংশেরও বেশি হলো শিশু। দক্ষিণ এশিয়াতেও এইডস ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক পর্যায়ে আছে ভারত এবং থাইল্যান্ড। পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই সবচেয়ে বেশি এইচআইভি আক্রান্ত বা এইডস রোগী রয়েছে। ভারতে এদের সংখ্যা ৩,৭০০,০০০ এরও বেশি।

ভারত সরকার ২০০২-এর মার্চ মাসে ঘোষণা দিয়েছিলেন দেশে ৩৯ লাখ ৭০ হাজার লোকের মধ্যে এইচআইভি আছে। একটি মার্কিন গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী রোধ না করলে ২০১০ সালে আড়াই কোটি ভারতীয় এইচআইভিতে আক্রান্ত হবে। ভারতের সাথে বাংলাদেশের সহজ যোগাযোগ তথা থাইল্যান্ড ও নেপালে (সেখানেও এইডস মারাত্মক) আমাদের দেশের লোকদের নানা কারণে ঘন ঘন যাতায়তের ফলে এদেশে এ মারাত্মক রোগ দ্রুত বিস্তারের ঝুঁকি অনেক। সরকারিভাবে ১৯৮৯ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে এইডস রোগীর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী আমাদের দেশে ১লা ডিসেম্বর ২০০২ পর্যন্ত ২৪৮ জন এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তি পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে ২৬ ব্যক্তি এইডস-এ ভুগছেন এবং ২০ জন এরই মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন। তবে বেশিরভাগই যক্ষ্মাক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। (তথ্যসূত্র : মেজর জেনারেল এ.এস.এম. মতিউর রহমান, চেয়ারম্যান, টেকনিক্যাল কমিটি জাতীয় এইডস কমিটি বাংলাদেশ)।

কিন্তু বেসরকারিভাবে এ সংখ্যা অনেক বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে ২০০১-এর শেষ পর্যন্ত ১৩,০০০ বাংলাদেশী এইচআইভি আক্রান্ত। বাংলাদেশে এ রোগ ধীরগতিতে বাড়ছে। তার একমাত্র কারণ এখানকার জনগণের ধর্মীয় চেতনা। তবে যে হারে মাদকাসক্ত (সুঁচের মাধ্যমে), যৌনকর্মী, অসম্পূর্ণ পরীক্ষিত রক্ত সঞ্চালন তথা স্যাটেলাইট টেলিভিশন ও পর্যটনের বিস্তারের ফলে লোকের মন-মানসিকতা পরিবর্তিত হয়ে বহুগামীতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে তাতে আমাদের দেশে অচিরেই আশঙ্কাজনকভাবে এ রোগ বেড়ে যেতে পারে। তাই এখন এ থেকেই কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য ১৯৯৭ সালে সরকার এইচআইভি/এইডস এবং যৌনরোগ সম্পর্কে জাতীয় নীতিমালা অনুমোদন করেছে। বর্তমানে দেশের বহু স্থানেই এইচআইভি আছে কি-না পরীক্ষা করে জানা যায় যথা :

১। ভাইরোলজি বিভাগ, স্নাতকোত্তর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়।
২। ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ।
৩। আর্মড ফোর্সেস ইনস্টিটিউট অব প্যাথলজি।
৪। প্যাথলজি বিভাগ, চট্টগ্রাম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়।
৫। প্যাথলজি বিভাগ, ওসমানী চিকিৎসা মহাবিদ্যায়, সিলেট।

অন্যান্য হাসপাতালের তালিকা এইডস ও নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন শিরোনামের অধীনে দেয়া আছে।

একবিংশ অধ্যায়

বাংলাদেশ এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রম

বাংলাদেশ তথা বিশ্বে প্রতি ১লা ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস পালন করা হয়। বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস-এর সংক্রমণ এখনও আশংকাজনক নয়। কিন্তু তাতে আত্মতুষ্টির কোনো অবকাশ নেই। এইডস সম্পর্কে জনগণের বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সচেতনতার খুবই অভাব রয়েছে। বরং স্যাটেলাইট চ্যানেলের আকাশ সংস্কৃতি, ব্যবসা ও চাকরি উপলক্ষে জনগণের অতিমাত্রায় প্রবাস যাত্রা অযথা ক্রমান্বয়ে ধর্মে আস্থাহীনতা ইত্যাদির ফলে ঝুঁকিপূর্ণ জীবনযাপনের প্রবণতা অনেক বেড়ে গেছে। তার পাশাপাশি রয়েছে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে এইডস-এর ব্যাপক বিস্তার তথা এসব দেশে ক্রমবৃদ্ধিহারে অবাধ যাতায়াত এবং বিনোদন ভ্রমণ। ফলে যে-কোনো সময় এইচআইভি/এইডস আমাদের দেশেও বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য বাংলাদেশের সরকারি সূত্র মতে ২০০২ সালে ৩৬টি নতুন এইচআইভি/এইডস রোগী সনাক্ত করা হয়েছে এবং এ নিয়ে মোট রোগাক্রান্তদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৪৮। এ বছর বিশ্বে প্রায় ৫০ লক্ষ লোক এইচআইভি দিয়ে সংক্রমিত তথা ৩১ লক্ষ লোক এইডস-এর ফলে মারা যাবে বলে আশংকা প্রকাশ করেছেন UNAIDS তথা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (The New Today, ১.১২.২০০২)। ১৯৮১ থেকে ২২ বছরে বিশ্বে ৩ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়েছে এ রোগে।

বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে কি হারে এ রোগ বিস্তার লাভ করেছে তার আভাস পাওয়া যাবে নিচের সারণিতে :

নভেম্বর ২০০২ পর্যন্ত এইচআইভি ভাইরাস বহনকারীর বছরভিত্তিক সংখ্যা (যুগান্তর ১/১২/২০০২)

সাল	পুরুষ	নারী	মোট সংখ্যা
১৯৮৯	১	–	১
১৯৯০	৩	–	৩
১৯৯১	৭	২	৯
১৯৯২	৯	২	১১
১৯৯৩	১৯	৪	২৩
১৯৯৫	৩৭	৯	৪৬
১৯৯৬	৬০	১৫	৭৫
১৯৯৭	৭৭	১৭	৯৪
১৯৯৮	৮৮	১৮	১০৬

সাল	পুরুষ	নারী	মোট সংখ্যা
১৯৯৯	১০৪	২২	১২৬
২০০০	১২৭	৩০	১৫৭
২০০১	১৫৩	৩৫	১৮৮
২০০২	১৭৬	৪৩	২১৯

দেশে এইচআইভি সংক্রমণের তালিকায় ঢাকার স্থান সবার উপরে। ঢাকা জেলাতে এ পর্যন্ত ২২ জনের দেহে এ ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর পরেই রয়েছে চট্টগ্রামের স্থান। চট্টগ্রামে ২১ জনের দেহে এ ব্যাধি ধরা পড়েছে। তৃতীয় অবস্থানে আছে গাজীপুর। গাজীপুরে ১২ জনের রক্তকোষে এইচআইভি পাওয়া গেছে।

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে বাংলাদেশে যেসব ব্যাপারে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

* ১৯৮৫ সালে প্রথম জাতীয় এইডস কমিটি গঠন।
* জাতীয় এইডস কমিটি এবং এইডস/এসটিডি প্রোগ্রামে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্তকরণ।
* ৫৫০০০ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মী, গার্লস গাইড, বয়স্কাউট, সাংবাদিক ৬৪ জেলার মসজিদের ইমাম, স্কুল, মাদ্রাসার শিক্ষক গ্রাম্য মাতব্বর জনপ্রতিনিধিসহ মোট ৮০০০ ব্যক্তিকে এইডস বিষয়ে জ্ঞাতকরণ।
* রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ট্রেনারদের ট্রেনিং।
* সারাদেশে এইডসবিষয়ক বার্তাসহ ছয় শতাধিক রঙিন বিলবোর্ড স্থাপন।
* বাংলাদেশ বেতার টেলিভিশন ও ডাবল ডেকার বাসে এইডসবিষয়ক প্রচারণা।

এইডস রোগীদের প্রতি সামাজিক অপবাদ ও বৈষম্য পরিহার করুন।

এইডস ও নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন

এইডস ছাড়াও রক্তবাহিত আরো রোগ আছে যথা, হেপাটাইটিস বি এবং সি, উপদংশ (সিফিলিস), ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ফাইলেরিয়া ইত্যাদি। এইচআইভিসহ রক্তবাহিত সংক্রমণের ব্যাপক আশংকা থেকে কৌশলগতভাবে মুক্ত থাকাই সুস্থ থাকার একমাত্র পথ। রক্তভরণের মাধ্যমে শতকরা ৯৯ ভাগের অধিক ক্ষেত্রে এইচআইভি আক্রান্ত হওয়ার ভয় থাকে। এখানেই নিরীক্ষিত (screening) নিরাপদ রক্ত প্রদানের গুরুত্ব নিহিত। রক্ত দেয়ার আগে তাই আদর্শগতভাবে কতোগুলো পরীক্ষা (স্ক্রিনিং) করা উচিত যথা — এইচআইভি, ভিভিআরএল, এইচবিভি, এইচসিভি এবং এমপি। এসব পরীক্ষার ফলাফল না-বোধক হলেই রক্তকে নিরাপদ বা পরিসঞ্চালনের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। এইচআইভি ও যৌনবাহিত রোগ প্রতিরোধকল্পে দেশে ৯৭টি কেন্দ্র রয়েছে যেখানে নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় এদের নাম উল্লেখ করা হলো —

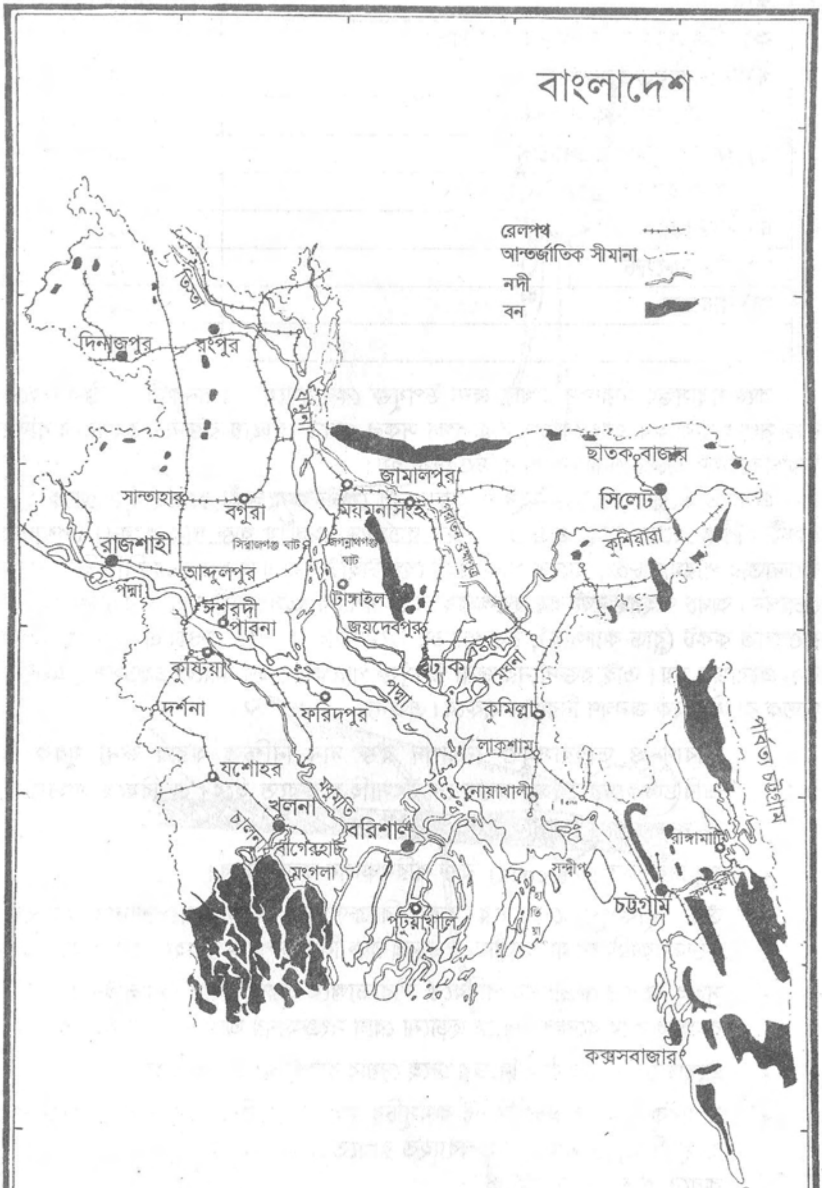
বাংলাদেশ
রেলপথ
আন্তর্জাতিক সীমানা
নদী
বন
দিনাজপুর
রংপুর
ছাতক বাজার
জামালপুর
সিলেট
সান্তাহার
বগুড়া
ময়মনসিংহ
রাজশাহী
সিরাজগঞ্জ ঘাট
কুশিয়ারা
আব্দুলপুর
পদ্মা
টাঙ্গাইল
ঈশ্বরদী
পাবনা
জয়দেবপুর
ঢাকা
মেঘনা
কুষ্টিয়া
দর্শনা
ফরিদপুর
কুমিল্লা
লাকশাম
পার্বত্য চট্টগ্রাম
যশোহর
নোয়াখালী
খুলনা
বরিশাল
বাগেরহাট
রাঙ্গামাটি
মংলা
সন্দ্বীপ
চট্টগ্রাম
পটুয়াখালি
কক্সবাজার

বাংলাদেশের মানচিত্র

স্থান	সংখ্যা
ক) চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতাল	১৩
খ) বিশেষায়িত হাসপাতাল	০৫
গ) সমন্বিত সামরিক হাসপাতাল	১৩
ঘ) অন্যান্য বৃহৎ হাসপাতাল	১০
ঙ) জেলা হাসপাতাল	৫৩
চ) বিডিআর	০১
ছ) রেড ক্রিসেন্ট	০১
জ) বারডেম	০১
	৯৭

রক্ত যথাসম্ভব নিরাপদ রাখার জন্য উপযুক্ত কেন্দ্রসমূহে রক্তদানকারী ব্যক্তিবর্গ হতে রক্ত সংগ্রহ করা হয় এবং কেন্দ্রগুলোর লক্ষ্য সকল ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় রক্তদান তৎপরতা বৃদ্ধি। নিরাপদ রক্তদাতাদের শনাক্তকরণ কার্ডও দেয়া হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে রক্তদানের যোগ্য জনগোষ্ঠী রয়েছে ২.০ থেকে ২.৫ কোটি। কিন্তু এদের মধ্যে মাত্র ০.৪% জন বর্তমানে স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন। পেশাদার রক্তদাতার পরিমাণ ৮০%, যাদের ২৯%-এরই হেপাটাইটিস বি এবং ২২%-এর সিফিলিস রোগে ভোগেন। অথচ অহরহ দুর্ঘটনায় রক্তক্ষরণ, অস্ত্রোপচার, প্রসবকালীন অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ, রক্তজাত কর্কট (ব্লাড ক্যান্সার), রক্তশূন্যতা, হিমোফিলিয়া, পুড়ে যাওয়া এসব ক্ষেত্রে প্রচুর রক্ত প্রয়োজন হয়। তাই রক্তদানের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এইডসসহ অন্যান্য ঘাতক ব্যাধি থেকে জনগণ নিরাপদ থাকবে। এজন্য—

* জীবাণু ও ভাইরাসমুক্ত নিরাপদ রক্ত দান নিশ্চিত করার জন্য যুবক ও অবিভাবকদের স্বেচ্ছা-রক্তদানে উৎসাহিত করতে হবে। এ বিষয়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা কর্তব্য।
* শুধু নিরীক্ষিত (screened) রক্ত পরিসঞ্চালন করতে হবে।
* উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ পেশাদার রক্ত, বিক্রেতাদের বাদে অপেশাদার স্বেচ্ছায় রক্তদানকারীদের বা আত্মীয়-স্বজনের রক্ত নিরীক্ষাপূর্বক ব্যবহার করতে হবে।
* সম্ভব হলে রক্তভরণের পরিবর্তে শিরাভ্যন্তরে তরল পদার্থ (স্যালাইন ইত্যাদি) ব্যবহার করে রক্তের মাধ্যমে ছড়ানো রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা হ্রাস করতে হবে।
* প্রয়োজনে নিজের রক্ত নিজের দেহে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
* নাগরিক ফোরাম এবং নির্দিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ, তদারকি, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সচেতনতা অব্যাহত রাখতে হবে এবং ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ সনাক্ত করতে হবে।
* পেশাদার রক্ত দাতাদের সর্বদা নিরুৎসাহ করতে হবে এবং আইন প্রণয়নের মাধ্যমে রক্তের বেচা-কেনা বন্ধ করতে হবে।

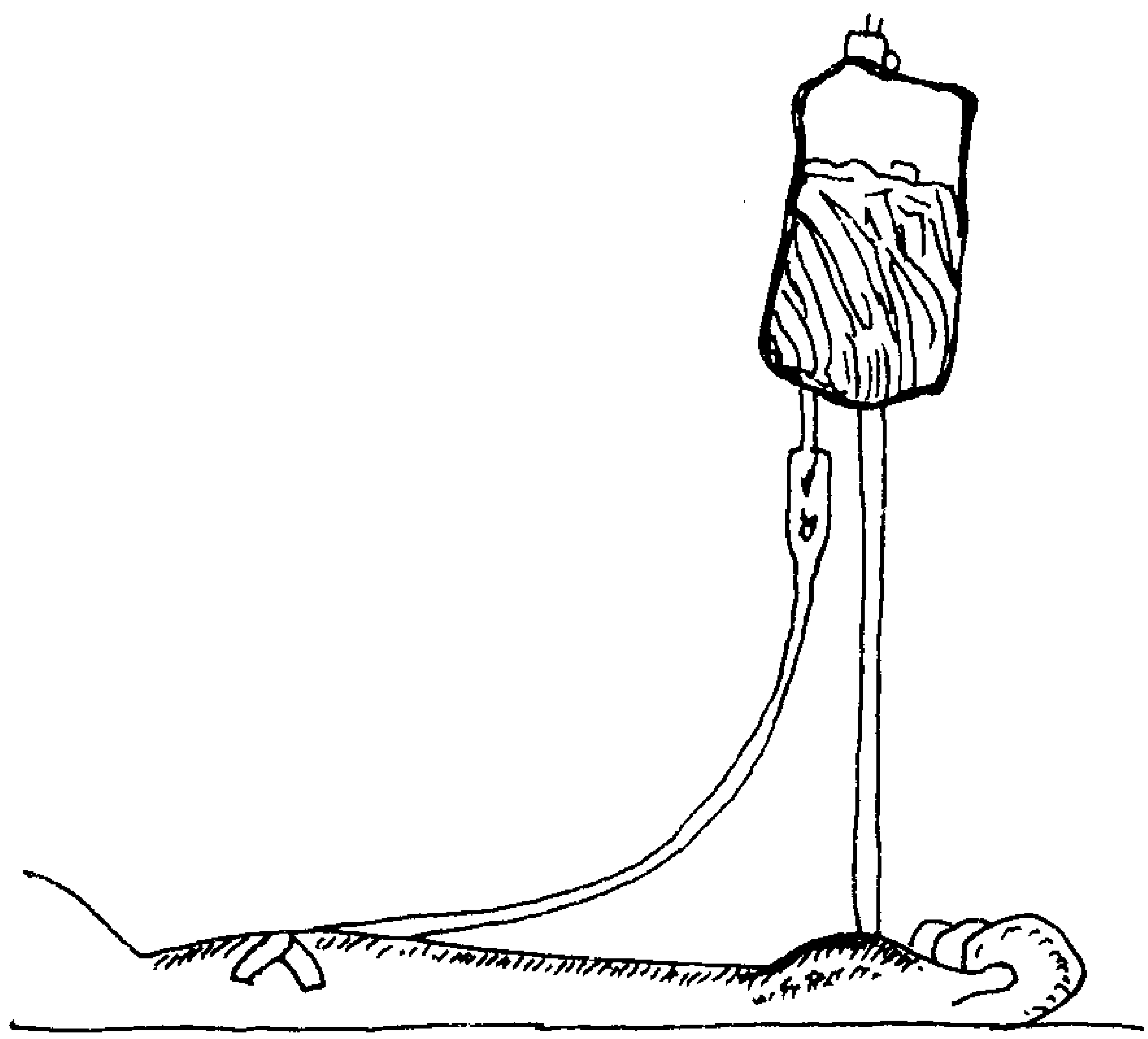

পেশাদার রক্তদাতাদের কাছ থেকে রক্ত গ্রহণ অনুচিত

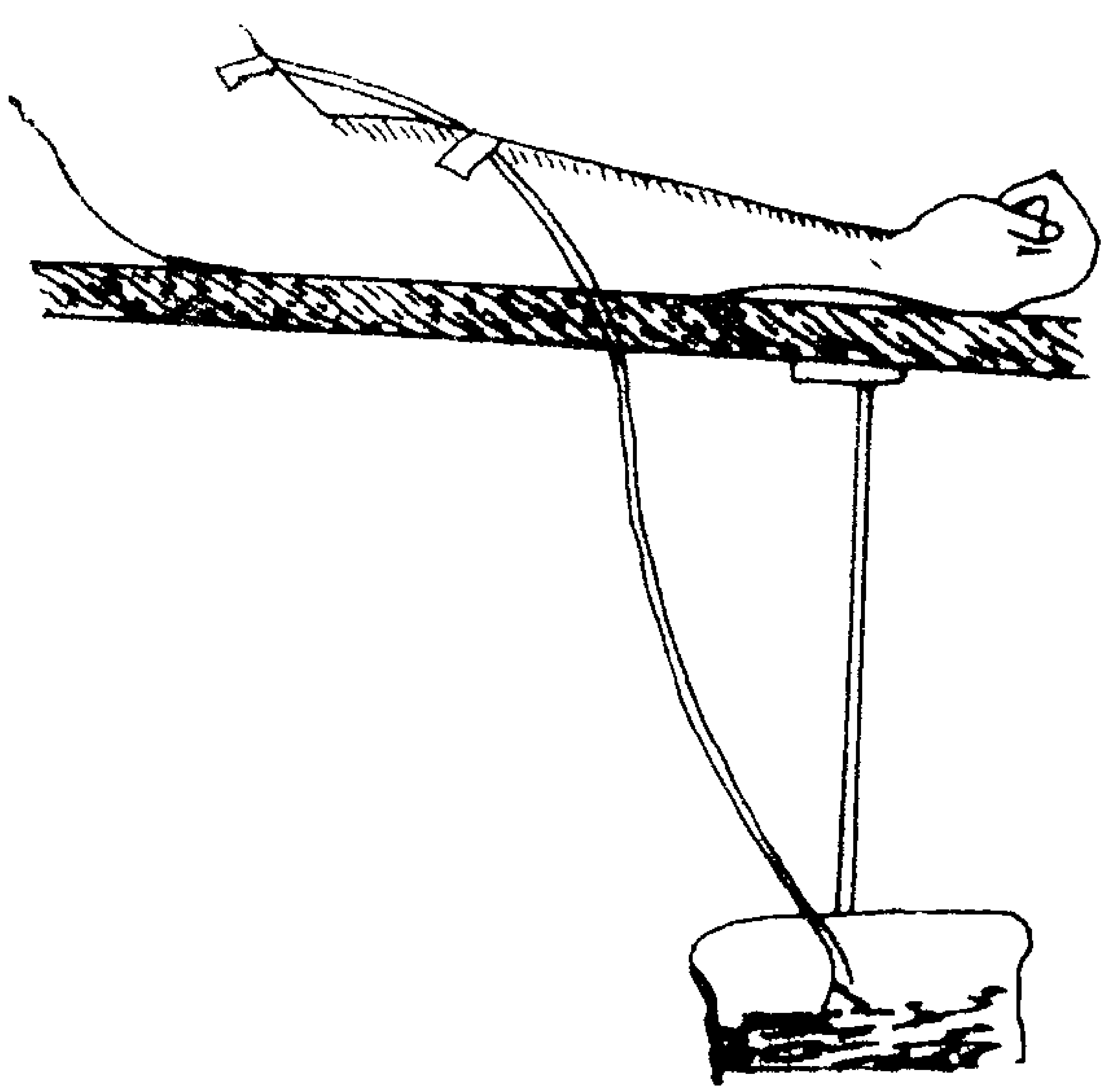

নিরাপদ ও পরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে রক্ত গ্রহণ করলে এইডস থেকে রক্ষা পাওয়া যায়

মনে রাখতে হবে

১	লোহিত রক্ত কণিকা রক্ত দেহে মাত্র ৯০ – ১২০ দিন বাঁচে।
২	এরপর রক্ত কণিকার মৃত্যু হয় এবং নতুন রক্ত কণিকা তৈরি হয়।
৩	তাই প্রতি ৪ মাস অন্তর রক্ত দিলে দেহে রক্ত কমে না।
৪	রক্তদানের বয়স ১৮ – ৫৮ বৎসর
৫	প্রতি ব্যাগে রক্তের পরিমাণ ৩৫০ – ৪০০ মিলি।
৬	রক্ত প্রদানের মাধ্যমে ৯৯%–এর বেশি ক্ষেত্রে এইচআইভি সংক্রমণের ভয় থাকে। তাই রক্ত গ্রহণের পূর্বে রক্ত দাতার রক্তে এইচআইভিসহ ভিডিআরএল, এইচবিভি, এইচসিভি এবং এমপি–এর উপস্থিতি পরীক্ষা করে জেনে নিতে হবে অর্থাৎ রক্ত স্ক্রিনিং করতে হবে। কেবল এভাবেই নিরাপদ রক্ত পাওয়া যেতে পারে।
৭	পেশাদার রক্তদাতাকে নিরুৎসাহিত করতে হবে।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

এইচআইভি সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে কিছু তথ্য

পরিবার পরিকল্পনা ও এইডস

পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের কাজকে শুধু পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সীমিত না রেখে যৌনব্যধি তথা এইচআইভি সংক্রমণ রোধ সংক্রান্ত কাজেও বিস্তৃত করা যেতে পারে। কারণ পরিবার পরিকল্পনা কর্মীরাই এ রোগ সম্পর্কে সঠিক উপদেশ দিতে পারেন। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরিবার পরিকল্পনার বহু দপ্তর আছে, সুতরাং তাদের এ ভূমিকা খুবই কার্যকরী হবে।

পুরুষ ও মহিলাদের কনডম

মহিলাদের কনডম একটি নরম স্বচ্ছ পলিইউরেথ্রিন আবরণ যা সঙ্গমের পূর্বে যোনিতে ঢুকিয়ে দিতে হয়। পুরুষের কনডম অনেকটা বেলুনের মতো, যা শিশ্নে পরিধান করতে হয়। তবে পুরুষের কনডমের চেয়ে মহিলাদের কনডমের মূল্য বেশি বলে অনেকক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে। পুরুষ ও মহিলাদের কনডম শুধু জন্মনিয়ন্ত্রণই নয়, এইচআইভি সংক্রমণ ও অন্যান্য যৌন রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম। এইডস নিয়ন্ত্রণের জন্য থাইল্যান্ডের সরকার তাই পতিতালয়ে ১০০% কনডম ব্যবহার করার নীতি প্রচলন করেছেন। আমাদের দেশেও এ নিয়ম থাকা উচিত। মহিলাদের জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত ডায়াফ্রাম ও সারভাইকাল ক্যাপ কিন্তু এইডস রোধ করতে অক্ষম যদিও তা বেশ কিছু যৌন রোগ থেকে বাঁচায়। তবে স্পঞ্জ, ফেনা বড়ি ইত্যাদিসহ অন্যান্য জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এইডস নিয়ন্ত্রণে তেমন কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখে না।

মা-শিশু সংক্রমণ প্রতিরোধ

উল্লম্ব (vertical) সংক্রমণ বা মা-শিশু সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায় হলো সাবধানতামূলক মা ও শিশুকে রেট্রোভাইরাসবিরোধী ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা এবং প্রসব ও স্তন্যদানকালে মা ও শিশুর সংশ্রব (exposure) হ্রাস করা।

ওষুধ চিকিৎসা

ওষুধ চিকিৎসা দিয়ে একটি গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে, যারা ওষুধ চিকিৎসার সাথে স্তন্যপান চালিয়ে যায় তাদের ক্ষেত্রে মা-শিশুর সংক্রমণ ৩৭% কমানো সম্ভব হয়েছে তবে যারা ওষুধের সাথে স্তন্যপানও বন্ধ রেখেছে তাদের ক্ষেত্রে সংক্রমণ ৫০% হ্রাস পেয়েছে।

মা-শিশু সংক্রমণ হ্রাস করার জন্য Nevirapine ব্যবহার হচ্ছে। নেভিরাপিন শুধু যে বেশি কার্যকর তা নয়, জিডোভুডিন-এর চেয়ে তার চিকিৎসাকাল সংক্ষিপ্ত, দামে সস্তা ও সহজ ব্যবহারযোগ্য। পরবর্তী পৃষ্ঠায় এসব ওষুধ ব্যবহারের নিয়ম দেয়া হলো :

Dhaka

জিডোভুডিন

রোগীর ধরন	মাত্রা
গর্ভবতী মহিলা	৬০০ মিলিগ্রাম প্রসব ব্যথা উঠলে সেবন এবং ৩০০ মিলিগ্রাম প্রতি ৩ ঘন্টা অন্তর শিশু জন্ম না হওয়া পর্যন্ত।
নবজাতক	৪ মিলিগ্রাম/কেজি দিনে দুবার ১ সপ্তাহ পর্যন্ত, সেবন।

নেভিরাপিন

রোগীর ধরন	মাত্রা
গর্ভবতী মহিলা	২০০ মিলিগ্রাম প্রসবকালে সেবন করতে হবে।
নবজাতক	২ মিলিগ্রাম/কেজি একমাত্রা জন্মের তিনদিনের মধ্যে সেবন করতে হবে।

অনেক গবেষক যেসব এলাকায় অতিমাত্রায় এইডস বিদ্যমান সেখানে সকল গর্ভবতীকে প্রসবকালে নেভিরাপিন দেওয়ার পরামর্শ দেন।

প্রসব ব্যথা ও প্রসবকালে যত্ন

প্রসব ব্যথা ও প্রসবকালে সঠিক যত্ন নিলে এইচআইভি দূষিত যোনির নিঃসরণ (vaginal secretions) ও এইচআইভি দূষিত রক্তের সাথে নবজাতকের সংস্রব (exposure) কমে ঘটে, ফলে আক্রান্ত হবার আশঙ্কা হ্রাস পায়। প্রসব ব্যথা ও প্রসবের সময় স্বাস্থ্য কর্মীরা সাধারণত রোগিনীর যেসব যত্ন নেয়, নিচে সেগুলো বর্ণিত হলো। এইচআইভি সংক্রমণ হ্রাসে এসব পদ্ধতি এক এক ধরনের ভূমিকা পালন করে। যেমন —

১। **যোনি ধৌতকরণ :** শিশু জন্মের পূর্বে যোনি ধৌত করলে সাধারণ সংক্রমণ কিছু কমলেও গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে এইচআইভি সংক্রমণ তাতে হ্রাস পায় না।

২। **যোনির নিঃসরণ ও এইচআইভি দূষিত রক্তের সাথে শিশুর সংশ্রব হ্রাস :** এর ফলে সংক্রমণ হ্রাস করবে।

৩। **গর্ভথলির আবরণ কর্তন** (amniotomy) : প্রসব সহজ করলেও সংক্রমণের আশঙ্কা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।

৪। **যেনিদ্বার কর্তন** (episiotomy) : এই প্রক্রিয়ায় প্রসব প্রক্রিয়া অনেকাংশে সহজতর হয়, তবে এইচআইভি সংক্রমণের আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। তাই এইচআইভি দূষিত রোগীর ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত নয়।

৫। **নির্বাচিত সিজারিয়ান অস্ত্রোপচার** (selective ceaeserian) : এ পদ্ধতিতে সম্ভাব্য জন্ম তারিখের কিছু আগেই তলপেট ও জরায়ু কেটে নবজাতককে বের করা হয়। এইচআইভি সংক্রমণ হ্রাস করার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বেশ ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে গবেষণা চালিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, নির্বাচিত সিজারিয়ান অপারেশনে জরায়ু কেটে সন্তান বের করা হলে সংক্রমণ হার নিঃসন্দেহে অনেকাংশে হ্রাস করা যেতে পারে।

স্তন্যদান ও এইচআইভি

আগেই বলা হয়েছে, স্তন্যপান মায়ের দেহ হতে শিশুর দেহে এইচআইভি সংক্রমণ ছড়াতে সক্ষম অথচ মায়ের দুধ না খেলেও শিশুর স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতিসাধিত হতে পারে। এইচআইভি সংক্রমিত মায়ের ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কিছু নীতিমালা গ্রহণ করার ব্যাপারে নীতিগতভাব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যেমন —

* সামর্থ্য থাকলে মায়ের দুধের পরিবর্তে কৌটার দুধ বা গরু বা অনুরূপ প্রাণীর দুধ খাওয়াতে হবে।
* মাত্র প্রথম ৩ থেকে ৬ মাস বুকের দুধ খাওয়ানো যেতে পারে।
* স্তন চেপে বুকের দুধ বের করে পাত্রে গরম করলে এইচআইভি মরে যাবে তখন তা কাপে ঢেলে চামচ দিয়ে (বোতল ব্যবহার না করে) পান করাতে হবে।
* অন্যথায় একজন সুস্থ ধাত্রী মা রাখতে হবে যে নিজের বুকের দুধ নবজাতকের খাওয়াবে।

মা-শিশু সংক্রমণ কমাতে করণীয়

	করণীয়	আরো গবেষণা প্রয়োজন
গর্ভাবস্থায় বা প্রসবপূর্বে (Anteparrum)	১। গর্ভপাত ২। জন্মের আগে থেকে জন্মের পর পর্যন্ত AZT (জিডোভুডিন) দেয়া। ৩। নাভিরজ্জু-রস পরীক্ষা (cordocentesis), গর্ভথলির রস পরীক্ষা (aminocentesis), গর্ভফুলের জীবিত কোষ পরীক্ষা (placental biopsy) এড়িয়ে চলা।	১। রেট্রোভাইরাসরোধী সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা : AZT অথবা একযোগে AZT ও 3TC ২। খাদ্যপ্রাণ এ দেওয়া ৩। শিরাভ্যন্তরে হাইপারইমিউন ইমিউনোগ্লাবিউলিন (HIVIG) দিয়ে পরোক্ষ টিকা ৪। প্রত্যক্ষ টিকা
প্রসবকালে (Intrapartum)	১। নির্বাচিত সিজারিয়ান অস্ত্রোপচার ২। শিশুব মাথার তালু থেকে রক্ত পরীক্ষা বা সেখানে ইলেক্ট্রোড বসানো এড়িয়ে চলা। ৩। দীর্ঘ-প্রসব বা দীর্ঘক্ষণ হতে গর্ভথলির আবরণ বিদারণ এড়িয়ে চলা ৪। নিয়মাফিক যোনিদ্বার কর্তন (Routiue episiotomies) বর্জন।	১। কেবল প্রসবকালে AZT বা AZT/3TC দিয়ে চিকিৎসা ২। যোনি বীজাণুমুক্তকরণ (ক্লোরডো হেক্সিডিন বা বেঞ্জাইলকোনিয়াম ক্লোরাইড)
প্রসবোত্তর (postpartum)	১। ভালো গুঁড়ো দুধ খাওয়ানো সম্ভব হলে স্তন্যপান বর্জন ২। স্তন্যদানকালীন ঝুঁকিগ্রস্ত এইচআইভি অনুপস্থিত মহিলাদের কনডম ব্যবহার	১। মা ও শিশুকে সন্তান জন্মের পর রেট্রোভাইরাস বিরোধী চিকিৎসা ২। শিশুকে শিরাভ্যন্তরে হাইপার-ইমিউন গ্লোবিউলিন দান। ৩। শালদুধ (colostrum) ফেলে দেয়া।

মনে রাখতে হবে

* গর্ভাবস্থায় বা প্রসব পূর্বে, প্রসবকালে বা প্রসবোত্তরকালে মা থেকে শিশুকে এইচআইভি–১ সংক্রমিত হতে পারে।
* প্রসব পূর্বে ও প্রসবকালে মাকে এবং পরবর্তীতে শিশুকে জিডোভুডিন দিলে সংক্রমণ লক্ষ্যণীয়ভাবে হ্রাস পায়।
* সম্ভব হলে প্রসবকালে দেহভ্যন্তরস্থ পরীক্ষা–নিরীক্ষা, ফিটাল মনিটরিং এড়াতে হবে।
* নির্বাচিত সিজারিয়ান অস্ত্রোপচার সংক্রমণ কমায়।
* স্তন্যপান করলে শিশুর দেহে সংক্রমণের আশঙ্কা ১৫% ভাগ বেড়ে যায়। সম্ভব হলে মাতৃ স্তনের বদলে ভালো গ্রহণযোগ্য গুঁড়ো দুধ দিতে হবে।

খৎনাকরণ বনাম এইচআইভি

১৯৮৯ সাল থেকে একটি গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। এতে দেখা গেছে, খৎনা (circumcision) করা পুরুষের খৎনা না করা পুরুষ থেকে তুলনামূলকভাবে কম এইচআইভি সংক্রমণ হয়। আফ্রিকার নিম্ন সাহারা অঞ্চলে নিরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, খৎনা না করা পুরুষের খৎনা করা পুরুষের চেয়ে এইচআইভি সংক্রমণ দ্বিগুণ বেশি। সম্ভবত এর কারণ খৎনা না করা লোকের লিঙ্গাগ্রের ত্বক (prepuce) সহজেই ক্ষত (ulcers) ও ফাটল (fissures) যুক্ত যৌনরোগের শিকার হয়। তাই অনায়াসেই এইচআইভি দিয়ে আক্রান্ত হতে পারে। সুতরাং এইচআইভি বিরাজমান এলাকায় জাতি–ধর্ম–নির্বিশেষে সবারই খৎনা করা উচিত বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত প্রকাশ করেন।

বীজঘ্ন বা অ্যান্টিবায়োটিক

কতোগুলো অণুজীবঘাতক (Microbicides) নিয়ে পরীক্ষা চালানোর হচ্ছে। এগুলো মলমের মতো যোনির ভিতরে লাগালে এইচআইভি সংক্রমণ এবং যৌনব্যাধির আক্রমণ ঠেকানো যায়। শুক্রাণুঘাতক জেলি দিয়েও এরকম প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। তবে এখনো নির্ভরযোগ্য তেমন কিছু বা ফলাফল পাওয়া যায় নি।

আচরণ পরিবর্তন

এইচআইভি সঠিকভাবে রোধ করতে হলে জনসাধারণের আচরণগত পরিবর্তন (behavior change) প্রয়োজন অর্থাৎ

* ধর্মীয় বিধির বাইরে যৌনক্রিয়া করা চলবে না;
* শিরায় ওষুধ গ্রহণের সময় সর্বদা জীবাণুমুক্ত নতুন সূঁচ ব্যবহার করতে হবে;
* রক্ত ও প্লাজমা গ্রহণের সময় এইচআইভি মুক্ত কি–না তা নিশ্চিত করা উচিত;
* এইচআইভিযুক্ত রোগিনীর প্রসব ও স্তন্যদানকালে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে ইত্যাদি।

টিকা

একমাত্র টিকা দিয়েই এইডস সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব। ক্যালিফোর্নিয়ায় এমারিভিলে অবস্থিত চিলর কর্পোরেশনের বিজ্ঞানী তুসান বার্নেট ১৯৮৮ সালে সর্বপ্রথম সফলভাবে দশটি বেবুনের দেহে এইচআইভি প্রবেশ করিয়ে টিকা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন।

প্রথম এইচআইভিবিরোধী টিকা নিয়ে গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর ১২ বছর কেটে গেছে কিন্তু এখনো কোনো যথার্থ টিকা খুঁজে পাওয়া যায় নি। এর প্রধান সমস্যা হলো এইচআইভি-র অনেক উপশ্রেণী (subtrypes) তথা বিরাট ভৌগোলিক সীমা রয়েছে। ফলে এক উপশ্রেণীর বিরুদ্ধে কার্যকর টিকা অন্য উপশ্রেণীর বিরুদ্ধে তেমন ফলপ্রসূ হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপে বিদ্যমান বি উপশ্রেণীর (subtype B) যে বিরুদ্ধে টিকা কাজ করবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারতে বিদ্যমান সি উপশ্রেণীর (subtype c) ভাইরাসের বিরুদ্ধে ঠিক কাজ করবে না। আমেরিকার জাতীয় স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান (U. S. National Institution of Health) এবং আন্তর্জাতিক এইডস টিকা উদ্যোক্তা (International AIDS Vaccine Inistitiue - IAVI) এ ব্যাপারে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। একদিন হয়তো সার্থক এইচআইভিবিরোধী টিকা আবিষ্কার করে নতুন আশার বাণী শোনাতে পারবে পৃথিবীকে। টিকা তৈরির জন্য বিশ্বব্যাপী যেসব পদার্থ ব্যবহৃত হচ্ছে, নিচে তা উল্লেখ করা হলো —

* মৃত সম্পূর্ণ ভাইরাস
* এইচআইভি উপশ্রেণী (জি.পি. ১৬০, জি.পি. ১২০)
* ভাইরাসের ভেক্টরে এইচআইভি উপশ্রেণী (যথা, এইচআইভি/ভেক্সিনিয়া রিকম্বিন্যান্ট)
* সিডি ৪-এর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষিকা

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

এইচআইভি সংক্রমণ ও মানসিক সমস্যা

এইচআইভি সংক্রমণ বিশ্বব্যাপী যত বেশি ছড়িয়ে পড়ছে ততই এ রোগজনিত নিত্য নতুন সমস্যা চিকিৎসক সমাজে প্রতিভাত হচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো মানসিক সমস্যা। এ সমস্যা আবার রোগের স্তর, রোগের বিন্যাস (পায়ূকাম, সমকাম, বহুগামীতা, দূষিত রক্ত সঞ্চালন, মা-শিশু সংক্রমণ), রোগীর আর্থিক অবস্থা, রোগীর ব্যক্তিত্ব, জীবনের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় তার অতীত ভূমিকা তার নিজস্ব বিশ্বাস ও অর্জিত রোগ সম্বন্ধে তার ধ্যান-ধারণা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে।

সাধারণ প্রতিক্রিয়া

এইচআইভি সংক্রমণ তথা জননেন্দ্রিয়ে কোনো রোগ চিহ্ন দেখা দিলে রোগী সঙ্গমে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে বা তার সাথীকে রোগাক্রান্ত করে ফেলবে এই ভয়ে মিলন থেকে বিরত থাকে। এতে তার উপর বেশ মানসিক চাপ পড়ে।

রাগ, উৎকণ্ঠা, অপরাধবোধ ও বিষণ্নতা

এচইআইভি সংক্রমণ ধরা পড়ার পর বহির্মুখী ব্যক্তি রাগান্বিত বোধ করেন। তার এ রাগ আরো বেড়ে যায় যদি তিনি নিরপরাধ রোগী হন অর্থাৎ যৌনক্রিয়া, মাদকাসক্তি ছাড়া অন্যভাবে যথা রক্ত সঞ্চালন, মা-শিশু সংক্রমণ বা অস্ত্রোপচার বা রোগীকে ইনজেকশন দেয়ার সময় সূঁচ বা ধারালো যন্ত্রপাতি বিদারণজনিত দুর্ঘটনার ফলে আক্রান্ত হয়ে থাকেন। আর তিনি যদি অন্তর্মুখী ব্যক্তি হন তবে উৎকণ্ঠিত ও বিষণ্নতাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। বহির্মুখী ব্যক্তির রাগ যে হাসপাতাল বা পরীক্ষাগারে রোগ ধরা পড়েছে তার কর্মচারী এবং যে ব্যক্তি এ রোগ তার দেহে ছড়িয়েছে তাদের সকলের উপর বর্তাতে পারে। চিকিৎসককে এ রাগ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে। রোগী যদি হাসপাতালে কোনো ঝগড়া বা ভাংচুরে লিপ্ত হন তবে তাকে শাস্তি বা পুলিশের হাতে ধরিয়ে না দিয়ে বরং নিরস্ত করে বুঝাতে হবে। তার অসুখ সম্বন্ধে আলোচনা করতে হবে এবং তার দুঃখ ও আবেগের ভাগ নিতে হবে। নচেৎ রোগী হয়তো তার যৌন সাথীকেও (স্বামী বা স্ত্রী) উৎপীড়ন বা আক্রমণ করে বসতে পারে।

অন্তর্মুখী ব্যক্তি বিয়ের নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করে বহুগামী হওয়ার জন্য অপরাধবোধে জর্জরিত থাকবে। এইচআইভি সংক্রমণকে সে তার শাস্তি হিসেবে গণ্য করবে এবং বিষণ্নতাগ্রস্ত থাকবে। এ রকম রোগীকে সুযোগ ও সময় দিতে হবে। ধৈর্য্য সহকারে শুনতে হবে এবং তাকে আশ্বস্ত করতে হবে। একইসাথে বিদ্যমান উপসর্গগুলোর চিকিৎসা করতে হবে। এদের অপরাধবোধ ও বিষণ্নতা একইসাথে থাকতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

এইডস নিয়ে ভয়ভীতি সর্বত্র। মানবিক অধিকার থেকেও এসব রোগীরা বঞ্চিত। এমন কি সভ্যতার স্বর্ণশিখর আমেরিকাতেও ধারণা ছিলো হাতের স্পর্শে এইডস ছড়ায়। ১৯৮৭ সালে ওয়াশিংটন ডিসিতে একজন এইডস রোগীকে পুলিশ বিনা কারণে দস্তানা পরা হাতে জাপটে ধরে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে।

গুরুতর বিষণ্নতা

এইচআইভি আক্রান্তদের ৪ থেকে ১৬% বিষণ্নতায় ভোগে। বিষণ্নতা এবং এইচআইভি সংক্রমণের উপসর্গগুলোর বেশ কিছু উপর্যুপরি থাকার কারণে অনেকক্ষেত্রেই সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। গুরুতর বিষণ্নতার বৈশিষ্ট্য হলো —

* মন খারাপ (Low mood) থাকা সকালের দিকে মন সবচেয়ে বেশি খারাপ থাকে। বিকেলের দিকে ধীরে ধীরে তা ভালো হয়ে আসতে থাকে।

পরিপার্শ্বিক পরিবর্তনের সাথে সাড়া না দেয়া,

* আত্মহত্যার চিন্তা-ভাবনা করা,
* আনন্দময় কাজে অংশ না নেওয়া,
* নিজেকে সমাজ থেকে আলাদা করে রাখা,
* হতাশাগ্রস্ত থাকা।

এছাড়াও কিছু শারিরীক উপসর্গ থাকতে পারে। যেমন—

* খুব ভোরে ঘুম থেকে জাগা
* ওজন হারানো
* ক্ষুধামান্দ্য
* কামোদ্দীপনা হ্রাস

আত্মহত্যা প্রবণতা

এইডস রোগীদের আত্মহত্যা প্রবণতা অত্যধিক। এক গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে সাধারণ লোকের চেয়ে তা ৭ থেকে ৩৬ গুণ বেশি। তবে অপর এক গবেষণায় দেখা গেছে অন্যান্য রোগগ্রস্তদের আত্মহত্যা প্রবণতা ও এইডস রোগীদের আত্মহত্যা প্রবণতা প্রায় সমান। গুরুতর বিষণ্নতার জন্য এটি ঘটে থাকে। সুতরাং বিষণ্নতার যথাযথ চিকিৎসা করতে হবে।

মানসিক পীড়া

গুরুতর মানসিক পীড়া যথা বাতিকগ্রস্ততা বা ম্যানিয়া (Mania) এবং ভ্রংশী বাতুলতা বা শ্রিজোফ্রেনিয়া (schizophrenia) প্রায়ই এইডস রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। বিভ্রান্তি (Delusion), অদ্ভূত আচরণ, মতিভ্রম (hallucination), মেজাজ পরিবর্তন যথা : সুখোচ্ছাস, ক্রোধপ্রবণতা, প্রাণহীন বিরসভাব (labile or flat affect) প্রভৃতি উপসর্গ তাদের মধ্যে বিরাজ করে। এইডস রোগের শেষ পর্যায়ে এগুলো দেখা দিতে পারে এবং কিছু রোগী আরো খারাপের দিকে যেতে থাকে এবং কয়েক মাসের মধ্যেই রোগীর চিত্তভ্রংশতাজনিত সমস্যা হয় বা মারা যায়।

এইচআইভিজনিত চিত্তভ্রংশতা

এতে নিম্ন মস্তিষ্কের (subcortical) চিত্তভ্রংশ (Dementia) দেখা দেয়। অনুভবশক্তিহীনতা অনুপস্থিত থাকে। তবে স্মৃতি শক্তি হ্রাস পায় এবং চিন্তা প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়। সামাজিক সংস্পর্শ থেকে সে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। চালক বা মোটর কাজে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। হাতের লেখা খারাপ হয়ে যেতে পারে। আরো পরে মাংসপেশীতে প্রসারণ-সংকোচন (myoclonus), অন্ত্র এবং মূত্রথলির ধারণ অক্ষমতা (incontinence) দেখা দেয় এবং অবশেষে বাকহীনতা (mutism) সৃষ্টি হয় এবং মৃতবৎ হয়ে পড়ে। চিত্তভ্রংশ রোগীর উন্নতি লাভের আশা খুবই বিরল। গড়পড়তা নয় মাসের মাঝে তারা মারা যায়। (আরো তথ্য এইডস সংশ্লিষ্ট জটিলতা শিরোনামের অধীনে দেয়া আছে)

অন্যান্য মানসিক সমস্যা

যৌন সমস্যা

এইচআইভি আক্রান্ত পুরুষদের প্রায় ৭০ থেকে ৮০% এবং মহিলাদের ৫৫% নানাবিধ যৌন সমস্যায় ভোগেন। এরা যৌনক্রিয়া বন্ধ রাখেন, এতে নিরুৎসাহিত থাকেন বা সঙ্গমমাত্রা কমিয়ে দেন। আগেই বলা হয়েছে এতে তাদের প্রচুর মানসিক চাপ পড়ে। মাদকাসক্তি বা দৈহিক অক্ষমতার জন্যও এরূপ ঘটতে পারে।

খাদ্যগ্রহণে গোলযোগ

ক্ষুধামান্দ্য, ওজন হ্রাস এবং দৈহিক অবয়ব পরিবর্তনের (শুকিয়ে যাওয়া) ব্যাপারে উৎকণ্ঠা ইত্যাদি এইচআইভি সংক্রমণে খুবই সাধারণ। তবে মাঝে মাঝে কোনো রোগী আবার (খুবই বিরল) পেটুক হয়ে উঠে। অন্যান্য উপসর্গের সাথে খাদ্যগ্রহণে গোলযোগ দেখা দিলে এ ব্যাপারে অতিরিক্ত যত্ন নিতে হবে।

কৃত্রিম এইচআইভি সংক্রমণ

এটি আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, পৃথিবীতে (পশ্চিমা দেশগুলোতে) মাঝে মাঝে কৃত্রিম এইডস বা এইচআইভি সংক্রমিত রোগী পাওয়া যায়। এদের রক্ত পরীক্ষা করলে এইচআইভি–র অস্তিত্ব ধরা পড়ে না। কিন্তু এইচআইভি সংক্রমণের বিভিন্ন উপসর্গ তাদের রয়েছে বলে দাবী করে এবং হুবহু নিখুঁতভাবে বর্ণনা করে যায়। এরা আসলে ঐসব দেশে এইচআইভি রোগীদের জন্য দেয়া সুবিধা, দয়া–দাক্ষিণ্য গ্রহণ করতে চায়। মিডিয়ার বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে এজাতীয় প্রচারণা এ ব্যাপারে তাদের প্রভাবিত করে। এরা এক ধরনের মানসিক রোগী।

এইচআইভি সংক্রমণ ও মানসিক প্রতিবন্ধী

মানসিক প্রতিবন্ধীর এইচআইভি সংক্রমণ, তার ভয়াবহতা, কিভাবে তা ছড়ায় এবং কিভাবে নিজেকে রক্ষা করা যায় এসব ব্যাপারে সাধারণত সচেতন থাকে না, ফলে সহজেই এ রোগে আক্রান্ত হয়। তাদেরকে তাই যৌনতা, গর্ভরোধ তথা এইডস ইত্যাদি ব্যাপারে সচেতন করে তোলা তাদের প্রশিক্ষকের দায়িত্ব।

চিকিৎসা

এইচআইভি রোগীদের মানসিক সমস্যাগুলো চিকিৎসার সময় তার সার্বিক রোগ ও স্বাস্থ্য সমস্যার চিকিৎসা করতে হবে। ডাক্তার এবং সেবিকা তাদের দৈনন্দিন চিকিৎসা ও যত্নের দায়িত্ব নিবেন। কেবল সামান্য কিছু রোগীকে মানসিক বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানোর প্রয়োজন পড়বে। বিষণ্নতাবিরোধী ওষুধ (Antidepresent)-এ বিষণ্নতাবিরোধী ওষুধের প্রতি এইচআইভি সংক্রমিত রোগীরা বয়স্ক রোগীদের মতো প্রতিক্রিয়া দেখায়। এইচআইভিজনিত বিষণ্নতার ক্ষেত্রে ট্রাইক্লিক বিষণ্নতাবিরোধী ওষুধ যথা ইমিপ্রামিন, ডেসইমিপ্রামিন এবং এমিট্রিপ্টিলিন ভালো কাজ করে। নতুন ওষুধ সেরোটোনিন রি–আপটেক ইনহিবিটরস (SSRI) আরো ভালো কাজ করে।

মনোবিকারবিরোধী (Antipsychotic) ওষুধ

তীব্র মস্তিষ্ক বিকৃতিজনিত প্রলাপ (delirium), বাতিকগ্রস্ততা, ভ্রংশী বাতুলতা (শ্রিজোফ্রেনিয়া) ইত্যাদি ক্ষেত্রে মনোবিকারবিরোধী ওষুধ দিতে হবে। এজন্য ডোপামিন D_2 বিরোধী রেমোক্সিপ্রাইড (Remoxipride) খুবই কার্যকর। তবে এতে অ্যাপ্লাসটিক রক্তশূন্যতা (Aplastic anaemia) দেখা দিতে পারে। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে তাই সতর্ক থাকতে হবে। রিসপেরিডোন (Risperidone) নামে অপর একটি 5HT2/Dopamine D_2 বিরোধী ওষুধ ভালো কাজ করে এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম।

দুশ্চিন্তারোধী ও ঘুমদায়ক ওষুধ

কিছুকালের জন্য দুশ্চিন্তারোধী (Anxiolytic) ও ঘুমের ওষুধ (hypnotics) দেয়া যেতে পারে। এজন্য বেঞ্জোডায়াজেপিন (Benzodiazepine) সবচেয়ে কার্যকর।

মনোদ্দীপক (psychostimulants) ওষুধ

এইচআইভি সংক্রমিত যেসব রোগী বিষণ্ণতাবিরোধী ওষুধে সাড়া দেয় না তাদের সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য মনোদ্দীপক ওষুধ যথা : মিথাইল ফেনডিয়েট (Methye phendiate) এবং ডেক্সট্রোএমফেটামিন (Dextroamphetamine) দিয়ে চিকিৎসা করে উপকার পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকায় এইডস এর বিভীষিকা

অন্যান্য চিকিৎসা

এইচআইভি সংক্রমণজনিত গুরুতর বিষণ্ণতা (Major depression) ও ভ্রান্তি এমনকি চৌম্বকীয় প্রতিধ্বনিজাত রঞ্জন ছবি (Magnetic Resonance Imaging-MRI) দিয়ে প্রদর্শিত মস্তিষ্ক ক্ষয় (Diffuse cortical atrophy)–এর ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক খিঁচুনি চিকিৎসা (Electoconvulsive therapy) দিয়ে উপকার পাওয়া যায়। লিথিয়াম এবং খিঁচুনিরোধক ওষুধ এইচআইভি–এর কারণে সৃষ্ট বাতিকগ্রস্ততা ও চিকিৎসা প্রতিরোধী বিষণ্ণতাতে (Resistant depression) কাজ দেয়।

এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তি তার স্বাস্থ্যহানি, সামাজিক অবজ্ঞা, আর্থিক দৈন্যতা ইত্যাদি বহু কারণেই দুশ্চিন্তাযুক্ত থাকে। মন-মানসিকতা ভালো থাকে না ও নানা উপসর্গ দেখা দেয়। তাই তাকে ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা ছাড়াও তাকে মানসিক সাহায্য (cmotional support) ও সহানুভূতি (করুণা নয়) দেখাতে হবে। কিভাবে স্নায়বিক চাপ কমাতে হয় সে বিষয়ে তাকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং দলবদ্ধভাবে মনোচিকিৎসা বা গ্রুপ সাইকোথেরাপি (group psychotherapy) দিতে হবে।

মনে রাখতে হবে

* এইচআইভি-১ সংক্রমণ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে।
* গুরুতর বিষণ্ণতা, বাতিকগ্রস্ততা ইত্যাদি মানসিক উপসর্গগুলো খুবই সাধারণ।
* বিষণ্ণতা ও আত্মহত্যার প্রবণতা কখনো স্বাভাবিক নয়। এগুলো গুরুত্বসহকারে চিকিৎসা করতে হবে।
* মানসিক চিকিৎসার পাশাপাশি রেট্রোভাইরাসবিরোধী চিকিৎসা যথা জিডোভুডিন (AZT retrovir) চালিয়ে যেতে হবে।

চতুর্বিংশ অধ্যায়
এইচআইভি ও সামাজিক সমস্যা

এইচআইভি সংক্রমিত বা এইডস রোগীদের সম্বন্ধে সমাজে অনেকেরই ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে ফলে এসব লোককে তারা মেনে নিতে পারছে না এবং সামাজিকভাবে বর্জন করছে। ফলে কেউ কেউ আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে দ্বিধা করেন না। এমনকি অনেক সময় হাসপাতালের সেবিকা বা চিকিৎসকরাও তাদের সভয়ে এড়িয়ে চলেন বা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন। হাসপাতালে অন্যান্য রোগীর আত্মীয়-স্বজনরা দূর থেকে পরম কৌতূহল ভরে চিড়িয়াখানার পশুর মতো তাদের অবলোকন করেন। এমনকি চাকুরির ক্ষেত্রেও তারা অবিচারের সম্মুখীন হন। মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশে নির্বাচিত হওয়ার পর রক্ত পরীক্ষায় এইচআইভি ধরা পড়লে চাকুরি দেয়া হয় না এমনকি চাকুরিকালীন তা ধরা পড়লে তাকে চাকুরিচ্যুত করা হয়। বাংলাদেশেও এরকম অনেক ব্যাপার ঘটেছে।

এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তি নিজের সমস্যার কথা চিকিৎসককে বলতে পারে না বলে অন্য মানুষেরও এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে অনেকে জীবনবীমা করেন কিন্তু দেখা গেছে রক্ত পরীক্ষায় এইচআইভি ধরা পড়লে তাদের বীমা করার সুযোগ দেয়া হয় না।

যদিও এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই কিন্তু নানারকম সংক্রমণ থেকে বেঁচে থাকতে যে ওষুধ দরকার তা তারা পায় না এমনকি নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা করাতেও পারছে না সামাজিক ও আর্থিক কারণে। গোপনীয়তা মানুষের মৌলিক দাবী কিন্তু কিছু কিছু সাংবাদিক এসব নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে এইচআইভি রোগীদের নামধাম পত্রিকায় ছেপে দিয়ে তাকে সামাজিকভাবে শুধু হেয়ই নয় হত্যা করেন বলা যায়। সাধারণ মেলামেশায় এইচআইভি ছড়ায় না এবং বহুদিন তারা কর্মক্ষম জীবনযাপন করতে পারেন কিন্তু সমাজ তাকে একঘরে করে রাখে ফলে অনেকেই একরকম বন্দী জীবনযাপন করেন। এইচআইভি সংক্রমিতদের সন্তানরা রোগাক্রান্ত না হলেও তাদের সমাজ সহজভাবে গ্রহণ করে না।

সাধারণত স্ত্রীরা স্বামীর কাছ থেকে সংক্রমিত হয় কিন্তু অনেকক্ষেত্রে স্ত্রীর কথাটাই সমাজে প্রকাশ করে স্বামী তাকে অন্যায়ভাবে ত্যাগ করে।

সমাধান

আমাদের তাই এসব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান খুঁজে বের করতে হবে—

* কোনো যৌনকর্মীর এইচআইভি ধরা পড়লে তাকে অন্য কোনো কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে হবে যাতে পূর্ব পেশায় ফিরে যেতে না হয়।
* এইচআইভি আক্রান্ত স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

* এইচআইভি আক্রান্তরা যাতে সহজেই প্রয়োজনীয় ওষুধ সংগ্রহ করতে পারে ও মাসে মাসে রক্ত পরীক্ষা করতে পারে তার দায়িত্ব সমাজকে নিতে হবে।
* যৌনমিলনের ফলে বহুরোগই ছড়ায় কিন্তু এজন্য তাদের সমাজ তত হেয় করে না যতটা এইচআইভি আক্রান্তদের করে। তাই এ মনোভাব বদলাবার জন্য প্রচারমূলক কাজ করতে হবে।
* এইচআইভি আক্রান্ত স্বামী–স্ত্রী উভয়ই মারা গেলে তাদের অসহায় সন্তাদের দায়িত্ব নেয়া উচিত। তারা যাতে সমাজে লাঞ্ছিত, নির্যাতিত না হয় তা খেয়াল করতে হবে।
* জনগণের সচেতনতা বাড়াবার জন্য রেডিও, টেলিভিশন, নাটক প্রভৃতি বিনোদনের সাহায্য নিয়ে প্রচার করতে হবে এবং পত্র–পত্রিকায় লিখতে হবে।
* সম্ভব হলে ডায়াবেটিস হাসপাতালের মতো এইচআইভি সংক্রমিতদের জন্য পৃথক হাসপাতাল তৈরি করে তাদের দিতে হবে অহর্নিশি ভালোবাসা সহানুভূতি এবং বেঁচে থাকার অধিকার।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে সতর্কতা ও পরামর্শ

* বর্তমানে আমাদের দেশে এক লক্ষের বেশি পতিতা আছে। কিন্তু এদের এইচআইভি সংক্রমণ সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই।
* দু'লক্ষ এককের বেশি রক্ত প্রতিবছর এদেশে সঞ্চালিত হয়, কিন্তু এইচআইভি প্রতিরক্ষিকা আছে কি–না তা সর্বত্রই পূর্বে পরীক্ষা করা হয় না।
* হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোর সামান্য কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশতে সিরিঞ্জ, সুঁচ ইত্যাদি সঠিক পদ্ধতিতে নির্বীজন (sterilization) করা হয় না।
* আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত, মায়ানমার, থাইল্যান্ডসহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এইচআইভি সংক্রমিত লোকের সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমাদের দেশেও মরণব্যাধি এইডস হানা দিয়েছে এবং দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে। থাইল্যান্ড, মাল্টা প্রভৃতি দেশে পর্যটনের নামে চলে অবাধ যৌন ব্যবসা, যার আকর্ষণে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার পুরুষ সেসব জায়গায় যায় যৌন সফর বা সেক্স ট্যুরে (sex tour)। এ সফরের বলি হয় সেসব দেশের অসংখ্য দরিদ্র কিশোরী, যাদের অনেকর বয়স বারো বছরের সীমায়। উগান্ডা, থাইল্যান্ড এসব দেশে রয়েছে লক্ষ লক্ষ এইডসের শিকার আর সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য পরিত্যক্ত এইডস শিশু, যাদের জন্মদাতা এ রোগে অনেক আগেই পৃথিবীর মায়া কাটিয়েছে। আমাদের দেশে যাতে এরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় তাই এখন থেকে আমাদের সর্তক হতে হবে। এজন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, তা নিচে উল্লেখ করা হলো—

১। যারা এইচআইভি ভাইরাস বহনকারী তারা যাতে এ রোগ আর ছড়াতে না পারে, সেজন্য তাদের পরামর্শ দান তথা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২। জনসাধারণকে এই রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলার জন্য পাড়ায় পাড়ায় ও জাতীয় ভিত্তিতে এইডস প্রতিরোধ কমিটি গড়ে তুলতে হবে।

৩। যৌন আচরণে আমাদের সংযত হতে হবে। যৌনাচারের ব্যাপারে বিবাহিত জীবনযাপন ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে জীবনযাপন করা সর্বশ্রেষ্ঠ।

৪। যেসব ব্যক্তির বহু যৌনসঙ্গী আছে (যথা বারাঙ্গনা) তাদের সাথে যৌনক্রিয়া পরিহার করা উচিত।

৫। মুখবিবর ও পায়ুতে জননাঙ্গের প্রবিষ্টকরণ ত্যাগ করা প্রয়োজন।

৬। প্রতিবার যৌনক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কনডম ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক।

৭। অস্ত্রোপচার ও জীবন রক্ষার কারণে রক্ত ও রক্তজাত দ্রব্য গ্রহণের পূর্বে তাতে যে এইচআইভি ভাইরাস নেই তা পরীক্ষা করে নিশ্চিত করতে হবে।

৮। শল্যবিদ ও দন্ত চিকিৎসকের যন্ত্রপাতি নির্বীজন করার মান উন্নত করতে হবে। সূঁচ বা অন্যান্য ত্বকবিদারী যন্ত্র ব্যবহারের আগে তার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে হবে। চিকিৎসার্থে একবার ব্যবহার করে ফেলে দেয়া হয়, এ ধরনের মোড়কাবদ্ধ প্লাস্টিক সিরিঞ্জ ব্যবহার করা উচিত।

৯। শিরাপথে মাদকদ্রব্য গ্রহণকারীদের নিবৃত্ত করতে হবে। নিবৃত্ত করতে না পারলে তারা যাতে অন্তত একবার ব্যবহারের পর পরিত্যজ্য সিরিঞ্জ ব্যবহার করে তা নিশ্চিত করতে হবে।

১০। এইচআইভি ভাইরাস বহনকারী মহিলাদের কিছুতেই গর্ভবতী হওয়া উচিত নয়, যদি গর্ভবতী হয়ে পড়েন তবে সন্তান সংক্রমিত হতে পারে। তাই নিয়মিত চিকিৎসক দেখাতে হবে।

১১। রোগীকে ভৎর্সনা না করে সখ্যতা গড়ে তুলে সবগুলো যৌনসাথীদের খুঁজে বের করে চিকিৎসা করতে হবে। এজন্য রোগীকে অভয় দিতে হবে যে তার দেয়া তথ্য গোপন রাখা হবে এবং সামাজিকভাবে তাঁকে হেয় করা হবে না।

১২। কোথায় গেলে এইচআইভি সংক্রমনের সঠিক রোগ নির্ণয় ও সহজ চিকিৎসা করা সম্ভব তা কর্তৃপক্ষকে রাস্তাঘাটে ফলক দিয়ে, পত্রিকায় বা রেডিও, টিভিতে বিজ্ঞাপন দিয়ে জনসাধারণকে জানাতে হবে।

১৩। অপরের দাঁতের ব্রাশ, দাড়ি কামাবার ব্লেড ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত নয়। এগুলো রক্ত দিয়ে দূষিত থাকে।

১৪। বিদেশে যেসব বাংলাদেশী কর্মরত আছেন তারা জীবনরক্ষার প্রয়োজনে রক্ত নিতে হলে যথাসম্ভব স্বদেশী জানাশোনা লোকের রক্ত গ্রহণ করবেন বিদেশীদের (বিশেষত ইউরোপ ও আফ্রিকাবাসী) মধ্যে এইডস থাকার সম্ভাবনা বেশি।

অন্যান্য ব্যবস্থা

এছাড়া বাংলাদেশ সরকার আরো যেসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো —

ক. এইডসকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা।

খ. বিয়ের আগে বর–কণেকে এইডস ও যৌনরোগ মুক্ত সার্টিফিকেট গ্রহণে উৎসাহিত করা।

গ. প্রতি তিন মাস অন্তর প্রতিতাদের বাধ্যতামূলক এইচআইভি পরীক্ষা করা। এইডসমুক্ত না হলে তাদের কাজ করার অনুমতি না দেয়া।

ঘ. এইডসবহুল দেশ (ইউরোপ, আমেরিকা, পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যান্ড, হাইতি ইত্যাদি) থেকে যারা প্রত্যাবর্তন করেন তাদের এইচআইভি পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা।

ঙ. দূতাবাসের কর্মচারী, দীর্ঘদিন প্রবাসে কর্মরত বাংলাদেশীসহ কোনো বিদেশী নাগরিককে বাংলাদেশে প্রবেশের এইডস মুক্ত প্রমাণপত্র দাবী করা।

চ. কোনো লোকের এইডস ধরা পড়লে প্রতি তিন বা ছয় মাস অন্তর অন্তর তাকে এবং তার পরিবারের সদস্যদের নিকটবর্তী সরকারি হাসাপাতালে দৈহিক পরীক্ষার জন্য আসতে আইনের মাধ্যমে বাধ্য করা।

অতিরিক্ত সতর্কতা

হাত ধোয়া

রক্ত বা দেহরসের সংস্পর্শে দূষিত হাত বা দেহের অন্যান্য অংশ সাবান ও পানি দিয়ে ভালোভাবে প্রক্ষালন করা উচিত। সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত দস্তানা খুলেও হাত ধোয়া ভালো।

দস্তানা

রক্ত ও দেহরসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ এড়ানোর জন্য চিকিৎসক ও সেবিকাদের উপযুক্ত দস্তানা পরা উচিত। দস্তানাগুলো একবার ব্যবহারের পর ফেলে দেয়ার মতো না হলে পুনঃব্যবহারের আগে তা ধোয়া ও নির্বীজন করা উচিত।

এইডস রোগীর দেহে অস্ত্রোপচারকালে ছলকে উঠা রক্ত থেকে বাঁচার জন্য মুখে স্বচ্ছ মুখোশ পরিহিত একজন চিকিৎসক

স্বচ্ছ মুখোশ

যেসব কাজে রক্তের ছিটে বা প্রলেপ লাগতে পারে (অস্ত্রোপচার বা প্রসব করানো) সেসব ক্ষেত্রে চশমা, স্বচ্ছ ঢাল (shield) বা মুখোশ এবং গাউন বা অ্যাপ্রোন পরা কর্তব্য। দূষিত রক্ত বা দৈহিক তরল পদার্থ ঘরে বা অন্য কোনো কিছুতে পড়লে এক ভাগ ব্লিচ–এর সাথে দশ ভাগ পানি মিশিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। কাটা ক্ষততে ব্লিচ লাগানো নিষেধ।

এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধের সর্বশেষ ও মোদ্দা কথা হলো যে-কোনো মূল্যে বিবাহবন্ধনের সীমারেখার বাইরে বহুগামীতা ও অস্বাভাবিক যৌনক্রিয়া পরিহার করা প্রয়োজন।

ষট্‌বিংশ অধ্যায়
এইডস নিয়ে বেঁচে থাকা

সরকারি হিসেবে বাংলাদেশে এইচআইভি আক্রান্ত ২৪৮ জন কিন্তু গত ১১ই ডিসেম্বর মেক্সিকো হতে প্রকাশিত ইউনিসেফ বিশ্ব শিশু পরিস্থিতি ২০০২ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বাংলাদেশে শিশুসহ এইচআইভি আক্রান্ত ১৩ হাজার। এর মধ্যে অনূর্ধ্ব ১৪ বছরের শিশু রয়েছে ৩১০ জন আর এইডস-এর ফলে অনাথ হয়েছে ২১০০ শিশু (প্রথম আলো, ১৮ই ডিসেম্বর, ২০০২)। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশসহ বর্তমান পৃথিবীতে অসংখ্য লোককে এইচআইভি তথা এইডস নিয়ে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। তাদের তাই শক্ত মনোবলসহ নিজের দেহকে যথাসম্ভব শক্তিশালী রাখার চেষ্টা করতে হবে অর্থাৎ সাহস নিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করা। এ জন্য তাদের উচিত —

* ভালো পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, যাতে থাকবে পর্যাপ্ত আমিষ, খাদ্যপ্রাণ ও শর্করা। পুষ্টির অভাব অনাক্রম্যতা হ্রাসে সাহায্য করে।
* যথাসম্ভব নিজেকে কর্মক্ষম রাখা, নিয়মিত নিদ্রাগমন করা। ব্যায়াম করলে বিষণ্ণতা ও দুশ্চিন্তা দূর হবে এবং নিজেকে চাঙ্গা মনে হবে ও ভালো লাগবে। এতে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।
* সম্ভব হলে চাকুরি চালিয়ে যাওয়া।
* নিজেকে কোনো ভালো কাজে জড়িয়ে রাখা, অন্ততপক্ষে নিজেকে ব্যস্ত রাখা যাতে রোগের কথা ভুলে থাকা যায়।
* বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের সদস্যদের সাথে সামাজিকতা বজায় রাখা।
* অন্তরঙ্গ কারো কাছে নিজের রোগের কথা খুলে বলা।
* যৌনমিলনকালে কনডম ব্যবহার করা।
* স্বাস্থ্য সমস্যার জন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া তার নির্দেশ মেনে চলা।

এড়িয়ে চলা

* মদ ও ধূমপান
* পুনরায় এইচআইভি সংক্রমিত হওয়া বা অন্যান্য সংক্রামক রোগ অর্জন
* গর্ভধারণ কেননা তা দেহের অনাক্রম্যতা কমায়
* ব্যবস্থাপত্র ছাড়া ওষুধ গ্রহণ
* নিজেকে গুটিয়ে একঘরে হয়ে থাকা।

BANGLADESH Library Dhaka

এইচআইভি এবং এইডস রোগীদের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউএন এইডস মনোনীত যত্ন ও পৃষ্ঠপোষকতা

প্রয়োজনীয় যত্ন (Essential care)	অতিরিক্ত মাধ্যমিক জটিল কার্যাবলী এবং /বা মূল্য (Additional activities of Intermediate complexity and / or cost)	অতিরিক্ত অতি জটিল কার্যাবলী এবং / বা মূল্য Additional Activities of High complexity and / or cost
* মানসিক ও সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতা	জোর তৎপরতার সাথে রোগী খুঁজে বের করা এবং যক্ষ্মার জন্য চিকিৎসা	* অতি কার্যকর রেট্রোভাইরাসবিরোধী চিকিৎসা (Highly active autiretroviral therapy (HAART)
* উপশমকারী যত্ন (Palliative care)	যক্ষ্মা প্রতিরোধের জন্য চিকিৎসা	এইচআইভি সংশ্লিষ্ট সংক্রমণ যেগুলো সনাক্ত করা কঠিন এবং / বা চিকিৎসা ব্যয়বহুল সেগুলোর চিকিৎসা
* সাধারণ এইচআইভি সংশ্লিষ্ট সংক্রমণের চিকিৎসা	নিয়মানুগ ছত্রাকবিরোধী ওষুধ	এইচআইভি সংশ্লিষ্ট কর্কট এর অত্যাধুনিক চিকিৎসা
* পুষ্টিরক্ষার জন্য যত্ন	এইচআইভি সংশ্লিষ্ট কর্কট রোগের চিকিৎসা	এইচআইভি সংক্রমণ এর আর্থিক ও সামাজিক চাপ হ্রাস করণার্থে জনকল্যানমূলক কর্ম
* যৌনবাহিত সংক্রমণ প্রতিরোধ	ব্যাপক হার্পিস–র চিকিৎসা	
* পরিবার পরিকল্পনা	এইচআইভি সংক্রমণের চাপ হ্রাস করার জন্য সামাজিক প্রচেষ্টাগুলোতে অর্থ যোগান দেয়া।	
*মা–শিশু সংক্রমণ প্রতিরোধ		
* সাবধানতা হিসেবে কট্রিমোক্সাজল ব্যবহার		
* এইচআইভি সংক্রমণ চাপ হ্রাসের জন্য সামাজিক কার্যকলাপ		

এইচআইভি/এইডস-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাইলফলকসমূহ

১৯৫৯ প্রথম মৃত্যু (পরে জানা গেছে এর কারণ এইডস)

১৯৮১ এইডসকে প্রথম রোগ হিসেবে চিহ্নিতকরণ। ২২৭০০০ পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি আক্রান্ত।

১৯৮৩ মন্টাগনিয়ার (Montagnier) কর্তৃক এইচআইভি ভাইরাস বর্ণনা।

১৯৮৪ এইচআইভি ভাইরাস-এর সম্পূর্ণ জেনোম-এর পর্যায়ক্রম (Genomic sequence) নির্ণয়।

১৯৮৫ এইচআইভি-২ আবিষ্কার এবং এইডস নির্ণয়ের জন্য পিসিআর কৌশল (PCR technique) প্রকাশ।

১৯৮৬ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক এইডসবিষয়ক বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ পরে যা UNAIDS-এর কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৮৭ প্রথম রেট্রোভাইরাসবিরোধী ওষুধ AZT তৈরি।

১৯৯০ ১০ মিলিয়ন আক্রান্ত।

১৯৯২ এইচআইভিবিরোধী ওষুধের ক্ষেত্রে FDA কর্তৃক দ্রুত অনুমোদন প্রথা Accelerated approval procedure)। মোট এইডস আক্রান্ত জনসংখ্যার ২৫% মহিলা।

১৯৯৬ রেট্রোভাইরাসবিরোধী তীব্র কার্যকর চিকিৎসা (HAART) প্রচলন।

১৯৯৭ প্রথম ফিউশন দমনকারী (Fusion inhibitor) টি-২০ (T-20) পরীক্ষা শুরু।

২০০০ পৃথিবীতে ৩৩.৪ মিলিয়ন এইচআইভি আক্রান্ত লোক। ৪৭% মহিলা, ৩ মিলিয়ন মৃত্যু।

২০১৫ বর্তমানে যে হারে গড় আয়ু বাড়ছে তা এইডস-এর প্রকোপের ফলে তা বিপরীত দিকে মোড় নেওয়ার আশংকা।

বিশ্ব এইডস দিবস

ঘাতক ব্যাধি এইডস মানব সভ্যতার জন্য হুমকিস্বরূপ। এইডস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১লা ডিসেম্বর সারা পৃথিবীতে বিশ্ব এইডস দিবস পালিত হয়। এই দিবসে প্রতিবছর একটি প্রতিপাদ্য বিষয় নির্দিষ্ট করা হয়। বিভিন্ন বছরে যে শ্লোগানগুলো ঠিক করা হয়েছিলো তা হলো :

১৯৯৫ Share Rights Share Responsibilities
এইডস প্রতিরোধের দায়িত্ব ও অধিকার সকলের

১৯৯৬ One World-One Hope
এক বিশ্ব এক আশা

১৯৯৭ Children living in a World with Aids
এইডস আক্রান্ত বিশ্বে শিশুরা

১৯৯৮	Force for Change World Aids Campaign with Children and Young People এইডস প্রতিরোধে যুবশক্তি
১৯৯৯	Listen learn, live World Aids Compaign with Children and Young People শুনুন, জানুন, এইডস প্রতিরোধ করে বাঁচুন —এইডস প্রতিরোধে শিশু ও যুব সমাজ
২০০০	Aids Men Make a Difference এইডস প্রতিরোধে পুরুষের ভূমিকাই প্রধান
২০০১	I Care .. Do you? এইডস সম্পর্কে আমি সচেতন ... আপনিও সচেতন হউন
২০০২	Live and let live এইডস থেকে বাঁচুন এবং অন্যকে বাঁচান

সপ্তবিংশ অধ্যায়

প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং জ্ঞান

প্রতিটি অধ্যায় বা সম্পূর্ন বইটির পঠন শেষে শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের অর্জিত জ্ঞানের মূল্যায়ন করবেন নিম্নোক্ত প্রশ্নমালা ব্যবহার করে :

১. AIDS শব্দ দিয়ে কি বুঝায়?

A ---------------

I ---------------

D ---------------

S ---------------

২. দেহে HIV ভাইরাস–এর উপস্থিতি জানা গেলেই তাকে AIDS রোগী হিসেবে গণ্য করতে হবে (টিক √ দিন)

সত্য— মিথ্যা—

৩. HIV দিয়ে আক্রান্ত হওয়া, যাদের একাধিক যৌনসঙ্গী আছে শুধু তাদের সমস্যা। সাধারণ মানুষ বা নৈতিক আচরণকারীদের জন্য এটা কোনো সমস্যা নয় (টিক √ দিন)।

সত্য— মিথ্যা—

৪. কেউ যদি শুধু একজনই সঙ্গী/সঙ্গীনীর সাথে যৌনকর্ম করে তবে সে AIDS রোগের ঝুঁকির সন্মুখীন নয়।

সত্য— মিথ্যা—

৫. নিম্নোক্তভাবে এইচআইভি সংক্রমণ এড়ানো যায় (সঠিক স্থানে টিক √ দিতে হবে)

সত্য— মিথ্যা—

(ক) সেসব যৌনকর্ম থেকে বিরত থাকা যেগুলোতে রক্ত, বীর্য বা যৌনরস বিনিময় হয়।

(খ) যৌনকর্মের সময় কনডম ব্যবহার করা।

(গ) সমকামীদের সামাজিক সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকা।

(ঘ) অস্ত্রোপচার, ডাক্তারি পরীক্ষা ও ইনজেকশনের যন্ত্রপাতি যথাযথ জীবাণুমুক্ত করা।

(ঙ) একই ইনজেকশনের সুঁচ একাধিক ব্যক্তির ব্যবহার না করা।

(চ) মুসলমানি (খৎনা), উলকি ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা।

৬. একজন এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তিকে একই চাকুরিতে বা অন্যদের সাথে একসঙ্গে কাজ করতে দেওয়া উচিত।

সত্য— মিথ্যা—

৭. প্রথম অবস্থায় ধরা পড়লে এইডস রোগ ভালো করা যায়।
সত্য— মিথ্যা—

৮. এইচআইভি আক্রান্ত শিশু স্কুলের অন্যান্য শিশুর জন্য বিপজ্জনক।
সত্য— মিথ্যা—

৯. একজন এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তি নিম্নলিখিত মাধ্যমে অন্যকে এইচআইভি রোগ ছড়াতে পারে (সঠিক মাধ্যমগুলোতে টিকা √ দিতে হবে)।
ক. রক্ত
খ. লালা
গ. বীর্য
ঘ. যোনি নিঃসৃত রস
ঙ. বুকের দুধ
চ. ত্বক
ছ. চোখের পানি

১০. একজন ব্যক্তি যিনি এইচআইভি দিয়ে সংক্রমিত হয়েছেন কিন্তু রক্তে এখনো ভাইরাস–এর উপস্থিতি ধর পড়েনি অর্থাৎ উইনডো পিরিয়ডে আছেন তিনি (টিক √ দিন)
ক. এইচআইভি সংক্রমিত করতে পারেন।
খ. এইচআইভি সংক্রমিত করতে পারেন না।

১১. এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তি এইডস রোগীতে পরিণত হবেন :
ক. ১ বছরের কম সময়ের মধ্যে।
খ. মোটামুটি ৩ বছরের মধ্যে।
গ. ৭ থেকে ১০ বছরের মধ্যে।

১২. বামপাশের বাক্যাংশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তথা সঠিক সংখ্যাটি ডান পাশ থেকে নির্বাচিত করে তার সংখ্যাটি বাম পাশের ফাঁকা স্থানে বসাও। ইউনিসেফ–এর হিসেবে

(১) বাংলাদেশে শিশুসহ এইচআইভি আক্রান্তদের সংখ্যা	(ক) ২১০০
(২) এইচআইভি রোগের ফলে অনাথ শিশুর সংখ্যা	(খ) ২৪৮
(৩) এইচআইভি আক্রান্ত অনূর্ধ্ব ১৪ বছর বয়সী শিশু	(গ) ১৩০০
(৪) সরকারি হিসেব অনুযায়ী এইচআইভিতে আক্রান্ত	(গ) ৩১০

১৩. এইচআইভি দেখা যায় (টিকা দিন) :
খালি চোখে/সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে/ইলেক্ট্রন মাইকোস্কোপ দিয়ে।

১৪. এইচআইভি ভাইরাসে আছে
— ডি.এন.এ. / আর.এন.এ.।
— শুধু ডিএনএ বা আর.এন.এ.
ডি.এন.এ. এবং আর.এন.এ. একত্রে

১৫. সঠিক উত্তরে √ চিহ্ন দিতে হবে। এইডস প্রথম শনাক্ত করা হয়েছিলো।
(ক) ১৯৭০ সালে আফ্রিকাতে

(খ) ১৯৭৮ সালে যুক্তরাজ্যে
(গ) ১৯৮১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে

১৬. সত্য হলে 'স' এবং মিথ্যা হলে 'মি' লিখতে হবে।
(ক) এককসূত্রী বা সিংগল স্ট্র্যান্ডেড আর.এন.এ. ভাইরাস যার আবরণে গ্লাইকোপ্রোটিন gp120 ও gp41 থাকে।
(খ) রক্তরস বা প্লাজমাতে মুক্ত এইচআইভি–এর অর্ধজীবন মাত্র ৬ ঘন্টা।
(গ) দিনে সংক্রমিত দেহে দশ বিলিয়ন ভাইরাস উৎপন্ন হয় এবং দুই বিলিয়ন অসংক্রমিত CD4++ সাহায্যকারী লসিকা কোষকে ধ্বংস করে।
(ঘ) রক্ত ও মস্তিষ্কের প্রতিবন্ধকতা (Blood Brain Barrier) অতিক্রম করে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ ধ্বংস করে।
(ঙ) সবগুলো তথ্য সত্য
(চ) সবগুলো তথ্য মিথ্যা

১৭. বিবৃতির সঠিক অংশ √ দিতে হবে।

(ক) এইচ আইভি সংক্রমণ শনাক্ত করার জন্য সবচেয়ে সস্তা ও সহজলভ্য উপায় হলো :

এলাইজা

ওয়েস্টার্ন ব্লট

ভাইরাস স্বতন্ত্রীকরণ (Isolation)

প্যাট এইচআইভিডিপ স্টিক (PAT HIV DIP STICK) পরীক্ষা

(খ) মা–শিশুর সংক্রমণ কমাতে চিকিৎসাকাল সংক্ষিপ্ত, দামে সস্তা ও সহজ ব্যবহারযোগ্য ওষুধ হচ্ছে :

ডিডানোসিন / জিডোভুডিন / নেভিরাপিন / ইন্ডিনাভির / লেমিভুডিন

(গ) মহিলাদের এইডস রোধ করতে কার্যকর :

ডায়াফ্রাম / সারভাইকাল ক্যাপ / কনডম / স্পঞ্জ / ফেনা বড়ি

(ঘ) একজন স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাধারী লোকের দেহে প্রতি ঘন লিটার (μl) রক্তে সিডি–৪ কোষ সংখ্যা হলো :

৫৫০টি/μl

৭৫০টি/μl

৯৫০টি/μl

১০৫০টি/μl

(ঙ) এইচআইভি সংক্রমিত দেহে সিডি–৪ কোষ (CD4 Cells)–এর সংখ্যা প্রতি ঘনলিটার রক্তে এর চেয়ে বেশি হ্রাস পেলে এইডস–এর সখ্যা হিসেবে ধরা হয়

৫০০/μl

৩০০/μl

২০০/μl

(চ) রেট্রোভাইরাসবিরোধী চিকিৎসায় সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ডিভানোসিন / স্টারভুডিন / লেভিরাইড / জিডোভুডিন

১৮. এইডস কি?

১৯. কি করে লক্ষণ ও উপসর্গ দেখে এইডস হয়েছে বলে সন্দেহ করা যায়?

২০. আমাদের দেহকে রক্ষা করার জন্য যে প্রতিরোধ ব্যবস্থা আছে তা কি?

২১. কি করে এইডস সেই প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ভেঙে দেয়?

২২. কি করে এইডস ছড়ায়?

২৩. কিভাবে এইডস থেকে বাঁচা যায়?

২৪. কিভাবে এইডস ছড়ায় না?

২৫. এইডস প্রতিরোধের জন্য গবেষণাগারে পালনীয় সতর্কতা কি?

২৬. রেট্রোভাইরাসবিরোধী চিকিৎসা কি কি?

২৭. সুযোগ-সন্ধানী সংক্রমণগুলো কি কি?

২৮. এইডস রোগীদের প্রতি সঠিক মনোভাব ও সামাজিক দায়িত্ব কি?

২৯. নিরাপদ যৌনক্রিয়া কাকে বলে?

৩০. নিরাপদ রক্ত কি?

মনে রাখতে হবে

এইডস-এর কোনো চিকিৎসা বা টিকা এখন পর্যন্ত নেই। এটি মরণ ব্যাধি। কিন্তু এ রোগ থেকে ইচ্ছা করলেই আমরা বাঁচতে পারি। শুধু সুশৃঙ্খল সামাজিক জীবনযাপন ও সতর্কতা অবলম্বনেই এর প্রতিরোধ সম্ভব।

AIDS : A Killer Disease

AIDS is a killer disease. IPS from UNO has informed that last year 3 mollion people died of AIDS. The individual alphabet stands fror this disease as follows:

A : for acquired; *i.e.*, anything which is gained. It means entering the body of such a thing, which was not present before.

I : for immune; *i.e.*, the power of protection. In our boby there is a natural protective system which protects our body from external enemies like bacteria, virus, etc.

D : for deficiency; *i.e.*, lacking of something.

S : for syndrome;*i.e.*, means a situation when combination of many symptoms of many diseases exist together in the body.

Now if we put the whole thing together it becomes Acquired Immune Deficeincy Syndrome. Thus AIDS stands for Acquired Immune Deficiency Syndrome. To be more precise AIDS means-

q Acquired means you can get infected with it;

q Immune Deficiency means a weakness in the body's system that fights diseases.

q Syndrome means a group of health problems that make up a disease.

A virus called HIV, the Human Immunodeficiency Virus, causes AIDS. If you get infected with HIV, your body will try to fight the infection. It will make "antibodies", special molecules that are supposed to fight HIV.

When you get a blood test for HIV, the test looks for these antibodies. If you have them in your blood, it means that you have HIV infection. People who have the HIV antibodies are called "HIV-Positive". Fact Sheet 102has more information on HIV testing.

Being HIV-positive, or having HIV disease, is not the same as having AIDS. Many people are HIV-positive but don't get sick for many years. As HIV disease continues, it slowly wears down the immune system. Viruses, parasites, fungi and bacteria that usually don't cause any problems can make you very sick if your immune system is damaged. These are called "opportunistic infections".

Dhaka

Facts on AIDS

How do you get AIDS?

You don't actually "get" AIDS. You might get infected with HIV, and later you might develop AIDS.

You can get infected with HIV from anyone who's infected, even if they don't look sick, and even if they haven't tested HIV-positive yet. The blood, vaginal fluid, semen, and breast milk of people infected with HIV has enough of the virus in it to infect other people. Most people get the HIV virus by:

* Having sex with an infected person.
* Sharing a needle (shooting drugs) with someone who's infected
* Being born when the mother is infected, or drinking the breast milk of an infected woman.

Getting a transfusion of infected blood used to be a way people got AIDS, but now the blood supply is screened very carefully and the risk is extremely low.

There are no documented cases of HIV being transmitted by tears or saliva, but it is possible to be infected with HIV through oral sex or in rare cases through deep kissing, especially if you have open sores in your mouth or bleeding gums.

In the United States, there are about 800,000 to 900,000 people who are HIV-positive. Over 300,000 people are living with AIDS. Each year, there are about 40,000 new infections. In the mid-1990s, AIDS was a leading cause of death. However, newer treatments have cut the AIDS death rate significantly.

What happens if you are HIV positive?

You might not know if HIV infects you. Some people get fever, headache, sore muscles and joints, stomach ache, swollen lymph glands, or a skin rash for one or two weeks. Most people think it is the flu. Some people have no symptoms. Fact Sheet 103 has more information on the early stage of HIV infection. The virus will multiply in your body for a few weeks or even months before your immune system responds. During this time, you won't test positive for HIV, but you can infect other people. When your immune system responds, it starts to make antibodies. When this happens, you will

test positive for HIV. After the first flu-like symptoms, some people with HIV stay healthy for ten years or longer. But during this time, HIV is damaging your immune system. One way to measure the damage to your immune system is to count your CD4+ cellsyou have. These cells, also called "T-helper" cells, are an important part of the immune system. Healthy people have between 500 and 1,500 CD4+cells in ml of blood. Without treatment, your CD4+ cell will most likely go down. You might start having signs of HIV disease like fevers, night sweats, diarrhea, or swollen lymph nodes. If you have HIV disease, these problems will last more than a few days, and probably continue for several weeks.

How do you know if you have AIDS?

HIV disease becomes AIDS when your immune system is seriously damaged. If you have less than 200 CD4+ cells or if your CD4+ percentage is less than 14%, you have AIDS. If you get an opportunistic infection, you have AIDS. There is an "official" list of opportunistic infections, put out by the Centers for Disease Control (CDC). The most common ones are:

* PCP (*Pneumocystis carinii* pneumonia), a lung infection;
* KS (Kaposi's sarcoma), a skin cancer;
* CMV (Cytomegalovirus), an infection that usually affects the eyes;
* Candida is a fungal infection that can cause thrush (a white film in your mouth) or infections in your throat or vagina.

AIDS-related diseases also include serious weight loss, brain tumors, and other health problems. Without treatment, these opportunistic infections can kill you.

AIDS is different in every infected person. Some people die soon after getting infected, while others live fairly normal lives for many years, even after they "officially" have AIDS. A few HIV-positive people stay healthy for many years even without taking anti-HIV medications.

Is there a cure for AIDS?

There is no cure for AIDS. There are drugs that can slow down the HIV virus, and slow down the damage to your immune system. But there is no way to get all the HIV out of your body. There are other drugs that you can take to prevent or to treat opportunistic infections (OIs). In most cases, these drugs work very well. The newer, stronger anti-HIV drugs have also helped reduce the rate of most OIs. A few OIs, however, are still very difficult to treat.

What is HIV testing?

HIV testing tells you if you are infected with the Human Immunodeficiency Virus (HIV) that causes AIDS. These tests look for "antibodies" to HIV. Antibodies are proteins produced by the immune system to fight a specific germ. Other "HIV" tests are used when people already know that they are infected with HIV. These help measure how quickly the virus is multiplying (a viral load test) or the health of your immune system (a T-cell test).

How do you get tested?

You can arrange for HIV testing at any Public Health office, or at your doctor's office. Test results are usually available within two weeks.

a. **Blood Test:** The most common HIV test is a blood test. Newer tests can detect HIV antibodies in saliva, a scraping from inside the cheek, or urine. A "rapid" HIV test was approved in November 2002. Rapid test results are available within a half an hour after a blood sample is taken. A positive result on any HIV test should be confirmed with a second test.

b. **Home Test Kits:** You can't test yourself for HIV at home. The Home Access test kit is approved, but it is only designed to collect a sample of your blood. You send the sample to a laboratory where it is tested for HIV.

When should you get tested?

If you become infected with HIV, it usually takes between three weeks and two months for your immune system to produce antibodies to HIV. If you think you were exposed to HIV, you should wait for two months before being tested. You can also test right away and then again after two or three months. During this "window period" an antibody test will give a negative result, but you can transmit the virus to others if you are infected. About 5% of people take longer than two months to produce antibodies. A confirming test six months after exposure is a good idea.

Do any tests work sooner after infection?

Viral load tests detect pieces of HIV genetic material. They show up before the immune system manufactures antibodies. Also, in early 2002, the FDA approved "nucleic acid testing." It is similar to viral load testing. Blood banks use it to screen donated blood. The viral load or nucleic acid tests are generally not used to see if someone has been infected with HIV because

they are much more expensive than an antibody test. They also have a slightly higher error rate.

What does it mean if you test positive?

A positive test result means that you have HIV antibodies, and are infected with HIV. You will get your test result from a counselor who should tell you what to expect, and where to get health services and emotional support. Testing positive does notmean that you have AIDS. Many people who test positive stay healthy for several years, even if they don't start taking medication right away. If you test negative and you have not been exposed to HIV for at least three months, you are not infected with HIV. Continue to protect yourself from HIV infection.

Can you keep the test result confidential?

You can be tested anonymously in many states. You do not have to give your name when you are tested at a public health office, or when you receive the test results. You can be tested anonymously for HIV as many times as you want. The Centers for Disease Control (CDC) proposed in late 1998 that all states keep track of the names of HIV-infected people. This proposal has not yet taken effect.

How accurate are the tests?

Antibody test results for HIV are accurate more than 99.5% of the time. Before you get the results, the test has usually been done two or more times. The first test is called an "EIA" or "ELISA" test. Before a positive ELISA test result is reported, it is confirmed by another test called a "Western Blot". Two special cases can lead to false results:

Children born to HIV-positive mothers may have false positive test results for several months because mothers pass infection-fighting antibodies to their newborn children. Even if the children are not infected with HIV, they have HIV antibodies and will test positive. Other tests, such as a viral load test, must be used.

As mentioned above, people who were recently infected may test negative if they get tested too soon after being infected with HIV. HIV testing generally looks for HIV antibodies in the blood, or saliva or urine. The immune system produces these antibodies to fight HIV, but it can take up to three months for them to show up. During this "window period" you will not test positive for HIV even if you are infected. Normal HIV tests don't work for newborn children of HIV-infected mothers. Once you test

positive and start to receive health care for HIV infection, your name will be reported to the Department of Health. These records are kept confidential.
A positive test result does not mean that you have AIDS. If you test positive, you should learn more about HIV and decide how to take care of your health.

What is acute HIV infection?

The amount of HIV in the blood gets very high within a few days or weeks after HIV infection. Some people get a flu-like illness. This first stage of HIV disease is called "acute infection."

About half of the people who get infected don't notice anything. Symptoms generally occur within 2 to 4 weeks. The most common symptoms are fever, fatigue, and rash. Others include headache, swollen lymph glands, sore throat, feeling achy, nausea, vomiting, diarrhea, and night sweats. It is very easy to overlook the signs of acute HIV infection. They can be caused by several different illnesses. If you have any of these symptoms and if there is any chance that you were recently exposed to HIV, talk to your doctor about getting tested for HIV.

Testing for acute HIV infection

The normal HIV blood test will come back negative for someone who was infected very recently. The test looks for antibodies produced by the immune system to fight HIV. It can take two months for these antibodies to be produced. However, the viral load test measures the virus itself. Before the immune system produces antibodies to fight it, HIV multiplies rapidly. Therefore, this test will show a high viral load during acute infection.

A negative HIV antibody test and a very high viral load indicate recent HIV infection, most likely within the past two months. If both tests are positive, then HIV infection probably occurred a few months or longer before the tests.

Risk of infecting others

The number of HIV particles in the blood is much higher during acute HIV infection than later on. Exposure to the blood of someone in the acute phase of infection is more likely to result in infection than exposure to someone with long-term infection. One research study estimated that the risk of infection is approximately 20 times higher during acute infection.

Treating acute HIV infection

At first, the immune system produces white blood cells that recognize and kill HIV-infected cells. This is called an "HIV-specific response." Over time, most people lose this response. Unless they use antiviral medications, their HIV disease will progress. However, starting anti-HIV drugs during acute infection might protect the HIV-specific immune response. Preliminary research suggests that treatment during acute infection might protect the immune system enough so that it can control HIV without drugs. Researchers have studied people who start treatment during acute infection and then stop taking antiviral drugs. In a few cases, their immune systems controlled HIV without medications.

'Pros' and 'cons' of treating acute HIV

Starting antiviral medications is a major decision. Anyone thinking about taking anti-HIV drugs should carefully consider the benefits and disadvantages. Taking antiviral drugs changes your daily life. Missing doses of drugs makes it easier for the virus to develop resistance to medications, which limits future treatment options. The medications are very strong. They have side effects that can be difficult to live with for a long time, and they can be very expensive.

Early treatment can protect the immune system from damage by HIV. Immune damage shows up as lower T-cell counts and higher viral loads. These are associated with higher rates of disease. Older people (over 40 years old) have weaker immune systems. They do not respond as well as younger people to antiviral drugs. However, not everyone with HIV gets sick right away. Someone with a T-cell count over 350 and a viral load under 20,000, even if they don't take antiviral drugs, has about a 50/50 chance of staying healthy for 6 to 9 years. Fact Sheet 412has more information on T-cell tests, and Fact Sheet 413has information on the viral load. The most important benefit of early treatment is the possibility of discontinuing antiviral medications after a period of controlling HIV. However, research on this topic is in very early stages. It is not easy to identify people with acute HIV infection. Some people have no symptoms. If symptoms do occur, several diseases like the flu might cause them. If you think you might be in the acute stage of HIV infection, tell your doctor and get tested. There may be a real advantage to starting antiviral treatment during acute HIV infection. Taking anti-HIV medications is a major commitment. Discuss the pros and

cons of treatment with your doctor and consider them carefully before making any decisions.

How do you get infected with HIV?

The Human Immunodeficiency Virus (HIV) is not spread easily. You can only get HIV if you get infected blood or sexual fluids into your system. You can't get it from mosquito bites, coughing or sneezing, sharing household items, or swimming in the same pool as someone with HIV. Some people talk about "shared body fluids" being risky for HIV. But sweat, saliva or tears have caused no documented cases of HIV. However, even small amounts of blood in your mouth might transmit HIV during kissing or oral sex. Blood can come from flossing your teeth, or from sores caused by gum disease, or by eating very hot or sharp, pointed food. To infect someone, the virus has to get past the body's defenses. These include skin and saliva. If your skin is not broken or cut, it protects you against infection from blood or sexual fluids. Saliva can help kill HIV in your mouth. If HIV-infected blood or sexual fluid gets inside your body, you can get infected. This can happen through an open sore or wound, during sexual activity, or if you share equipment to inject drugs. HIV can also be spread from a mother to her child during pregnancy or delivery. This is called "vertical transmission." Drinking an infected woman's breast milk can also infect a baby.

How can you protect yourself and others?

Unless you are 100% sure that you and the people you are with do not have HIV infection, you should take steps to prevent getting infected. This fact sheet provides an overview of HIV prevention, and refers you to other fact sheets for more details on specific topics.

Sexual Activity: You can avoid any risk of HIV if you practice abstinence (not having sex). You also won't get infected if your penis, mouth, vagina or rectum does not touch anyone else's penis, mouth, vagina, or rectum. Safe activities include kissing, erotic massage, masturbation or hand jobs (mutual masturbation). Having sex in a monogamous (faithful) relationship is safe if:

* Both of you are uninfected (HIV-negative)
* You both have sex only with your partner
* Neither one of you gets exposed to HIV through drug use or other activities

* Oral sex has a lower reisk of infection than anal or vaginal sex, especially if there are no open sores or blood in the mouth.

You can reduce the risk of infection with HIV and other sexually transmitted diseases by using barriers like condoms. Traditional condoms go on the penis, and a new type of condom goes in the vagina or in the rectum. Some chemicals called spermicides can prevent pregnancy but they don't prevent HIV. They might even increase your risk of getting infected if they cause irritation or swelling.

a. **Drug Use:** If you're high on drugs, you might forget to use protection during sex. If you use someone else's equipment (needles, syringes, cookers, cotton or rinse water) you can get infected by tiny amounts of blood. The best way to avoid infection is to not use drugs. If you use drugs, you can prevent infection by not injecting them. If you do inject, don't share equipment. If you must share, clean equipment with bleach and water before every use. Some communities have started exchange programs that give free, clean syringes to people so they won't need to share.

b. **Vertical Transmission**: With no treatment, about 25% of the babies of HIV-infected women would be born infected. The risk drops to about 2% if a woman takes AZT during pregnancy and delivery, and then her newborn is given AZT, and if the baby is delivered by Caesarian section (C-section.). Babies can get infected if they drink breast milk from an HIV-infected woman. Women with HIV should use baby formulas or breast milk from a woman who is not infected to feed their babies.

c. **Contact with Blood**: HIV is one of many diseases that can be transmitted by blood. Be careful if you are helping someone who is bleeding. If your work exposes you to blood, be sure to protect any cuts or open sores on your skin, as well as your eyes and mouth. Your employer should provide gloves, facemasks and other protective equipment, plus training about how to avoid diseases that are spread by blood.

What if you have been exposed?

If you think you have been exposed to HIV, talk to your health care provider or the public health department, and get tested. If you are sure that you have been exposed, call your doctor immediately to discuss whether you should start taking anti-HIV drugs. This is called "post exposure prophylaxis" or

PEP. You would take two or three medications for several weeks. These drugs can decrease the risk of infection, but they have some serious side effects. HIV does not spread easily from person to person. To get infected with HIV, infected blood, sexual fluid, or mother's milk has to get into your body. HIV-infected pregnant women can pass the infection to their new babies. To decrease the risk of spreading HIV:

* Use condoms during sexual activity
* Do not share drug injection equipment
* If you are HIV-infected and pregnant, talk with your doctor about taking anti-HIV drugs
* If you are an HIV-infected woman, don't breast feed any baby
* Protect cuts, open sores, and your eyes and mouth from contact with blood.

If you think you have been exposed to HIV, get tested and ask your doctor about taking anti-HIV medications.

What are condoms?

A condom is a tube made of thin, flexible material. It is closed at one end. Condoms have been used for hundreds of years to prevent pregnancy by keeping a man's semen out of a woman's vagina. Condoms also help prevent diseases that are spread by semen or by contact with infected sores in the genital area, including HIV. Most condoms go over a man's penis. A new type of condom was designed to fit into a woman's vagina. This "female" condom can also be used to protect the rectum.

What are they made of?

Condoms used to be made of natural skin (including lambskin) or of rubber. That's why they are called "rubbers". Most condoms today are latex or polyurethane. Lambskin condoms can prevent pregnancy. However, they have tiny holes (pores) that are large enough for HIV to get through. Lambskin condoms do not prevent the spread of HIV. Latex is the most common material for condoms. Viruses cannot get through it. Latex is inexpensive and available in many styles.

It has two drawbacks: oils make it fall apart, and some people are allergic to it. Polyurethane is an option for people who are allergic to latex. One brand of female condom and one brand of male condom are made of polyurethane.

How are condoms used?

Condoms can protect you during contact between the penis, mouth, vagina, or rectum. Condoms would not protect you from HIV or other infections unless you use them correctly.

* Store condoms away from too much heat, cold, or friction. Do not keep them in a wallet or a car glove compartment.
* Check the expiration date. Don't use outdated condoms.
* Don't open a condom package with your teeth. Be careful that your fingernails or jewelry don't tear the condom. Body jewelry in or around your penis or vagina might also tear a condom.
* Use a new condom every time you have sex, or when the penis moves from the rectum to the vagina.
* Check the condom during sex, especially if it feels strange, to make sure it is still in place and unbroken.
* Do not use a male condom and a female condom at the same time.
* Use water-based lubricants with latex condoms, not oil-based. The oils in Crisco, butter, baby oil, Vaseline or cold cream will make latex fall apart.
* Use unlubricated condoms for oral sex (most lubricants taste awful).
* Do not throw condoms into a toilet. They can clog plumbing.

Using a Male Condom

Put the condom on when your penis is erect - but before it touches your partner's mouth, vagina or rectum. The liquid that comes out of the penis before orgasm can contain HIV.

* If you want, put some water-based lubricant inside the tip of the condom.
* If you are not circumcised, push your foreskin back before you put on a condom. This lets your foreskin move without breaking the condom.
* Squeeze the air out of the tip of the condom to leave room for semen (cum) and unroll the rest of the condom down the penis.
* Donot "double bag" (use two condoms). Friction between the condoms increases the chance of breakage.

* After orgasm, hold the base of the condom and pull out before your penis gets soft.
* Be careful not to spill semen onto your partner when you throw the condom away.

Using a Female Condom

The female condom is a sleeve or pouch with a closed end and a larger open end. There are flexible rings at each end of the Reality condom, and a flexible V-shaped frame in the V-amour condom.

* Put the condom in place before your partner's penis touches your vagina or rectum.
* For use in the vagina, insert the narrow end of the condom, like inserting a diaphragm. The larger end goes over the opening to the vagina to protect the outside sex organs from infection.
* Guide the penis into the large end to avoid unprotected contact between the penis and the partner's rectum or vagina.
* Some people have used the Reality condom in the rectum after removing the smaller ring. Put the condom over your partner's erect penis. The condom will be inserted into the rectum along with the penis.
* After sex, remove the condom before standing up. Twist the large end to keep the semen inside. Gently pull the condom out and throw it away.

Nonoxynol-9

Nonoxynol-9 is a chemical that kills sperm (a spermicide). It can help prevent pregnancy when it is used in the vagina along with condoms or other birth control methods. Nonoxynol-9 should not be used in the mouth or rectum.

Because nonoxynol-9 kills HIV in the test tube, it was considered as a way to prevent HIV infection during sex. Unfortunately, many people are allergic to it. Their sex organs (penis, vagina, and rectum) can get irritated and develop small sores that actually make it easier for HIV infection to spread. Nonoxynol-9should not be usedas a way to prevent HIV infection.

Condom myths

Condoms donot work: Condoms prevent HIV transmission very well if they are used correctly every time you have sex.

Condoms break a lot: Less than 2% of condoms break when they are used correctly: no oils with latex condoms, no double condoms, no outdated condoms.

HIV can get through condoms: HIV cannot get through latex or polyurethane condoms. Donot use lambskin condoms.

When used correctly, condoms are the best way to prevent the spread of HIV during sexual activity. Condoms can protect the mouth, vagina or rectum from HIV-infected semen. They can protect the penis from HIV-infected vaginal fluids and blood in the mouth, vagina, or rectum. They reduce the risk of spreading other sexually transmitted diseases. Condoms must be stored, used and disposed of correctly. Male condoms are used on the penis. Female condoms can be used in the vagina or rectum.

Did you just learn that you are HIV-positive?

It can be very scary to learn that your AIDS blood test came back positive, but it's not a death sentence. The test means that you are infected with the virus that causes AIDS, the human immunodeficiency virus (HIV). Even though there is no cure for HIV disease, there are many new treatments that help keep the disease under control. When you first find out that you have HIV, you will need to adjust to this change in your life. Family members or friends might be able to help you, or you could talk with a counselor or social worker. Take your time and donot feel that you have to tell everyone right away about your HIV status. Then start taking the next steps:

* Learn more about HIV disease
* Keep track of your immune system
* Decide how you want to deal with HIV

Learning more about HIV

HIV is a virus that can multiply rapidly in your body. Without treatment, HIV can make your immune system very weak. If this happens, you might get an "opportunistic infection". Common germs cause these diseases. People with healthy immune systems can be exposed to these germs and not get sick. The same germs can cause serious illnesses in people with weak immune systems. The first medication for HIV was approved in 1987. Now there are many different drugs that can be used to slow down the HIV virus. Most people with HIV disease can now expect to live healthy lives for many years. You will probably have a lot of questions about HIV disease. There are many good sources of information, including:

1. Your HIV case manager or physician;

2. Your local public health department.

Be careful about the information you are getting - check it out with your doctor or other sources to make sure it is accurate.

Monitoring your immune system

In addition to your regular medical exams, there are two special blood tests to keep track of HIV disease. They are the viral load test and the T-cell test. The viral load test helps show how strong the HIV virus is in your body. It measures the amount of HIV in your blood. Lower levels are better.

This test is used to help decide when it's time to start using anti-HIV medications, to see if the drugs are working, and to know when to change medications. The T-cell test helps show how strong your immune system is. It counts how many infection-fighting white blood cells you have.

These cells are also called CD4+, T-4, or T-helper cells. The more - the better. If your T-cell count gets too low, you might develop an opportunistic infection. This test is used to help decide when it is time to start using anti-HIV medications, or medicines to prevent opportunistic infections. Your doctor will probably want to do these tests every three to six months. If your viral load stays low and your T-cell count stays high, you might choose to delay treatment.

Decide how you want to deal with HIV

HIV may not be the only health issue you are dealing with. The better your health is overall, the better you can deal with HIV. Be sure to get regular medical and dental checkups, and get treatment for conditions like diabetes, high blood pressure, or high cholesterol. If you can avoid smoking, drinking too much alcohol, recreational drug use, and sexually transmitted diseases, you will probably find your HIV easier to control.

Although there are many different medications that can help slow down the HIV virus, no one knows exactly when or how best to use them. You will need to get information and work with your doctor to decide what kind of treatments fit best with your beliefs, desires, and life style. You might choose to be very aggressive, and use anti-HIV medications very early in your disease. You might be more conservative and decide to wait until you reach specific viral load or T-cell levels. It's up to you.

Complementary and alternative therapies

People with HIV use many different kinds of treatments for their disease. Some people believe they have stayed healthier because they use traditional healing practices, massage, acupuncture, herbs, or other therapies. It can be difficult to get information on how well these therapies work for HIV disease. Most of them are not studied the same way as western medicines. That does not mean they donot work, but you may have to find other ways to check them out. Remember, there are no "miracle" cures. If it sounds too good to be true, be very careful. There are things you can do to stay healthier with HIV disease. You can learn more about the disease, monitor the health of your immune system, and decide how you want to deal with your health. Remember, you are in charge of your own health care. You will decide which doctor to work with, and whom else you want to consult about your treatments. You will decide which treatments you want to use and when you want to use them. Take your time and learn about your options.

How does drug use relate to HIV?

Drug use is a major factor in the spread of HIV infection. Shared equipment for using drugs can carry HIV and hepatitis, and drug use is linked with unsafe sexual activity. Drug use can also be dangerous for people who are taking anti-HIV medications. Drug users are less likely to take all of their medications, and street drugs may have dangerous interactions with HIV medications.

Injection and infection

HIV infection spreads easily when people share equipment to use drugs. Sharing equipment also spreads hepatitis B, hepatitis C, and other serious diseases.Infected blood can be drawn up into a syringe and then get injected along with the drug by the next user of the syringe. This is the easiest way to transmit HIV during drug use because infected blood goes directly into someone's bloodstream.

Even small amounts of blood on cookers, filters, tourniquets, or in rinse water can be enough to infect another user. Blood on your hands - even small amounts - can also be dangerous when you help someone else find a vein, steady their arm, or when you pass equipment. To reduce the risk of HIV and hepatitis infection, never share any equipmentused with drugs, and

keep washing your hands. Carefully clean your cookers and the site you will use for injection.

A recent study showed that HIV could survive in a used syringe for at least 4 weeks. If you have to re-use equipment, you can reduce the risk of infection by cleaning it between users. If possible, re-use your own syringe. It still should be cleaned because bacteria can grow in it. The most effective way to clean a syringe is to use water first, then bleach and a final water rinse. Try to get all blood out of the syringe by shaking vigorously for 30 seconds. Use cold water because hot water can make the blood form clots. To kill most HIV and hepatitis C virus, leave bleach in the syringe for two full minutes. Cleaning does not always kill HIV or hepatitis. Always use a new syringe if possible.

Needle exchange programs

Some communities have started needle exchange programs to give free, clean syringes to people so they would not need to share. These programs are controversial because some people think they promote drug use. But research on needle exchange shows that rates of HIV infection go down where there are needle exchange programs, and more drug users sign up for treatment programs. Needle exchange programs are legal in many areas

Drug use and unsafe sex

For a lot of people, drugs and sex go together. Drug users might trade sex for drugs. Some people think that sexual activity is more enjoyable when they are using drugs. Drug use, including alcohol, increases the chance that people will not protect themselves during sexual activity. Anyone using drugs is less likely to remember about using protection, or to care about it.

Medications and drugs

It is very important to take every dose of anti-HIV medications. People who are not adherent (miss doses) are more likely to have higher levels of HIV in their blood, and to develop resistance to their medications. Drug use is linked with poor adherence, which can lead to treatment failure. Some street drugs interact with medications. The liver breaks down some medications used to fight HIV, especially the protease inhibitors and the non-nucleoside analog reverse transcriptase inhibitors. It also breaks down some recreational drugs, including alcohol. When drugs and medications are both "in line" to use the liver, they might both be processed much more slowly. This can lead to a serious overdose of the medication or of the recreational drug. An

overdose of a medication can cause serious side effects. An overdose of a recreational drug can be deadly. At least one death of a person with HIV has been blamed on mixing a protease inhibitor with the recreational drug Ecstasy.

Drug use is a major cause of new HIV infections. Shared equipment can spread HIV, hepatitis and other diseases. Recreational drug use, including alcohol, contributes to unsafe sexual activities. To protect yourself from infection, never re-use any equipment for using drugs. Even if you re-use your own syringes, clean them thoroughly between times. Cleaning is only partly effective. In some communities, needle exchange programs provide free, new syringes. These programs reduce the rate of new HIV infections. Drug use can lead to missed doses of anti-HIV medications. This increases the chances of treatment failure and resistance to medications. Mixing recreational drugs and anti-HIV medications can be dangerous. Drug interactions can cause serious side effects or dangerous overdoses.

What is harm reduction?

Harm reduction is a way of dealing with behavior that damages the health of the person involved and of their community. Harm reduction tries to improve individual and community health. Much of the work on harm reduction has been in connection with drug use. Some key points of harm reduction:

* Drug use won't disappear but its harmful effects can be reduced. Harm reduction should be a goal for service organizations and governments.
* Some drugs are safer than others. Some ways of using drugs are less harmful than others.
* Drug users can best reduce the harm of their own drug use.
* Abstinence is the ultimate goal. However, it is also good to reduce drug use and drug-related deaths, disease and crime.
* The criminal justice approach should not be the only method for dealing with drug use. Combining it with a public health approach is more productive.
* Services for drug users should be non-judgmental. They should not force people to receive services.

Harm reduction in action

Harm reduction related to drug use includes:

* Teaching drug users about the risks of different drugs and how they are used.
* Information on using drugs more safely, and reducing the harm of overdoses.
* Provide methadone as a substitute for heroin. Offer medication to counteract a drug overdose.
* Education and referral to drug treatment opportunities.
* Permit drug users to exchange used syringes for new ones, or buy new syringes.
* Outreach services in areas where drug sales occur.

There is research to support several harm reduction approaches, including methadone maintenance for heroin users and needle exchange for injection drug users.

Harm reduction and HIV

Some harm caused by drug use is related to HIV. Sharing equipment for drug use can spread HIV infection if it contains even a tiny amount of infected blood. Drug use is linked to unsafe sexual activity. This increases the spread of HIV infection.

It is also related to missing doses of HIV medications (poor adherence.) This can make HIV disease get worse.

Harm reduction can include education about the HIV-related risks of drug use and of unsafe sexual activity.

Challenges to harm reduction

Drug use and its effects are huge challenges. They require the coordinated efforts of treatment specialists, law enforcement agents, public health professionals, corrections experts, and drug users themselves. Harm reduction says that the best approach to drug use problems involves public health providers working with drug users.

It also suggests that drug treatment is usually more effective than arrest and imprisonment. Exceptions would be where drug use results in criminal activity that harms others, such as theft, violence, and driving under the influence of drugs.

Many communities combine harm reduction and law enforcement approaches to drug use. Unfortunately, many debates about drug policy put public health arguments on one side against morality and law enforcement on the other.

Is harm reduction legal?

Some aspects of harm reduction are legal. Drug users can get information on methadone, on using drugs more safely, or referrals to drug treatment programs. People can get information on reducing the risk of HIV infection through sexual activity. Many other aspects of harm reduction require changes in laws or in law enforcement procedures. For example, syringe exchange programs operate under specific exemptions to existing laws or local "emergency" legislation. They require cooperation from local law enforcement officials. Harm reduction is a public health approach to behaviors that harm individuals and their communities. Harm reduction can be applied alongside law enforcement activities. Harm reduction focuses on improving the health of individuals and the public, more than on eliminating harmful behaviors, although that is the ultimate goal. Harm reduction principles can be applied to reducing the HIV-related risks of drug use or of unsafe sexual activity.

Why does it take so long to approve new drugs?

Developing a new drug can take 7 years or more. First, drug companies must find substances that are active against HIV. Most HIV drugs are identified by testing existing drugs for anti-HIV activity (screening). A newer method is rational drug design. In this process, scientists "build" drug molecules to fight HIV in specific ways. When a promising drug is identified, it goes through pre-clinical testing. This involves test-tube and animal studies. These show whether the drug works against HIV and how it works. They also show how it can be manufactured, and make sure it is not too toxic (poisonous). If pre-clinical results are good enough, the drug company files an Investigational New Drug (IND) application. Then it starts testing the drug in humans (clinical trials). When enough clinical trials are completed, the manufacturer submits an NDA, or New Drug Application. If the FDA approves the NDA, the drug can be sold to treat specific medical conditions.

What are the "phases" of clinical trials?

There are four phases of human clinical trials. These apply to all drugs, not just drugs for HIV/AIDS. If the results from any phase of testing are not good enough, the company will stop developing the drug.

Phase I trials test the safety of new drugs for humans. These trials record the side effects that occur at different dosages of the drug. Everyone in a

Phase I trial receives the new drug, but different participants may get different dosages. The trials usually study less than 100 people, and take less than a year. In Phase I trials, new drugs are given to humans for the first time. People who participate in Phase I trials face the highest risks compared to possible benefits.

Phase II trials can enroll several hundred people and take 1 to 2 years. They study how well the drug works against HIV disease. They also collect more information about side effects. These trials are usually randomized. This means that trial participants are divided into two groups that are similar in terms of age, sex, and health. One group receives the study drug. The other group is the reference or controlgroup. People in the control group get standard treatment (called "standard of care.") If there is no standard treatment, they may get a dummy medication (called a placebo). Trial participants and their doctors usually do not know who is getting the study drug or the placebo. This is called a blindedstudy. Studies are blinded so that the doctors will be totally objective when they evaluate the health of patients in the study.

Phase III trials collect more data on a drug's effectiveness and side effects. These trials can study up to a few thousand people and often last for a year or more. Phase III trials are normally randomized and blinded. Participants might not receive the study drug. With good results in Phase III trials, a manufacturer can apply for FDA approval to sell the new drug.

Phase IV trials are called "post-marketing studies". The regulations for Phase IV trials are not very clear, and they are not conducted very often. Phase IV trials can monitor a new drug's long-term effectiveness and side effects, or how cost-effective it is. They can also compare the new drug to other drugs approved for the same condition.

How do you know if a drug works?

The FDA used to require trials that measured clinical endpointsbefore approving a new HIV drug. These trials analyze how many people get sicker, develop opportunistic infections, or die. However, these trials take a long time and are very expensive. A faster, cheaper way to test new drugs is by using indirect measures of patient health. These surrogate markersare laboratory values such as viral load or T-cell counts. In 1997, the FDA approved the use of surrogate markers for full approval of new HIV drugs.

Using unapproved drugs

There are three legal ways to use drugs that the FDA has not approved to treat your specific health problem:

1. Expanded Accessis a program where manufacturersto provide unapproved drugs to people who cannot take part in a clinical trial. Patients must, and who meet conditions set by the drug manufacturer. The drugs are usually offered at no charge, but your doctor will have to collect information on how you respond to the drug.
2. Drug companies sometimes provide new drugs to people who are very ill and who have no other treatment options. This is called through Compassionate Use, also called a "Treatment IND Protocol".
3. Your doctor can write a prescription for any FDA-approved drug, even if you use it for some other medical condition. This is called off-label use. There may be no information about how often medications are used off-label, or how well they work.

The Complete Blood Count (CBC)

The most common laboratory test is the complete blood count (CBC). It examines the components of blood, including red and white blood cells and platelets. Most test results are reported as amounts in a sample of blood (for example, cells per milliliter) or as a percentage. All blood cells are made in the bone marrow, the center of large bones. Some medications or diseases can damage the bone marrow. This can reduce the numbers of different types of red or white blood cells. Laboratories have different "reference ranges" or normal values for the results of each test. Most lab reports show the normal range and highlight any test results outside the normal range.

Red blood cell tests

Red blood cells carry oxygen from the lungs to cells throughout the body. This is measured by three main tests. The Red Blood Cell Count (RBC) is the total number of red blood cells. Hemoglobin (HGB) is a protein in red blood cells that actually carries oxygen from the lungs to the rest of the body. Hematocrit (HCT) measures the percentage of blood volume taken up by red blood cells.

* A high RBC is common for people who live at high altitude. It's a way the body adjusts to thinner oxygen.
* Very low readings for RBC, hemoglobin and hematocrit can indicate anemia. With anemia, the cells do not get enough oxygen

to function normally. People with anemia feel tired all the time and might look pale.

* Mean Corpuscular Volume (MCV) measures the average volume (size) of individual red blood cells. A low MCV means that the cells are smaller than normal. This is usually caused by an iron deficiency or chronic disease. Many people with HIV have a high MCV caused by HIV medications. This is not dangerous.
* Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH) and Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration (MCHC) measure the amount and concentration of hemoglobin in the average cell. The MCH is calculated by dividing total hemoglobin by the total number of red blood cells.
* Platelets (PT) help stop bleeding by forming clots and scabs. If you don't have enough platelets, you might get internal bleeding or you could bruise easily. People with HIV disease sometimes have a low platelet count, also called "thrombocytopenia." Taking HIV medications usually corrects this problem. Platelets are almost never high enough to cause health problems.

White blood cell tests

White blood cells (also called leukocytes) help fight infections in the body.

* White Blood Cell Count (WBC) is the total number of white blood cells. A high WBC usually means that the body is fighting an infection. A very low WBC can be caused by problems with the bone marrow. This condition, called cytopenia or leukopenia, means that your body is less able to fight off infections.
* The Differential counts five types of white blood cells: neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils and basophils. These are reported as a percentage of the WBC. The percentages are multiplied by the WBC to get "absolute" counts. For example, if the percent of lymphocytes is 30% and the WBC is 10,000, the absolute lymphocyte count is 30% of 10,000, or 3,000.
* Neutrophilsor polymorphonuclear cells (Polys) fight bacterial infections. They normally account for 55% to 70% of WBCs. If you have a very low count, you could get a bacterial infection. This condition is called neutropenia. Advanced HIV disease can

cause neutropenia. So can some medications including ganciclovir, a drug used to treat cytomegalovirus and the anti-HIV drug AZT.

There are two main types of lymphocytes (lymphs). "T cells" attack and kill germs and help regulate the immune system. "B cells" make antibodies, special proteins that attack germs.

Lymphocytes are normally 20% to 40% of WBCs. A regular CBC does not give T-cell counts. Most people with HIV infection get special T-cell tests. However, the results of a CBC are needed to calculate T-cell counts, so both tests are done at the same time.

Monocytesor Macrophages (Monos) make up 2% to 8% of WBCs. They fight infections by "eating" germs and telling the immune system what germs they have found. Monocytes circulate in the blood. When monocytes settle in various tissues they are called macrophages. A high count usually means you are fighting a bacterial infection.

Eosinophils (Eos) are normally 1% to 4% of WBCs. They are involved with allergies and reactions to parasites. Sometimes, HIV disease can cause a high eosinophil count. If you have a high count, especially if you have diarrhea, gas or stomach bloating, your doctor will probably test you for parasites.

Basophils (Bas) are not well understood, but they are involved in long-term allergic reactions such as asthma or skin allergies. They are usually less than 1% of WBCs.

Chemistry (chem) screen

A large part of your laboratory report is results of the chemistry screen. These tests measure various chemicals in your blood to see whether your body is working correctly. See Fact Sheet 106for information on the Complete Blood Count and Fact Sheet 108for information on blood glucose (sugar) and cholesterol tests. Laboratories have different "reference ranges" or normal values for the results of each test. Most lab reports show the normal range and highlight any test results outside the normal range.

* The mineral calcium is a major component of bones and teeth. Calcium is also needed for nerves and muscles to work properly, and in chemical reactions in the cells. The body controls the amount of calcium in the blood. However, the amount of protein in the blood can affect calcium test results. The most common cause of low calcium test results for people with HIV is low

protein levels due to malnutrition or wasting. Abnormal calcium levels can indicate digestive problems.

* Phosphorus, like calcium, is a major component of bones. Low levels of phosphorus for a long period of time can cause damage to bones, nerves and muscles. High phosphate levels are most often due to kidney failure.
* Glucose is sugar, which is broken down in the cells to provide energy. See Fact Sheet 108for more information on blood glucose tests.

The electrolytes

The electrolytes are related to fluid balance in your cells. They are especially important if you become dehydrated or have kidney problems.

* Sodiumlevels indicate your balance of salt and water. They also are a sign of the functioning of your kidneys and adrenal glands. Abnormal blood sodium levels often indicate that blood volume is too low (due to dehydration) or too high. They can also occur when the heart is not pumping blood normally, or when the kidneys are not working properly.
* Potassium affects several major organs including the heart. Potassium levels rise in kidney failure, and may be abnormal due to vomiting or diarrhea.
* Chloride levels often go up and down along with sodium levels. This is because sodium chloride, or common salt, is a major component of blood.
* Bicarbonateor CO_2 measures a buffer system in the blood. A normal CO_2 level keeps the blood acidity at the correct level.

Kidney function tests

The basic kidney function tests are blood urea nitrogen (BUN) and creatinine. Abnormal levels of phosphorus, sodium or uric acid can also be caused by kidney problems.

* Blood Urea Nitrogen (BUN) is nitrogen in the blood. This is a waste product that is normally removed by the kidneys in the urine. High BUN levels can be due to a high-protein diet, dehydration, or kidney or heart failure.
* Creatinine is a waste product of protein digestion and a measure of kidney function. High levels are usually due to kidney problems.

Doctors use the creatinine level as most direct sign of how well the kidneys are removing waste products from the body.

Liver function tests

The lab tests called "liver function tests" actually measure the levels of enzymes found in the liver, heart, and muscles. Enzymes are proteins that cause or increase chemical reactions in living organisms. High enzyme levels can indicate liver damage caused by medications, alcohol, hepatitis, or recreational drug use.

Different patterns of these enzymes - when some are elevated and others are normal - can help your doctor identify specific health problems. Laboratory tests include:

* ALT (alanine aminotransferase) : formerly called serum glutamate pyruvate transaminase or SGPT)
* AST (aspartate aminotransferase) : formerly called serum glutamic-oxaloacetic transaminase or SGOT)
* Bilirubin (yellow fluid produced when red blood cells break down) : The antiviral drug indinavir (Crixivan & REG;) can increase bilirubin.
* Alkaline Phosphatase
* GGT (gamma glutamyl transpeptidase)
* LDH (lactic dehydrogenase)

BANSDOC Library A-18029

BANSDOC Library Dhaka

তথ্যপঞ্জি

আহমদ , হাফিজউদ্দীন, *যৌনব্যাধি*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫

আহমদ, হাফিজউদ্দীন, তীব্র উদারময়, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ, বাংলা একাডেমী, আগস্ট ১৯৯২।

আহমদ, হাফিজউদ্দীন, তীব্র উদারময়, চিকিৎসা ও প্রতিরোধ, একাডেমিক পাবলিশার্স কোলকাতা, ভারত ১৯৯১,

Anon, 1992. Who Aids Series 10, WHO,

Anon, 1996. Child Health, April, June 96.

Anon, 1999. Tubercudosis Control Programme in Bangladesh-Technical Outline, Dy. Gen Health Services, Feb, 1999.

Anon, 2000, Aids Action Dec, 88, Sept. 89, July-Sept 2000.

Anon, Bangladesh Observer, 28 August 1999.

Anon, Health Technology Directions, Vol. 6., NoI, PATH, USA.

Anon, *Medicine International*, Vol. 6, No 21, 1993, Sept. 92.

Anon, U.S. Department of Health and Human Service, Surgeon General's Report on AIDS.

Anon. 1988. *Pied Crolo's Special Magazine*, December, 1988.

Anon. 2000. PostGradate Doctor, M. E., March-April, Sept-Oct 2000.

Anon. Outlook, Vol.9, No 1, May 2001, PATH, USA

Anon. Ro Medica, Issue, 2 Oct-Dec, 2000 Roche Pharmaceuticals.

Anon. *Scientific American*, Vol. 259, No 4, 0ct. 1998.

Bailey, love, Short Practice Surgery 22nd edition, 1995.

Chonudhury, M. R., *Modern Medical Microbiology*, Edn. 4, 1995.

Davidson. 1995. *Davidson's Principles And Practice of Medicine*,

Forest, C. 1995. *Macleod's Principles and Practice of Surgery*. 3rd edition, Churchill Livingstone, UK

Harrison, 1998. *Harrison's Principle of Internal Medicine*, Vol. .2 14th edition,

K. Park, 1997, *TextBook of Preventive and Social Medicine*, 15th edition,

Khaleque, K.A. ১৯৯৭ Practical Pathology and Microbiology, 9th edition.

Murray Dickson, *Wher there is no dentist.*

Parveen, J. Kumar and Michael Clark, 1991. *Clinical Medicine*, 2nd Edition,

Rashid, Kabir, Hyder, 1999. *TextBook of Community Medicine and Public Health.*